প্রবাহ

প্রথম সংখ্যা

মানিকের সংকলন

প্রকাশকাল-
১লা জানুয়ারী, ২০১৮

প্রকাশক-
শ্রীধর ঘোষ
চারুপল্লী, বোলপুর, বীরভূম
মোঃ- ৯৪৭৫৪৭৪৬৭০

বর্ণ সংস্থাপনায়-
মেসার্স বাসন্তী প্রিন্টার্স
কালীমোহনপল্লী, বোলপুর
মো-৯৪৭৫৯৮৫৪৩৮

প্রচ্ছদ-
ব্রহ্মসমুদ্র থেকে ধেয়ে আসছে
চৈতন্যের প্রবাহ।

মুদ্রণ-
গ্যাল্যাক্সি প্রিন্টার্স
৭/১, গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন
কোলকাতা-৭০০০৬৭

বিনিময়-৫০/-

প্রাপ্তি স্থান-
পবিত্র কুমার দত্ত
৩৮/২৫, বি. এম. রায় রোড
কোলকাতা-৮
মোঃ-০৩৩২৪৪৭৩৪৬৩

অরুন ব্যানার্জ্জী
শিমুরালী, নদীয়া
মোঃ- ৯৫৬৪৪১৭০৯৫

গীতা বসাক
আমতলা, দঃ ২৪পরগণা
মোঃ-০৩৩২৪৭০৮৪৮৯

রত্না মাইতি
কাষ্ঠডাঙ্গা, সরশুনা
মোঃ-৭২৭৮৩৩৭২২১

বিভা দাস
বাগুইআটি, কোলকাতা
মোঃ-৯৮৩০৪২৮২৩৯

পার্থ ঘোষ
বেলঘরিয়া, কোলকাতা
মোঃ- ৭৯৮০৪৪৫৪৭২

স্নেহময় গাঙ্গুলী
বোলপুর, বীরভূম
মোঃ-৯৪৭৫০০৭১৬৮

অমরেশ চ্যাটার্জ্জী
ইলামবাজার, বীরভূম
মোঃ-৯৪৩৪৫৮২১০৯

রুদ্রনাথ দত্ত
গড়গড়িয়া, বীরভূম
মোঃ-৯৭৩২২২৯৮২৫

প্রাক্কথন

১৯৮৪ সালে বীরভূমের শ্রীনিকেতনে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও যোগাঙ্গ আলোচনার একটি কেন্দ্র তথা পাঠচক্র স্থাপিত হয়। সে বছর থেকেই স্বপ্ন নির্দেশে মানুষের দর্শন অনুভূতি নিয়ে হাতে লেখা ‘‘মানিক’’ পত্রিকা (বছরে দুটি সংখ্যা) প্রকাশিত হয়ে চলেছে। পরে বিভিন্ন স্থানে এই ভাবধারার আরও কয়েকটি পাঠচক্র গড়ে ওঠে। মানিক পত্রিকাও সমৃদ্ধ হয়। প্রথম ২০টি সংখ্যার সার সংক্ষেপ সংকলন করে মানিকের একটি বিশেষ সংখ্যা ছেপে প্রকাশ করা হয় ১৯৯৩ সালে।

দীর্ঘকাল বাদে পত্রিকাগুলি সকল আগ্রহী মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য নিয়মিতভাবে ঐ সকল পত্রিকা ছাপানোর সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মানিকের ৫৭ সংখ্যা থেকে ৬০ সংখ্যা পর্যন্ত মোট ৪টি পত্রিকা ছাপিয়ে এই উদ্যোগের শুভ সূচনা করা হচ্ছে।

মানিক পত্রিকায় আছে কয়েকটি অধ্যায়। ‘‘প্রথম আলো’’ অধ্যায়ে নূতন যারা আত্মিক অনুভূতি লাভ করছেন তাদের দর্শনের কথা আছে। ‘‘স্বপন মাধুরী’’ কতকগুলি মিষ্টি স্বপ্ন দর্শনের সম্ভার। ‘‘নবীনা’’ অধ্যায়ের স্বপ্নে পাঠক নতুন জ্ঞানের সন্ধান পাবেন। পাঠ ও আলোচনায় উঠে আসে নতুন ব্যাখ্যা – যার কিছু নিদর্শন থাকে ‘‘পাঠপ্রসঙ্গ’’ অধ্যায়ে। আর শেষে ‘‘স্মৃতি কথা’’-য় শ্রী জীবনকৃষ্ণের সঙ্গকারী মানুষদের টুকরো কিছু স্মৃতিচারণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

‘‘মানিক’’ পত্রিকায় প্রকাশিত দর্শন-অনুভূতিতে জগৎচৈতন্যের ক্রমবিকাশের একটি পরিচয় পাওয়া যায়। তাই বিভিন্ন কালপর্বে চৈতন্যের প্রবাহের গতিপ্রকৃতি অনুধাবনে উৎসাহীজনদের কাছে এই ‘‘প্রবাহ’’ নামের মানিকের সংকলন হয়ে উঠতে পারে মূল্যবান দলিল।

গ্রন্থের শেষে পাঠের দুটি নমুনা সংযুক্ত হল। আধ্যাত্মিক রসপিপাসু পাঠকদের কাছে এটি সমাদৃত হবে এবং তাদের মতামত ‘‘প্রবাহের’’ পরবর্তী সংখ্যা উপস্থাপনে সহায়ক হবে বলে আশা রাখি।

ইতি–
১লা জানুয়ারী, ২০১৮

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১। মানিক ৫৭ সংখ্যা	১-২৭
২। মানিক ৫৮ সংখ্যা	২৯-৬০
৩। মানিক ৫৯ সংখ্যা	৬১-৯২
৪। মানিক ৬০ সংখ্যা	৯৩-১৩২
৫। পাঠ পরিক্রমা –১	১৩৩-১৪৫
৬। পাঠ পরিক্রমা – ২	১৪৭-১৭০

মানিক ৫৭ সংখ্যা

ভূমিকা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, "একজন আগুন করে আর দশজনে পোহায়।" একজনের অগ্নিবিদ্যা লাভ হলে তার ফল পায় অন্য বহু মানুষ। সচ্চিদানন্দগুরু লাভ থেকে অবতারত্ব পর্যন্ত সাধন সাধক নিজের ভিতরে দেখেন ও আস্বাদন করেন। অন্যে টের পায় না। বাইরে যেটুকু যৌগিক বিভূতি প্রকাশ পায় তা থেকে অনেকে অনেক রকম অনুমান করেন মাত্র। পরবর্তী পর্যায়ে তার সাধনের ফল লাভ করে অপর কিছু মানুষ। তাঁকে সচ্চিদানন্দগুরু রূপে ভিতরে দেখে তাদের দ্বিতীয় স্তরে অবতারত্ব পর্যন্ত সাধনের অনুভূতি হয়। যেমন, প্রথম স্তরের অনুভূতিতে, পঞ্চভূমিতে মন উঠে এলে সাধক দেখেন তারই উপরার্ধ পুরুষ ও নিম্নার্ধ নারী হয়ে গেছে অর্থাৎ তিনি অর্ধনারীশ্বর - তিনি পুরুষও বটেন আবার নারীও বটেন। দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি যাদের তারা এ জিনিস তাদের কারণশরীরে দেখেন (স্থূল শরীরে নয়)। তারা দেখেন ঐ সাধককে (প্রথম স্তরের অনুভূতি যার) বা অজানা মানুষকে অর্ধনারীশ্বর রূপে।

অবতারত্ব অতিক্রম করে আত্মিক অবস্থা আরও উন্নত হলে সাধককে প্রতীকি লক্ষণসহ ভগবান রূপে, পরমাত্মারূপে বা পরমব্রহ্ম রূপে অনেকে দর্শন করে। তাঁর বিশ্বব্যাপী সত্তার (universal self-এর) পরিচয় পায় এবং তাঁর ব্রহ্মতেজ লাভ করে। এটি তার বৃহৎ ব্যষ্টিসত্তা।

এর পরবর্তীকালে অর্থাৎ তৃতীয় ধাপে তাঁর ব্যক্তিসত্তা পুরোপুরি লোপ পায়। উঠতে বসতে খেতে শুতে তার প্রতিটি ক্রিয়ায় তিনি অনুভব করেন তিনি না, অন্য কেউ তা করছে। তিনি খেলেন না, জিতেন খেল, তিনি মুখ পুঁছলেন না, আনন্দ মুখ পুঁছল, তিনি নস্যি নিলেন না ভোলা নস্যি নিল, তিনি পা মেললেন না, সুব্রত পা মেলল অর্থাৎ তিনি নেই, তিনি মনুষ্যজাতির মধ্যে বিলীন হয়েছেন। মনুষ্যজাতিও তাঁকে ভিতরে দেখে উপলব্ধি করে যে তাদের প্রাণের স্বরূপ ঐ ব্যক্তি। হ্যাঁ, বাস্তবে শ্রীজীবনকৃষ্ণের জীবনে এমনটাই ঘটেছে। তাঁর চিন্ময়রূপ অসংখ্য মানুষের ভিতর ফুটে ওঠায় তারা বাইরে ভিন্ন হলেও

আত্মিকে যে এক তা অনুভব করতে পারছে। সকল সংস্কার উচ্ছেদ করে মনুষ্যজাতির সাথে এই আত্মিক ঐক্য অনুভবই মানুষের ধর্ম—সমষ্টির ধর্ম।

শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেহে যে অগ্নিবিদ্যার সূচনা হয়েছিল এবার আর দূর থেকে তা দেখা বা আঁচ পোহানো নয়, বহু মানুষ তাঁর সেই আগুনের স্ফুলিঙ্গ আপন অন্তরে লাভ করে ও এর পরিণতিতে অহংশূন্য হয়ে (অহং জ্বলে গিয়ে) জগতের সকল মানুষের সাথে আত্মিকে একাত্মতা অনুভব করে। বহুজনের এই আত্মিকে এক হওয়ার অনুভূতি এবং মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টিকারী সংস্কার উচ্ছেদ করে একসাথে এগিয়ে চলাই প্রকৃত সমষ্টির সাধন।

বহু হাজার বছর আগে ঋক্‌বেদের ঋষি দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বোমনাংসি জানতাম।" তোমরা একসাথে চল, একমন হও, একরকম বাক্য ব্যবহার কর। আমি তোমাদের সকলকে সমান সম্মান দিয়ে মন্ত্র রচনা করব। যজ্ঞে প্রদত্ত হবি পরস্পর বিবাদ না করে তোমরা গ্রহণ কর।

এ যুগে ব্রহ্মবিদ পুরুষ শ্রীজীবনকৃষ্ণেরও অন্তরে জেগেছে নরদেবতাদের উদ্দেশ্যে অনুরূপ প্রার্থনা—জগতের নরনারী শিশুবৃদ্ধ সকলে তাঁর ব্রহ্মত্ব লাভ করুক ও এক হোক — এই প্রার্থনা বাস্তবায়নের দায়িত্বও নিজে গ্রহণ করেছেন। তাই বহু মানুষ তাদের স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ধারায় শ্রীজীবনকৃষ্ণকে দর্শন করে তাঁর ব্রহ্মত্ব লাভ করছে। সাধন জগতে তারা কতখানি এক হয়ে উঠছে তার পরিচয় ফুটছে তাদের দেবস্বপ্নে।

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৯

প্রথম আলো

বিগত ছয় মাসের মধ্যে নতুন যারা স্বপ্নে বা জাগ্রতে শ্রীজীবনকৃষ্ণের চিন্ময় রূপ দর্শন করে জীবনকৃষ্ণের সর্বজনীনতা ও সর্বকালীনতার প্রমাণ বয়ে এনেছেন এবং সত্য ধর্ম রূপ আত্মিক একত্বের মহত্ব উপলব্ধি করে জীবনে নতুন আলোর সন্ধান পেয়েছেন বলে আমাদের জানিয়েছেন তাদের কিছু দর্শন এখানে লিপিবদ্ধ করা হল।

চির চেনা

গত মাঘ মাসে (১৪১৮) এক রাত্রে স্বপ্নে দেখছি – আমাদের বাড়ির একটা মোষের দড়ি খুলে গেছে। আমি গ্রামের কয়েকজনকে চিৎকার করে ডাকছি মোষটাকে ধরার জন্য। তখন দেখছি সামনে একজন লোক এসে দাঁড়াল। খালি গা, ধুতি পরে। মাথায় ছোট ছোট চুল। সে বলল, তুমি মোষটার কাছে যাও। দেখ, তুমি নিজেই মোষটাকে ধরতে পারবে। কোন ভয় নাই। আমি তার কথায় মোষটার কাছে গিয়ে দেখছি, সত্যই সে কিছু করছে না। আমাকে ধরা দিল। আমি অবাক হয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে আছি দেখে বলল, তুমি আমাকে চিনতে পারলে না? আমি জীবনকৃষ্ণ। আমি তখন তাড়াতাড়ি তাঁকে প্রণাম করতে গেলাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই আমার প্রণাম নিলেন না। বললেন, 'না, না, আমায় প্রণাম করতে হবে না'। ... স্বপ্ন ভাঙল। শ্রী জীবনকৃষ্ণকে আমি এই প্রথম স্বপ্নে দেখলাম।

- মঙ্গলা পাল (সুলতানপুর)

ব্যাখ্যা ঃ শ্রীজীবনকৃষ্ণের রূপে দেহস্থ দেবত্ব জেগে উঠলে মানুষ নিজের জীবত্বকে (মোষকে) নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা লাভ করে। তিনি প্রণাম নেন না। তিনি যে মানুষের স্বরূপ - অপর ব্যক্তি নন।

* গত ১৫.৩.২০১২ তারিখ রাত্রে স্বপ্ন দেখছি - মনে হচ্ছে আজ শনিবার। পাঠ শুরু হবে। তাই দিদি (শিখা) ডাকতে এসেছে। তখন আমি পাঠের ঘরে এসে দেখছি, সতরঞ্জি পাতা রয়েছে। খাটের উপর একটা ছোট্ট টেবিলে পাঠের বই রাখা। কাউকে ওঘরে দেখতে না পেয়ে বাড়ীর প্রত্যেককে একবার করে ডাকলাম। ভাবলাম, ওরা একটু পর আসবে। তাই আমি একাই বসে বসে কানে হাত দিয়ে আগের দিনের পাঠের কথাগুলো একমনে ভাবছি।

হঠাৎ দেখছি - এক মহাপুরুষ সাদা ধুতি, সাদা চাদর গায়ে জড়িয়ে পায়ের উপর পা তুলে খাটের উপরে পাঠের বইয়ের সামনে বসে। বইয়ের পাতাগুলো উড়ছে। উনি আমাকে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, তাকাও! আমার দিকে তাকাও। আমি কী বলছি শোন। দেখো তোমার জীবনে অনেক উন্নতি হবে।

স্বপ্ন ভাঙার পর ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারলাম স্বপ্নে দেখা ঐ মহাপুরুষ শ্রীজীবনকৃষ্ণ ছিলেন।

- পিউ মুখার্জী (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যা ঃ শ্রীজীবনকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে দ্রষ্টার আত্মিক উন্নতি ঘটবে।

* মাত্র কয়েকদিন হল পাঠে যাচ্ছি। বয়স হয়েছে। ভাবলাম আমার কী আর অন্যদের মত ভাল দর্শন হবে? কিন্তু কী আশ্চর্য গত ৩০শে নভেম্বর রাত্রে স্বপ্নে দেখছি - আমি ছিপ হাতে মাছ ধরছি। হঠাৎ একটা বড় মাছ উঠল। তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানার উপর রাখলাম। তখন দেখি, এ তো মাছ নয়, এতো মানুষ। কী সুন্দর! ন্যাড়া মাথা। বোধ হচ্ছে এত ভাল মানুষ আর হয় না। আমার পরমপ্রিয় বলে তাকে জড়িয়ে ধরলাম। ... ঘুম ভাঙল। ফটো দেখে নিশ্চিত হলাম আমি স্বপ্নে শ্রীজীবনকৃষ্ণকেই দেখেছি। এই প্রথম তিনি কৃপা করে দেখা দিলেন। স্বপ্নটা ভাবলেই আনন্দ হচ্ছে।

- গোঁসাইদাসী কৈবর্ত্য (গড়গড়িয়া)।

ব্যাখ্যা ঃ মাছ - আত্মা। শ্রীজীবনকৃষ্ণের রূপে দ্রষ্টা নিজ আত্মাকে দেখছেন তাই প্রাণপ্রিয় মনে হচ্ছে।

* গত এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে এক রাত্রে স্বপ্নে দেখছি - পাঠ সম্মেলনের আয়োজন হয়েছে এক জায়গায়। ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে কিছু লোক বসে আছে। এক ভদ্রলোক পাঠ করছে মঞ্চে বসে। পাশে বিরাট জলাশয়। সেখানে একটি লঞ্চ দাঁড়িয়ে আছে। ঐ জলাশয় থেকে একটি বড় মাছ - মনে হচ্ছে কালবাউস - বেরিয়ে এল। মাছটা জীবনকৃষ্ণে রূপান্তরিত হল। লম্বা লম্বা পা ফেলে মঞ্চে বসে পাঠকের পাশে বসলেন। কিছুক্ষণ পর হেঁটে জলের কাছে গিয়ে মাছ হয়ে ডুবে গেলেন। মনে হচ্ছে ঐ লঞ্চে পাঠ হবে এরপর। কিন্তু সেটা হবে আরও উন্নতমানের পাঠ। ... ঘুম ভাঙল। এই প্রথম স্পষ্টভাবে শ্রীজীবনকৃষ্ণকে আমি স্বপ্নে দেখার সৌভাগ্য লাভ করলাম।

- পার্থসারথী ঘোষ (বেলঘরিয়া, কলকাতা)।

ব্যাখ্যা ঃ মাছ - আত্মা - এক। জল - একত্ব। লঞ্চে পাঠ হবে - এক ও একত্বের উপর ভিত্তি করে পাঠ হবে - ব্যষ্টির সাধন কথা নয়, তবেই উন্নত মানের পাঠ হবে।

চিরস্থায়ী

* দেখছি (১২-০৫-২০১২) - পিসিমনি আমাকে একটা জীবনকৃষ্ণের ফটো দিল - ল্যামিনেশন করা। আমি বললাম, এটা ভাঙবে না তো? পিসিমনি বলল, না। তখন ফটোটা একটা কাপড়ে ভাল করে মুড়ে সাইড ব্যাগে ভরে নিলাম। তারপর বাড়ি এলাম। ... ঘুম ভাঙল। স্বপ্নে এই প্রথম জীবনকৃষ্ণের রূপ দেখলাম যদিও ফটোতে।

- সৌমী বক্সী (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যা ঃ পিসিমণির মারফৎ দ্রষ্টা জীবনকৃষ্ণের কথা শুনেছিলেন তাই পিসিমণি জীবনকৃষ্ণের ফটো দিল। ভাঙবে না - এ যে সারা জীবনের অবলম্বন। কাপড়ে ঢেকে নিলাম - দেহের ভিতরে নিভৃত গোপনে প্রাণের ধনকে রাখলেন। যদিও ফটোতে—ভিতরে ঈশ্বরের ফটো দেখাও ঈশ্বরকে দেখা। 'ঘট পট ছায়া কায়া সব সত্য' - শ্রীরামকৃষ্ণ।

আগে তো পাইনি

* দেখছি (২৪/১২/২০১১) - এক জায়গায় পাঠ হচ্ছে। আমি ঢুকলাম। দেখছি সেখানে শ্রীজীবনকৃষ্ণও বসে আছেন। হঠাৎ মনে হল ওনাকে দেখে সকলের আনন্দ হয়। তাহলে আমারও তো আনন্দ হওয়া উচিত। যেই ভাবা অমনি তীব্র আনন্দ হতে শুরু করল। ... ঘুম ভাঙল। আমি জীবনে এত আনন্দ এর আগে কখনও পাইনি।

- সাগর ব্যানার্জী (নবম শ্রেণী)।

ব্যাখ্যা ঃ দ্রষ্টা বিশ্বমানব শ্রীজীবনকৃষ্ণের পরিচয় পেতে শুরু করল - ব্রহ্মানন্দ থেকে ভূমানন্দে উত্তরণ হল। তাই মনে হচ্ছে - এত আনন্দ আগে কখনও পাইনি। এটি দ্বিতীয় স্তরের (সাধারন মানুষের) ভূমানন্দ।

* দেখছি (Dec. 2011) - স্নেহময় জেঠু এসেছেন। ওনার হাতে

অনেকগুলি জীবনকৃষ্ণের ফটো। আমি জীবনকৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখেছি বলায় উনি বললেন, কোন্ রূপে ওনাকে দেখেছিস ফটোগুলো দেখে বল তো! আমি অতগুলো ফটো দেখেও কোন রূপটা আমি দেখেছি তা বলতে পারলাম না। ... ঘুম ভাঙল।

– সোমা দাস (গড়গড়িয়া)

ব্যাখ্যা ঃ ব্যক্তি জীবনকৃষ্ণকে প্রত্যেকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখে। তাই একজনের সাথে অপরের দেখা মেলে না। কিন্তু তাঁকে বিশ্বমানব রূপে দেখলে আর পার্থক্য থাকে না। তখন সকলেই এক জীবনকৃষ্ণের পরিচয় পায়। শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলতেন - তোদের মধ্যে আমার যে জীবন তোরা আমার সেই জীবনের চর্চা করবি।

হোক বিলীন

* গত ২৪-০১-২০১২ রাত্রে স্বপ্ন দেখছি - পাঠচক্রের সকলে পৃথিবীর উপর দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ এক জোরদার ভূমিকম্প হল। আমরা সবাই বলাবলি করতে লাগলাম যে এবার হয়ত সবকিছু মাটির ভিতর ঢুকে যাবে। কিন্তু তেমন কিছু হল না। শুধুমাত্র মন্দির, মসজিদ এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি মাটির তলায় ঢুকে গেল। তারপর ভূমিকম্প থেমে গেল। খানিকক্ষণ পর আবার ভূমিকম্প হল। তবে এবার কিছুই ধ্বংস হল না। শুধুমাত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির জায়গায় জীবনকৃষ্ণের মূর্তি উঠল। তারপর আমরা সবাই জীবনকৃষ্ণ নাম করতে লাগলাম। ... ঘুম ভাঙল।

- প্রিয়াংকা দাস দালাল (গড়গড়িয়া)।

ব্যাখ্যা ঃ নানান ধর্ম নয় - ধর্ম একটিই। — মানুষের ধর্ম - বিশ্বমানব শ্রীজীবনকৃষ্ণের প্রকাশে তার উপলব্ধি

* দেখছি - আমার ঠাকুমা দাদু ইত্যাদি অনেক লোক যারা মারা গেছে তারা আমার সামনে দাঁড়িয়ে। আমি তো ভাবছি এরা সব মৃত, তাও এদের দেখছি কিভাবে? তখন দেখছি সাদা পোষাক পরে উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় জীবনকৃষ্ণ এসে দাঁড়ালেন। এবার আমি ভাবছি তাহলে এইসব ব্যক্তিরা কি জীবনকৃষ্ণে বিলীন হয়েছেন? সঙ্গে সঙ্গে দেখছি ঐসব মৃত ব্যক্তিরা শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেহে

মিশে গেল। এরপর দেখছি লোকনাথ বাবা জীবনকৃষ্ণের পাশে দাঁড়িয়ে। ভাবছি ইনিও কি জীবনকৃষ্ণে বিলীন হয়েছেন? ভাবামাত্র দেখছি তিনিও জীবনকৃষ্ণের দেহে মিশে গেলেন। ... স্বপ্ন ভাঙল। - শিখা চ্যাটার্জী (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যা ঃ বেদ বলছে - ব্রহ্ম থেকেই সব কিছু উদ্ভূত হয় আবার তাতেই লয় হয় - সেই ব্রহ্মকে একজন মানুষের রূপে, জীবনকৃষ্ণরূপে দেখা যায়।

পদ্মনাভ

* মে মাসের প্রথম সপ্তাহে এক স্বপ্নে দেখছি - বাবার কাছে আমাদের বাড়িতে অনেক ছাত্র-ছাত্রী মিলে পড়তে এসেছি। কিন্তু দেখছি আমরা দুটো দলে ভাগ হয়ে বসেছি। হঠাৎ দেখছি আমাদের দলে জীবনকৃষ্ণ বসে আমাদের পাঠ শোনাচ্ছেন। আমরা তিনজন বন্ধু একসাথে বসেছি। মনে হচ্ছে আমি তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ। তিনি আমার দিকে চেয়ে কথা বলছেন। কিন্তু আমার অপর দুজন সঙ্গী জীবনকৃষ্ণকে 'পদ্মনাভ' বলে কথা বলছে। ঐ নামে একজন ছেলে আমাদের সাথে পড়ে। আমি ওদের বলছি, নারে উনি পদ্মনাভ নন, ওনার নাম জীবনকৃষ্ণ। কিন্তু ওরা শুনছে না। তখন বুঝলাম, ওরা জীবনকৃষ্ণকে পদ্মনাভ-এর রূপে দেখছে।

-শালিনী রুজ (অরবিন্দপল্লী, বোলপুর)।

ব্যাখ্যা ঃ দুটো দল - একদল অপরা বিদ্যা শিখছে, অপর দল পরা বিদ্যা শিখছে। পদ্মনাভ - বিষ্ণু - শ্রীভগবান।

* গত ফেব্রুয়ারী মাসে দেখছি — কয়েকজন লোক নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে। বরুণ ও আমি কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ বরুণ বলল, মানুষ হচ্ছে বড় মাছের এক একটা আঁশের মত। এটা যদি মানুষ বুঝত তাহলে নিজেদের মধ্যে এত যে ঝগড়াঝাঁটি এসব আর হোত না। . . .

ব্যাখ্যা ঃ মাছ - আত্মা। আত্মা এক। তাই এই যে বহু মানুষ দেখছি তারা বাহ্যত বহু, কিন্তু আত্মিকে এক।

-মন্দ্রিতা চ্যাটার্জী (ইলামবাজার)।

ব্যাঘ্র পালক

* গত চৈত্রমাসে (১৪১৮) এক স্বপ্নে দেখছি - অসংখ্য বাঘের একটা দল। সেই বাঘেদের মাঝে জয় আর বরুণ দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখেই আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলাম। হঠাৎ জয় একটা বড় বাঘকে আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, যা মামীমাকে ধরে নিয়ে আয়। বাঘটা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ধরার জন্য ছুটতে লাগল। আমিও বাঁচার জন্য ভয়ে তীব্র বেগে ছুটতে আরম্ভ করলাম। ছুটতে ছুটতেই ঘুম ভেঙে গেল।

- মিনতী ব্যানার্জী (সুলতানপুর)।

ব্যাখ্যা ঃ এযুগে মেষপালক বা রাখালরাজা রূপে নন, মানুষকে বাঘের তেজ দান করে তাদের নিয়ে উচ্চস্তরের ঈশ্বরীয় লীলা আস্বাদন করছেন।

* ২৫শে বৈশাখ ১৪১৯ দুপুরে স্বপ্ন দেখছি - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা ঘরে বসে কাঁদছেন আর ''দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে'' - গানটা গাইছেন। ঐ ঘরের দরজায় জীবনকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন। রবীন্দ্রনাথ যেন ওনাকে উদ্দেশ্য করেই গানটা গাইছেন। ওনার গান গাওয়া শেষ হলে জীবনকৃষ্ণ ওনার কাছে এসে ওনার দেহে ঢুকে গেলেন। ওনার শরীরে মিশে যাওয়ার সাথে সাথে রবি ঠাকুর আনন্দে, 'কে যাবি পারে, ওগো তোরা কে' - এই গানটি গাইতে লাগলেন। - প্রকৃতি ব্যানার্জী (গড়গড়িয়া)।

ব্যাখ্যা ঃ 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে' - গানটিতে ভগবানের প্রতি ভক্তের ভক্তি নিবেদনের ভাবটি পরিস্ফুট হয়েছে। অপরপক্ষে 'তোরা কে যাবি পারে' গানটিতে ভগবানের সঙ্গে, কর্ণধারের সঙ্গে তার একাত্মতার ভাবটি ফুটে উঠেছে। জীবনকৃষ্ণকে অন্তরে পেয়ে সাধারণ মানুষও এই দুই ভাব আস্বাদনে সক্ষম হচ্ছে।

দীনবন্ধু

* গত ডিসেম্বর ২০১১, এক রাত্রে স্বপ্নে দেখছি - একটা টিকটিকির মুখ দিয়ে বাচ্চা একটা টিকটিক বেরোচ্ছে। আমি বললাম, এ কী! ডিম না হয়ে

এভাবে মুখ দিয়ে বাচ্চা প্রসব হয় নাকি? তখন কে যেন গম্ভীর কণ্ঠে বলল, এ রকমই হয়। আমার মনে হল, তাহলে আমার ভাবার তো কোন প্রয়োজন নেই। যেখান থেকে কথাটা এল সেখান থেকেই সব কন্ট্রোল হয়। ...

- অমরেশ চ্যাটার্জী (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যা ঃ টিকটিকি - সত্যপ্রাপ্ত মানুষ। মুখ দিয়ে বাচ্চা প্রসব - ঈশ্বরত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্গুনের শক্তির ক্রিয়ায় ভিতরের সত্যকে বাইরে মুখের ভাষায় স্পষ্ট রূপদান করতে পারেন।

* গত ১৬.০৩.২০১২ তারিখে রাত্রে স্বপ্নে দেখছি - শান্তিবাবুর বাড়ির চাবি আমাকে একজন দিল। আমি ঘরে ঢুকে একটু পর বেরিয়ে দীনবন্ধুর বাড়ি গেলাম। সেখানে ঐ চাবিটা ফেলে আমি শ্রীধরদার বাড়ি গেলাম। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে দেখি শান্তি বাবু ঘরে ঢুকতে পায়নি, বৃষ্টিতে ভিজছে, চাবি নেই বলে। আমি তাড়াতাড়ি দীনবন্ধুর বাড়ী থেকে চাবিটা নিয়ে এলাম। ... ঘুম ভাঙল।

- জয়দেব দাস (সুরুল, শ্রীনিকেতন)।

ব্যাখ্যা ঃ ভগবানকে দীনবন্ধু, পরমদয়াল ইত্যাদি বলে ডাকলে শান্তি পাবার চাবি হারাবে। শ্রীধরদার বাড়িতে পাঠ হয়। তাই সেখান থেকে জানা গেল অন্তরে শান্তিলাভ করতে গেলে নিষ্কাম হয়ে ভগবানকে ডাকতে হবে। দীনবন্ধু বললেই পার্থিব সুখলাভের প্রার্থনা জাগবে।

স্রোত বেড়েছে

* স্বপ্নে দেখছি (২৮-৩-২০১২) - কাকা আর আমি গরু চড়াচ্ছি। ওদের জল খাওয়াতে হবে। পাশেই সমুদ্র। কাকা বললেন, জলে নেমে দেখুন স্রোতের টান কেমন তবেই ওদের নামাবো। জলে নেমে দেখি প্রচণ্ড টান - আমাকে টেনে নিচ্ছে। কোনক্রমে উঠে বললাম - এখানে স্রোতের টান খুব বেশি - অন্য কোথাও জল খাওয়াব। ...

- শ্রীধর ঘোষ (চারুপল্লী)।

ব্যাখ্যা ঃ সমুদ্র - একত্বের সমুদ্র - Ocean of Oneness। পাঠে এখন একত্বের

কথা বেশি হচ্ছে। এখানে গরু অর্থাৎ ভক্তদের (উত্তম ভক্ত হুড়হুড় করে দুধ দেয়) ভগবৎ প্রেম তৃষ্ণা মেটানোর আয়োজন করা যাবে না।

* স্বপ্নে দেখছি (ফেব্রুয়ারী ২০১২) - বরুন স্যার এবং অমরেশ স্যার পাঠ করছেন। পাঠে বসেই হঠাৎ সামনে দেখছি - বিশাল বড় উজ্জ্বল সূর্য। তার মধ্যে জীবনকৃষ্ণ। সেই জীবনকৃষ্ণের দেহ থেকে প্রথমে বের হল আর একজন জীবনকৃষ্ণ যার নিচের অংশ সাপের মত। এবার বের হল নৃত্যরত জীবনকৃষ্ণ এবং সবশেষে একজন ত্রিশূলধারী জীবনকৃষ্ণ। আমি বরুণ স্যারকে বলছি, স্যার দেখুন, দেখুন। ইনি বললেন, চিৎকার করিস না, যা দেখছিস দেখে যা। ... ঘুম ভাঙল।

- সুমিত রাহা (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যা ঃ তিনটি ধাপে জীবনকৃষ্ণের সম্যক পরিচয় প্রকাশ পাচ্ছে।

১ম) - সাপ অর্থাৎ কুণ্ডলিনী যোগে ব্যষ্টির সাধনে চরম উৎকর্ষতার প্রকাশ।

২য়) - জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বহু মানুষের অন্তরে ভগবান রূপে লীলারত (নৃত্যরত) শ্রীজীবনকৃষ্ণ।

৩য়) - ত্রিশূলধারী শিব - পরম এক - লীলাকে নাশ করে অদ্বিতীয় এক রূপে তাঁর প্রকাশ।

দুটি ছোবড়া

* ২৩শে চৈত্রের (১৪১৮) সকাল বেলা আমি ঠিক করেছিলাম যে মাষ্টার মশাই তরুন বাবুর কাছ থেকে 'ধর্ম ও অনুভূতি' বইটা নিয়ে আসব। হঠাৎ করে মা বললেন, আজ যেতে হবে না অন্য দিন যাবি। আজ গ্রামের বাড়িতে মা শীতলার পূজা আছে। দুপুর বেলা খাওয়ার পর শুয়ে পড়লাম। সেই সময় আমি একটা স্বপ্ন দেখলাম - রামকৃষ্ণদেব যেন স্বামী বিবেকানন্দের ছবি থেকে উঠে এসে বললেন, 'একজনকে কথা দিলে কথা রাখতে হয়। তুই বইটা আনতে যা, তোরই কাজে লাগবে। তোর আত্মোপলব্ধি হবে।' আমি বললাম মা যে বলেছে শীতলা পূজা আছে। তখন বললেন, শীতলা পূজার অর্থ দেহ শীতল করার প্রার্থনা করা। ওখানে গেলে তোর ঐ প্রার্থনা পূরণ হবে।' তারপর আস্তে আস্তে

রামকৃষ্ণদেব বিবেকানন্দের ছবির ভিতর মিলিয়ে গেলেন। ... ঘুম ভাঙল।

- সৌভিক মণ্ডল (পুরন্দরপুর)।

ব্যাখ্যা ঃ ধর্ম জগতে 'ধর্ম ও অনুভূতি' বইয়ের গুরুত্ব কতখানি তা বইটি পড়ার আগেই আত্মিক অনুভূতি লাভ করে দ্রষ্টা বুঝলেন।

* দেখছি (১৬/১/২০১২) - বাড়িতে পাঠ হচ্ছে। হঠাৎ নবজেঠু আমাকে বলল, কানটা পরিষ্কার করে দে তো! আমি মনযোগ দিয়ে পাঠ শুনছিলাম তাই বিরক্ত হলাম। তবু জেঠুর কান একটা কাঠি দিয়ে পরিষ্কার করে দিলাম। কিছুক্ষণ পর জেঠু বলল, কান তো পরিষ্কার করে দিলি বেশ শুনতে পাচ্ছি কিন্তু বুঝতে পারছি না। মাথাটা একটু পরিষ্কার করে দে। মায়ের কাছে স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে মাথার খুলি খুলে 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' দিয়ে ঘসে দিলাম। মনে হল ভাল পরিষ্কার হল না। মা তখন আর একটা ছোবড়া দিল - 'ধর্ম ও অনুভূতি' বইটা। দুটো ছোবরা একসাথে নিয়ে ঘষে দেওয়ায় মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল। তখন খুলিটা আবার লাগিয়ে দিলাম। ... স্বপ্ন ভাঙল।

- প্রকৃতি ব্যানার্জী (গড়গড়িয়া)।

ব্যাখ্যা ঃ মা - নির্গুণ।

জাতীয় সঙ্গীত

* স্বপ্নে দেখছি (১২.০২.২০১২) - এক স্থানে অনেকের মাঝে আছি। পাশে দেবোত্তম আছে। কে যেন বলল, জাতীয় সঙ্গীত হবে। উঠে দাঁড়ালাম। "আমাদের শান্তিনিকেতন" - গানটা হল। অবাক হলাম। এরপর দেবোত্তম আমার হাতে একটা আম দিল। ...

- জয়দেব দাস (সুরুল, শ্রীনিকেতন)।

ব্যাখ্যা ঃ শান্তিনিকেতনে আগে সব অনুষ্ঠানের শেষে "আজি সত্যের পরে মন করিব সমর্পণ, জয় জয় সত্যের জয়" - গানটা গাওয়া হত। পরে "আমাদের শান্তিনিকেতন" গানটা কবি লেখেন ও তা সব অনুষ্ঠানের শেষে দাঁড়িয়ে সমবেত কণ্ঠে গাওয়া শুরু হয়। এই গানে সকলের বাহ্যিক ভিন্নতা সত্ত্বেও আত্মিক একত্বের কথা তুলে ধরা হয়েছে এবং শান্তিনিকেতন কথাটিও প্রতীক হয়ে

উঠেছে। শান্তিনিকেতন নির্দিষ্ট কোন ভৌগোলিক সীমানা ঘেরা চৌহদ্দি নয়, একত্বের কৃষ্টি-বাহী মানুষদের মিলন স্থান। ব্যষ্টির সত্য উপলব্ধি ও সত্যাচরণের চেয়েও বড় এই সমষ্টিগত একত্ব অনুভব। এটিই ভারতের মর্মবাণী তথা জাতীয় সংগীত। শুধু কথায় নয়, সে অমৃত আস্বাদন যে বাস্তব ঘটনা তা দেবোত্তম আম দিয়ে বুঝিয়ে দিল॥

* ২৯শে নভেম্বর ২০১১, স্বপ্ন দেখছি - আমি একটা বাড়িতে আছি। আমার সঙ্গে জীবনকৃষ্ণও আছে। তাঁর দেহ থেকে আলো বেরোচ্ছে এবং ঘরটা আলোকিত হয়ে আছে। হঠাৎ আমার পাশের বাড়িতে যাবার ইচ্ছা হল। তখন জীবনকৃষ্ণ বললেন, ঐ বাড়িতে আলো নেই। এই বলে হাত নাড়িয়ে পাশের বাড়িতে যেতে বারণ করলেন। আমি তখন ওনাকে নানা প্রশ্ন করতে লাগলাম। উনি শুধু বললেন - আলো আছে তোর ভিতরে। ... ঘুম ভাঙল।

-অভিরূপ দাস (গড়গড়িয়া)।

ব্যাখ্যা ঃ "পিরীতি দেখিয়া পড়শী করিবে" - চণ্ডীদাস।

কেটে ফেলো ঃ

* আমি স্বপ্ন দেখছি যে আমার মা সংস্কারজ বিষয় নিয়েই থাকতে চাইছে। সেজন্য আমি কিছু না বললেও দূরত্ব একটা তৈরী হচ্ছে আমার সঙ্গে মায়ের। পরে হঠাৎ আমার মনে পড়ল যে পৃথিবীতে একজনই আছে। তখন আমি মা-কে বললাম, মা আমাকে কেটে ফেল যা হয় হবে। তখন আমার মা দা দিয়ে আমাকে গলায় আঘাত করে দুখণ্ড করে ফেলল। আমার মনে হ'ল আমার শরীরটা এবার জীবনকৃষ্ণের শরীর হয়ে যাবে। খুব আনন্দ হতে লাগল। সে সময় ঘুম ভেঙে যাওয়ায় স্বপ্ন থেমে গেল।

–রাজেশ চ্যাটার্জী (মকরমপুর, বোলপুর)

ব্যাখ্যা ঃ

মা – ভক্তের জগৎ। এই জগতের মানুষ দ্বৈতবাদের সংস্কার নিয়ে আছে। 'একং সৎ।' সেই এক জীবনকৃষ্ণ প্রত্যেকের স্বরূপ দ্রষ্টা তা উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু জগতের বহু মানুষ (মা) তাদের দর্শন-অনুভূতি শুনিয়ে এই

সত্য জানালে তবে দেহজ্ঞান গিয়ে (শরীর দুখণ্ড হয়ে) ঠিক ঠিক তা দেহে ধারণা হয় (দেহটা জীবনকৃষ্ণের হয়)। তাই মা-কে বললেন কেটে ফেলতে।

* গত ৭-২-২০১১তে পাঠ শুনতে শুনতে ট্রান্সে দর্শন হ'ল। পাঠে কথা হচ্ছে নিত্যসিদ্ধ নিয়ে। তখন দেখছি — পাঠকের পাশে একটা বড় কড়াই--এ প্রচূর মিষ্টি। মিষ্টিগুলো দেখতে পাঁচ আঙুল যুক্ত কব্জি পর্যন্ত হাতের মতো।

- কৃষ্ণ সাধন পাল (কালীমোহন পল্লী, বোলপুর)

ব্যাখ্যা ঃ শ্রীজীবনকৃষ্ণ, যিনি 'স্বেনরূপেন অভিনিষ্পদ্যতে' হয়েছেন তিনি নিত্যসিদ্ধ। আর সাধারণ মানুষ যারা তাঁকে দেখছে অন্তরে তারা এই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের মিষ্টরস আস্বাদন করতে ও নিত্যসিদ্ধ কী তা ধারনা করতে (হাত দিয়ে ধরতে) সক্ষম হচ্ছে। তারা দ্বিতীয় স্তরের নিত্যসিদ্ধ।

রামকাঠ

* স্বপ্নে দেখছি - আমাকে যেন জলের উপর একটি মৃতদেহ সৎকার করতে হবে। দেখছি জলের উপর একটি ছোট্ট কাঠের পাটা ভাসছে। মনে হচ্ছে এটা ভগবান রামচন্দ্র পাঠিয়েছে। ভাবছি পাটাটার উপর চড়লে ডুবে যাব না তো? বিভীষণ একজনের কাপড়ের খোঁটে রাম নাম লিখে দিয়েছিল। বলেছিল, এতে বিশ্বাস করে সমুদ্রের উপর হেঁটে চলে যেতে পারবে। লোকটি কিছু দূর সমুদ্রের জলের উপর হেঁটে যাবার পর কাপড়ের গিঁট খুলে দেখল তাতে শুধু 'রাম' নাম লেখা, তখন অবিশ্বাস এল ও জলে ডুবে গেল। কথামৃতের এসব কথা মনে পড়ছে। আমি কিন্তু বিশ্বাস করলাম না যে এটা রামের পাঠানো কাঠ আর রাম নামে বিশ্বাস করলে তবেই পাটাটা ভাসবে। তবু ওতে চড়লাম ও কিছুটা ভেসে গিয়ে মৃতদেহটা জলের উপর সৎকার করলাম - পুড়িয়ে দিলাম। তারপর এপারে ফিরে এসে কাঠটা জলেই রেখে দিলাম যাতে আরও অনেকে ব্যবহার করতে পারে। নিজের মনেই বললাম, এটা সত্যিই রামকাঠ। 'রামকাঠ' বলে জগতের লোকের পুজো পাবে। ...

- সব্যসাচী ঘোষ (চারুপল্লী)।

ব্যাখ্যা ঃ রাম - এক - ব্রহ্ম। রামকাঠ - একত্ব বা ব্রহ্মত্ব, জৈবী দেহের চিন্ময়

রূপে যার প্রকাশ। বিভীষণ অর্থাৎ ভক্ত নয়, স্বয়ং রাম পাঠিয়েছেন ঐ কাঠ, তাঁর ব্রহ্মত্ব বা একত্ব। এ যুগে নাম মাহাত্ম্যে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নেই। এই ব্রহ্মত্বলাভে মানুষ সংসার জলে থেকেই দেহজ্ঞান বিবর্জিত হতে পারবে ও ব্রহ্মজ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়ে ব্রহ্মানন্দ ভোগ করবে। তাঁর ঈশ্বরীয় অনুভূতি অপর অনেকের কাজে লাগবে।

বিশ্বরূপ

* দেখছি - আমি একজনকে অনুসরণ করে চলেছি। তিনি যেখানে যাচ্ছেন, আমিও চলেছি। কিন্তু আমি কারও সঙ্গে কথা বলছি না। উনি গ্রামে গেলেন, অনেকের সাথে কথা বললেন, তারপর স্কুলে গেলেন, বিলেত গেলেন কোট-টাই-প্যাণ্ট পরে। সেখানে সাহেবদের সাথে কথা বললেন। অনেক কাণ্ডের পর যখন আমার দিকে ফিরে তাকালেন তখন দেখি উনি স্বয়ং জীবনকৃষ্ণ। আর যা বলতে চাইছেন মুখ ফুটে বলতে হল না, আমার মুখ দিয়েই কথাটা বেরিয়ে এল - এই হল বিশ্বরূপ দর্শন। ... ঘুম ভাঙল।

- শুভজিৎ মল্লিক (সখের বাজার, কলকাতা)।

ব্যাখ্যা ঃ বিশ্বরূপ দর্শনের নতুন ব্যাখ্যা জানা গেল এই স্বপ্নে। ভগবানের ভিতর সব কিছু - বিশ্বব্রহ্মাণ্ড - এটুকু জানলে হবে না। তিনি একজন মানুষ - তাঁর জীবনধারার মধ্যে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসুর সব প্রশ্নের উত্তর আছে। তাঁর আত্মিক ও ব্যবহারিক জীবন পর্যালোচনাই বিশ্বরূপ দর্শন।

* গত মার্চ ২০১২-এর স্বপ্ন। দেখছি - বাড়ির ভিতর আছি। বাইরে প্রচণ্ড ঝড় আরম্ভ হয়েছে। জানতে পারলাম এই ঝড়ের মধ্যেই জীবনকৃষ্ণ আসবেন। হঠাৎ দেখছি আমার সামনেই বিশাল বড় জীবনকৃষ্ণের আউটলাইন (outline) ফুটে উঠল। সেখানে ধীরে ধীরে হাত, পা, মুখ সব স্পষ্ট হতে শুরু করল। যখন পুরো মূর্তিটা স্পষ্ট হল, তখন অবাক হয়ে দেখছি এটা আমার নিজের ছবি। ... খুব অবাক হলাম।

- সমরেশ চ্যাটার্জী (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যা ঃ শ্রীজীবনকৃষ্ণ অনুধ্যান ব্যক্তিপূজা বা Hero worship নয়, এ হল

আত্মপূজা, তিনি যে আমার স্বরূপ।

লক্ষ্য

* স্বপ্নে দেখছি (মার্চ ২০১২) - স্কুলে পরীক্ষা দিচ্ছি। প্রচুর ছেলে আমার সাথে পরীক্ষা দিচ্ছিল। হঠাৎ দেখছি কেউ নেই। আমি একাই পরীক্ষা দিচ্ছি। কিছুক্ষণ পর দেখছি কোনও ঘরও নেই। পুরো ফাঁকা ডাঙায় বসে পরীক্ষা দিচ্ছি। হঠাৎ আমার সামনে জীবনকৃষ্ণ এসে দাঁড়ালেন। বলছেন, তোকে এই সব পরীক্ষা দিতে হবে না। তুই একত্বের পরীক্ষা দে। এই বলে খাতাটা আমার কাছ থেকে নিয়ে একটা সাদা পাতা দিলেন। আমি সেখানে শুধু 'একত্ব' কথাটা লিখে দিলাম। উনি খুশি হয়ে বললেন, যা তুই পাশ করে গেলি। ... ঘুম ভাঙল।

- অমৃত চ্যাটার্জী (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যা ঃ ভগবৎ কৃপায় দ্রষ্টা সংস্কারমুক্ত হয়ে (সাদা কাগজ) 'একত্বই ধর্ম' - এটি ধারণা করতে পারলেন। এই ধারণা লাভই জীবনের উদ্দেশ্য।

* স্বপ্নে দেখছি (১৫/০৩/২০১২) - বাড়িতে একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড ফ্রিজ কেনা হয়েছে। সবাই বলছে ফ্রিজটা কমে পাওয়া গেছে কারন ওর ভিতরে একটা ভূত আছে। দেখছি সত্যি সত্যিই ভিতরে কিছু একটা নড়াচড়া করছে। আমি ভয়ে জীবনকৃষ্ণের নাম করতে শুরু করলাম। তখন দেখি আবছা একটা মূর্তি ফ্রিজ থেকে বেরিয়ে গেল। পরে দেখছি ফ্রিজের গায়ে একটা পাঠচক্রের প্রতিবিম্ব। সেখানে জীবনকৃষ্ণ স্বয়ং পাঠ করছেন, আমরা সবাই বসে আছি। আমি জীবনকৃষ্ণের নাম করছি আর শরীর হাল্কা হয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। স্বামীকে বললাম, আমায় ছুঁয়ো না। আমায় এখন ছুঁলে পড়ে যাব। ...

- করবী রুজ (অরবিন্দ পল্লী, বোলপুর)।

ব্যাখ্যা ঃ ভূত - পঞ্চভূতাত্মক দেহের দেহজ্ঞান। দেহজ্ঞান গিয়ে নিজের স্বরূপ উপলব্ধির পথ হল পাঠচক্রে যে জীবনকৃষ্ণ চর্চা হয় বাড়িতে এসে তারই মনন। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড ফ্রিজ - সংসারী মানুষের দেহ।

বহুতল

* স্বপ্নে ভগবান দেখালেন (২৫/০৪/২০১২) - দ্রষ্টা তাদের বাড়ির ছাদে বসে রয়েছে এবং তাদের বাড়ির পূর্বদিকে একটা বহুতল বাড়ি উঠেছে যার তৃতীয় তলটা নেই। শুধু যেন একপাশের দেওয়াল রয়েছে কিন্তু বাকী তিন দিকের নেই। তার উপর অনেক তলা বাড়ি যেন উঠে গেছে। দ্রষ্টার ভীষণ অদ্ভুত লাগছে এই ভেবে যে বাড়িটির ব্যালেন্স থাকছে কিভাবে? .. আরও মনে হল মালিক তিন তলা করার অনুমতি পাননি। জোর করেই ঐ রকম করেছেন। পরে অনুমতি পেলে চারদিকেই হয়ত দেওয়াল তুলবেন। ...

- শুভাশীষ দাস (বোলপুর)।

ব্যাখ্যা ঃ জীবনকৃষ্ণের সাধনের তিনটি ধাপের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে সাধারণ মানুষের ধর্ম।

একতলা - সচ্চিদানন্দগুরু লাভ থেকে অবতারত্ব পর্যন্ত ষোলআনা ব্যষ্টির সাধন।

দোতলা - অবতারত্বের পর থেকে পরমব্রহ্ম অবস্থা পর্যন্ত বিশ্বব্যাপিত্ব বা বৃহৎ ব্যষ্টির সাধন, তখনও পৃথক ব্যক্তিসত্তা বজায় আছে।

তিনতলা - শুধু তাঁর জৈবীদেহের চিন্ময়রূপকে ভিত্তি করে (একটি দেওয়াল) অসংখ্য মানুষের সমষ্টির ধর্ম - একত্বের ধর্ম রচিত হল (তিন তলার পরবর্তী বহুতল)।

অনুমতি পান নি - তিনি যে জোর করে মানুষের অন্তরে ফুটে উঠছেন, অনুমতির তোয়াক্কা না করেই।

বিপ্লব চলছে

* ০৫.০৩.২০১২ তারিখ রাত্রে স্বপ্ন দেখছি পাঠের সবাই জীবনকৃষ্ণের সঙ্গে কোথাও বেড়াতে যাবে। অনেকে তৈরী হয়ে গেছে কেউ কেউ ঘুমোচ্ছে। জীবনকৃষ্ণ বললেন, বাকীদের ডেকে দে। পরে স্নান করে রেডি হয়ে উনি রেলস্টেশনের দিকে হাঁটা দিলেন। পায়ে তার নতুন জুতো আর বাঁ হাতে একজোড়া জুতো। ওনার পিছন ধরে আমরা সবাই চলেছি। একজন অপরিচিত মহিলা কানে কানে বলল, নতুন জীবনকৃষ্ণ এসেছে জান? আমি বললাম, হ্যাঁ।

তখন দেখি জীবনকৃষ্ণকে বিপ্লব চ্যাটার্জীর মত লাগছে। বললাম, বিপ্লব চ্যাটার্জীই তো নতুন জীবনকৃষ্ণ। উনি স্টেশনে এসে পায়ের জুতোটি ছেড়ে হাতে রাখা জুতোটা পরে ট্রেনে উঠলেন। ওনার ছাড়া জুতো জোড়াটি বহু জোড়া জুতো হয়ে গেল। আমরা সবাই ঐ জুতো পরে ট্রেনে উঠে গেলাম।

-সবিতা ঘোষ (চারুপল্লী)।

ব্যাখ্যা ঃ ধর্ম জগতে আরও একবার বিপ্লব আসছে - সকলকে জীবনকৃষ্ণময় করে (তাঁর জুতো পরিয়ে) সমষ্টিগত ধর্মের এক নূতন অধ্যায় শুরু হতে চলেছে (ট্রেনে যাওয়া)।

* গত ডিসেম্বর ২০১২ - এক রাত্রে স্বপ্ন দেখছি - পাশের বাড়ির বাচ্চা মেয়ে পূজা "আলো আমার আলো" - গানটা ভাল গায়। ওকে বললাম, ঐ গানটা একবার শোনা। ও রাজী হয়ে আমার কোলে বসে গাইতে লাগল নতুন একটা গান - 'নতুন সূর্য আলো দাও মোরে আলো দাও' .... আমি অবাক হয়ে শুনছি আর ভাবছি এ গান ও কোথায় শিখল! ... ঘুম ভাঙল।

- জয়কৃষ্ণ চ্যাটার্জী (চারুপল্লী)।

জ্ঞানচক্ষু

জ্ঞানচক্ষু খুললে তবেই মায়ার রহস্য উন্মোচিত হয়ে আত্মার সাক্ষাৎকার হয় সাধকের। এই জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের অনুভূতি আছে। প্রথম স্তরের অনুভূতিতে শ্রীজীবনকৃষ্ণ দেখেছিলেন — দুটি চক্ষু থেকে দুটি জ্যোতির্গোলক বেরিয়ে এসে ভ্রূমধ্যে মিলিত হয়ে একটি গোলক হয়ে গেল। তার মধ্যে ছোট্ট সোনার বুদ্ধমূর্তি দেখা গেল। বুদ্ধ জ্ঞানের প্রতীক। এই দর্শনকে ত্রিনয়ন বা জ্ঞানচক্ষু ফোটা বলে।

ব্যবহারিক জগতে যখন মানুষের দুটি চোখের দৃষ্টি মিলিত হয়ে একটি বস্তুর উপর পরে তখন বস্তুটি দেখার সঙ্গে সঙ্গে মননও হয় অর্থাৎ মনযোগ সহকারে দেখা হয়। তেমনি জ্ঞানচক্ষু খুললে আত্মিক দর্শন সমূহের মর্মার্থ

বুঝতে সক্ষম হন দ্রষ্টা।

দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতিতে চক্ষুষ্মান ঐ পুরুষকে, শ্রীজীবনকৃষ্ণকে, ভিতরে দেখলেই জ্ঞানচক্ষু দর্শন হয়ে যায়। কেউ কেউ শ্রীজীবনকৃষ্ণের ভ্রূমধ্যে জ্ঞানচক্ষু দেখেন (স্নেহময় গাঙ্গুলীর দর্শন)। কেউ বা দেখেন, 'বাবা একটি মাছের চোখ এঁকেছিল — তা জীবন্ত হয়ে গেল (প্রকৃতি ব্যানার্জীর দর্শন)' ইত্যাদি। মাছ — - আত্মা। মাছের গোলাকৃতি চোখ — প্রতীকে জ্ঞানচক্ষু।

দ্বিতীয় স্তরের এই দর্শনের ফল (কঃঃংহঞ্জ) কী ? জগৎ ব্যাপ্ত অখণ্ড চৈতন্যকে তথা অখণ্ড চৈতন্যের ঘনমূর্তি বিশ্বমানব শ্রীজীবনকৃষ্ণকে জানা। তাই সন্তোষ দাস বৈরাগ্য স্বপ্নে দেখলেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ঘরে বসতে দিয়ে দ্রষ্টা ফুল চন্দন দিয়ে পুজো করতে উদ্যত হলেন। ঠাকুর বললেন, ওভাবে নয়, আমার পুজো করতে চাইলে আমাকে শ্রীজীবনকৃষ্ণের কথা শোনা। "শ্রীজীবনকৃষ্ণ" বইটা পড়ে শোনাতে গিয়ে দ্রষ্টা দেখেন ভাল দেখতে পাচ্ছেন না। তখন উনি বললেন, আয়, আমি তোর জ্ঞানচক্ষু খুলে দিচ্ছি, বলে দ্রষ্টার ভ্রূমধ্যে ওনার বুড়ো আঙুল চেপে ধরলেন। পরক্ষণে ছেড়ে দিলেন। এবার দ্রষ্টা বেশ স্পষ্ট ভাবে লেখাগুলো পড়তে পারলেন। ঠাকুর খুব খুশি হলেন।

দ্বিতীয় স্তরের ষোলআনা জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে শ্রীজীবনকৃষ্ণের সঙ্গকারী শ্রীভূপতি রঞ্জন দাশের অনুভূতিতে। উনি দেখেছেন - — শ্রীজীবনকৃষ্ণের সাথে কথা বলছেন। এমন সময় একজন অন্ধ লোক সেখানে এল। দ্রষ্টা তার বাঁ চোখের পাতার উপর "জীবনকৃষ্ণ" কথাটা লিখে দিলেন একটা সোনালী কলম দিয়ে। অমনি সে চোখ মেলে তাকাল — দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। স্বপ্নদ্রষ্টার ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল — "অন্ধজনে দেহ আলো মৃতজনে দেহ প্রাণ"।

শ্রীজীবনকৃষ্ণের সাথে কথা হচ্ছে — তিনি এক আবার বহু। বহুমানুষের অন্তরে চিন্ময়রূপ ধরে ফুটে উঠে আত্মিকে তাদেরকে নিজের সত্তায় সত্তাবান করে তুলছেন। এই বহুরূপী জীবনকৃষ্ণের সাথে কথা হচ্ছে। কোথায় ? না পাঠে — যেখানে অন্তর্মুখ হয়ে মানুষ ঈশ্বরচর্চা করে। যেখানে তাদের মধ্যে বিশ্বজনীন চৈতন্য সত্তার প্রকাশ। একজন অন্ধলোক এল — অর্থাৎ নজরে এল

মানুষের দৃষ্টি নানান কু-সংস্কারে আবদ্ধ হয়ে আছে। তারা সত্য কী তা দেখতে পায় না। এরপর তাদের অন্ধত্ব নিবারণের পথও বোধগম্য হ'ল। 'শ্রীজীবনকৃষ্ণ' নাম চোখে লেখা হ'ল। নাম লেখা মানে প্রতীকে শ্রীজীবনকৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রকাশকারী দর্শনের কথা বলা। কেননা লিপি তো হায়ারোগ্লিফিক্স অর্থাৎ প্রতীক ব্যাঞ্জনাময় চিত্রলিপি। শ্রীজীবনকৃষ্ণের কথা শুনে তাঁর কৃপা পরশে দৃষ্টিভঙ্গী বদলে যায়। জ্ঞানের আলো পায় মানুষ। জীবনকৃষ্ণ নামের মধ্যে দিয়ে সুপ্ত চৈতন্য জাগ্রত হয়ে ওঠে, নতুন প্রাণ পায় শ্রোতা।

এইভাবে দ্বিতীয় স্তরে জ্ঞানচক্ষু লাভ করেও অপর বহু মানুষের চোখে জ্ঞানের আলো দেওয়া ও নবজীবন দান করা সম্ভব হয়। এই জ্ঞানচক্ষু কেমন? এ যেন মৌমাছির মত পুঞ্জাক্ষি বা বিশালাক্ষি। বহু মানুষের দেবস্বপ্নের কথা শুনে দেব মহিমা দর্শন করে, বহু মানুষের দেবস্বপ্ন থেকে একটি বিষয় সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ হলে বহু চোখ দিয়ে দেখা হয়। এই-ই ষোলআনা জ্ঞানচক্ষু লাভ।

আমাদের মনে রাখতে হবে এযুগে সমষ্টির সাধন। সকলের সাথে আত্মিকে সকলে বিজড়িত। তাই একজনের স্বপ্ন অন্যের আত্মিক অবস্থাকেও নির্দেশ করে। গাছে একটি ডালে ফুল ফুটলে বোঝা যায় গোটা গাছটি ধlow-ering Stage-এ পৌঁছে গেছে। অধিকাংশ ডালই ফুল ফোটার মত অবস্থায় রয়েছে। তাই অপরের স্বপ্নে নিজের স্বপ্নের ব্যাখ্যা ও নিজের আত্মিক অবস্থার পরিচয় মেলে। অপরের দর্শন শোনাও এক অর্থে দেখা।

একটি উদাহরণ — স্নেহময় গাঙ্গুলী স্বপ্নে দেখলেন, গরুর গাড়ী চড়ে শ্রীজীবনকৃষ্ণের সাথে কোথায় চলেছেন। পথে একজন মুসলিম ভদ্রলোককে দেখে জীবনকৃষ্ণ নেমে পড়লেন। গাড়ী থামল। গাড়ীতে কোনো ড্রাইভার নেই। মুসলিম ভদ্রলোকের পায়ে বিরাট ক্ষত। তবুও চলাফেরা করতে পারছেন। জীবনকৃষ্ণ কীসব কথা বলতে লাগলেন ওনার সাথে।

স্বপ্নটি পাঠে বলা হল। মানে করা গেল না। তখন অমরেশ চ্যাটার্জী ওর দেখা একটি স্বপ্ন বলল। অনেকে পাঠে এসেছে। সকলে সেই বাড়ির এক আম গাছ থেকে আম পেড়ে খাচ্ছে। ওর হাতেও একটা আম এসে গেল। খেয়ে

দেখল সেটা টক আবার মিষ্টি। হঠাৎ নজর পড়ল সবিতাদির শাড়িতে। সেখানে কিছু নুন লেগে রয়েছে। এই নুন ছাড়িয়ে তাই দিয়ে আমটি খেল। এবার খুব মিষ্টি লাগল।

জানা গেল অপরের দর্শনের সাহায্য নিয়ে নিজের স্বপ্নের মানে করতে হয়। এমন সময় পাঠের আর এক সদস্য হৃদয় ঘোষ বলল, সে একটা স্বপ্ন দেখেছে এক মাস আগে। পাঠে সেটি বলা হয় নি। ও দেখেছে মাঠের মধ্যে অজস্র সাপ ঘোরাফেরা করছে। দ্রষ্টা ভয় পাচ্ছে। এমন সময় দেখা গেল আলখাল্লা পরিহিত এক ভদ্রলোক লাঠি দিয়ে সাপগুলোকে মারছে। প্রচুর সাপ মারা গেল। অনেকে ভয়ে পালাল। দ্রষ্টা ভয়মুক্ত হয়ে ঐ মানুষটিকে কাছে থেকে দেখে চমকে উঠল, আরে এতো জীবনকৃষ্ণ। উনি বললেন, অনেকে ভাইবোনে বিয়ে করে। এটা খুব খারাপ। এ রকম যেন করিস না। .... ঘুম ভাঙল। দ্রষ্টা বিবাহিত। তাদের বংশে কেউ এমনটি করেনি। তবে এমন স্বপ্ন কেন ? দ্রষ্টার মনে হ'ল জীবনকৃষ্ণ বলতে চাইছেন ওটা নিম্নমানের কৃষ্টি।

এবার মানে পাওয়া গেল। এখানে সাপ মানে নিম্নমানের কৃষ্টি (ওঞ্ক্ষ-ঞ্জঞ্ক্ষ্ক) যার একটি লক্ষণ ভাইবোনের মধ্যে বিয়ে। এই কৃষ্টিকে সংশোধন করে উন্নত কৃষ্টিতে উত্তীর্ণ করার কাজটি করছেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। স্নেহময়ের স্বপ্নে মুসলিম ভদ্রলোকটির পায়ে বিভৎস ক্ষতটি নিম্নমানের কৃষ্টির কুফল। অন্তরে শ্রীজীবনকৃষ্ণের সঙ্গলাভে তা সংশোধনের প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। নতুবা অন্যদেরও অগ্রগতি ব্যাহত হবে যে !

হৃদয়ের স্বপ্ন থেকে স্নেহময়ের স্বপ্নের আপাত টক অংশটিরও ইতিবাচক ব্যাখ্যা পাওয়ায় পুরো স্বপ্নটি মিষ্টি বলে অনুভব করা যাচ্ছে।

পাঠ প্রসঙ্গ

পাঠ ও আলোচনা প্রসঙ্গে কিছু কথার গভীরতর অর্থ প্রকাশ হয়ে পড়ে, কখনও বা জীবনকৃষ্ণ প্রদত্ত ব্যাখ্যা আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। এখানে সেইরকম কিছু ব্যাখ্যার উদাহরণ সংকলিত হল।

*** ছেলে ঘুড়ি কিনবার জন্য মা'র আঁচল ধরে পয়সা চায়। মা হয়ত আর মেয়েদের সাথে গল্প করছে, প্রথমে কিনে দিতে চায় না। বলে, না তিনি**

বারণ করে গেছেন, তিনি এলে বলে দিব। এক্ষুণি ঘুড়ি নিয়ে একটা কাণ্ড করবি। যখন ছেলে কাঁদতে শুরু করে মা অন্য মেয়েদের বলে, রোস মা এ ছেলেটাকে শান্ত করে আসি। এই বলে চাবিটা নিয়ে কড়াৎ কড়াৎ করে বাক্স খুলে একটা পয়সা ফেলে দেয়। — কথামৃত।

ঠাকুর মা, মা, করে নিজের ভিতর জগজ্জননীকে পেয়ে মা হয়ে গেছেন। তার ভক্তরা অর্থাৎ সন্তানরা তার যোগৈশ্বর্যের ভাগ নিয়ে মুক্তির স্বাদ অনুভব করতে চায় (ঘুড়ি ওড়াতে চায়)। ঠাকুর অবতার - তিনি সচ্চিদানন্দগুরু রূপে অন্যের অন্তরে ফুটে উঠে তাদের দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি দান করতে পারেন, ব্রহ্মজ্ঞান দান করতে পারেন। ঠাকুরের দেহে সগুন ব্রহ্মের ষোলআনা প্রকাশ ও লীলা হয়েছে। তার সাধনের ফল দ্বিতীয় স্তরে যারা পায় তাদের এক আনা বা এক কলা বা এক পয়সা। তাই ঠাকুর মহাপুরুষ মহারাজকে বলছেন, আমার ষোলটাং, তোদের একটাং। শ্রীমর জন্য বলছেন, মা ওকে এক কলা দিলি কেন? ও বুঝেছি, ওতেই জীবশিক্ষে হবে। ধর্ম ও অনুভূতিতে উল্লেখ আছে একজন স্বপ্নে দেখলেন, তার সচ্চিদানন্দগুরু তাকে একটি পয়সা দিয়েছিল, তাতেই তার অবতারত্ব পর্যন্ত (দ্বিতীয় স্তরে) অনুভূতি হয়েছিল। কড়াৎ কড়াৎ করে বাক্স খুলে পয়সা দেওয়া - মহামায়া কৃপা করে সপ্তমভূমি যাবার দ্বার খুলে দেন ও সপ্তম ভূমিতে সগুন আত্মা দর্শন করিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান দান করেন। উনি (ছেলের বাবা) অর্থাৎ নির্গুন ব্রহ্ম বারণ করে দিয়েছেন। বেশী দিলে একটা কাণ্ড করে বসবে। অর্থাৎ নির্গুনের অফুরন্ত শক্তির ভাণ্ডার সাধারণ মানুষের কাছে খুলে গেলে তারা ভক্তির চিরাচরিত পথ ধরে চলবে না। তারাও অনুভব করবে যে প্রত্যেকেই ব্রহ্মের এক একটি রূপ। আত্মিকে ছোট বড় ভেদ নেই - সকলেই সমান। তখন গুরু-শিষ্য, ভক্ত-ভগবান ইত্যাদি সম্পর্ক অস্বীকার করে বসবে। ঠাকুরের ভাষায়, একটা কাণ্ড করে বসবে।

পরবর্তীকালে শ্রীজীবনকৃষ্ণ এলেন। তিনি নির্গুনে লয় হয়ে নির্গুনের মূর্তরূপ হয়ে উঠলেন। তাঁকে অন্তরে দর্শন করে সাধারণ মানুষের জীবনে নির্গুণের দ্বার খুলে যায়। নির্গুণের অফুরন্ত শক্তিলাভে তারা যে অনন্ত শক্তির আধার তা অনুভব করতে শেখে। আর এক পয়সা নিয়ে ব্যষ্টিতে আবদ্ধ

অবতারতত্ত্বের লীলা দেখে সন্তুষ্ট থাকে না - ব্যষ্টির সাধন তুচ্ছজ্ঞান করে সমষ্টির সাধনে সমগ্র মনুষ্য জাতির মধ্যে এক অখণ্ড চৈতন্যের প্রকাশ উপলব্ধি করে। তারা মনুষ্যজাতির সঙ্গে এক হয়ে জীবন্মুক্তির স্বাদ অনুভব করে। আকাশের যেখানে খুশি যত উচ্চে খুশি মন ঘুড়ি উড়িয়ে পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে, কোনো সীমা মানে না। তাই সখের বাজারের গীতা ঘোষ স্বপ্নে দেখলেন, ঘরের মধ্যে বিরাট একটা মাছ এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াছে। দ্রষ্টা ওকে ধরতে গেলে ও জানলা দিয়ে উড়ে পালালো। মাছটার ডানা রয়েছে। ও উড়তে পারে দেখে দ্রষ্টা অবাক হলো। মাছ - আত্মা তথা আত্মিক সত্তা। তাকে আঁকড়ে পাওয়া গেল না।জানা গেল তা সীমিত আত্মিক শক্তি নয় - তা অসীম। দেহী এই সত্তা লাভে অসীমে ব্যাপ্ত হয়ে জীবন মুক্তির স্বাদ অনুভবে সক্ষম হয়, জীবন সার্থক হয়।

*** শ্রীজীবনকৃষ্ণ স্বপ্নে দেখলেন, ওনার মা আর মাসী এসেছেন। মা ওনাকে প্রণাম করলেন, কিন্তু মাসীমা চিৎকার করে বললেন, আমি ওকে ছাড়ব না।**

কিছুদিন পর মাসীমাকে আবার দেখলেন। তিনি কেটের কাপড় পরে এসে জীবনকৃষ্ণকে প্রণাম করে চলে গেলেন।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, তিনি মাসীর দুধ খেয়ে বড় হয়েছেন কিনা, তাই মা ছেড়ে দিলেও মাসী সহজে ছাড়তে চাইলেন না। অনেক দেরীতে ছাড়লেন।

সুধীনবাবু বললেন, মা ছেলেকে প্রণাম করছে এটা কী রকম হল?

উনি বললেন, ভক্তি হয়েছে, তাই কৃতকৃতার্থ হয়েছে, মুক্ত হয়েছে! আসলে সুধীনবাবু ওনার বক্তব্য বুঝতে পারেন নি। তিনি ভক্তির সংস্কারে ডুবে আছেন তাই ঐরকম উত্তর দিলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। এই উত্তর শুনে সুধীনবাবু বললেন, ও আচ্ছা! (শ্রী ভগবানের পাদছায়ায়, ১৯৫৯ সাল)। একবারও মনে প্রশ্ন জাগল না, স্বপ্ন যখন দেখেছেন তখন মা বা মাসী কেউই দেহ নিয়ে বেঁচে নেই। তাহলে তাদের ভক্তি হয়েছে কথাটার কোন অর্থ দাঁড়ায় কি?

...পরবর্তীকালে ১৯৬২ তে এই অনুভূতি উল্লেখ করে স্পষ্ট ভাষায় তিনি বললেন, মা ও মাসী প্রণাম করে চলে গেল মানে মা ও মাসীর দেহ থেকে আগত আমার সংস্কার কেটে গেল। সর্বসংস্কারমুক্ত না হলে যে ব্রহ্মত্বের পূর্ণ

প্রকাশ হয় না (ঋতম্ বদিষ্যামি)।

* বৃহস্পতিবার, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৬০, - শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, আজ দুপুরে একটা স্বপ্ন দেখেছি - মুষ্ঠিবদ্ধ ডান হাতটা জোরে বার কয়েক ছুঁড়লাম। হাত থেকে এক ঝাঁক ফড়িং বেরিয়ে উড়ে গেল নীল আকাশে।

ব্যাখ্যায় বললেন, একেও একরকম আদেশ বলে। ঐ হাত ছুঁড়ে দেওয়া আর ফড়িং উড়ে যাওয়া - এতে হয়ত বা Pamphlet টা যা ছাপা হচ্ছে তা প্রকাশ হবে এবং যারা পড়বে তারা আমাকে দেখবে।

Pamphlet বলতে উনি Religion & Realization এর Fore-word টার কথা বলেছেন। এই লেখা ছাপা হয়ে বেরোনোর মাধ্যমে "লিখে খাওয়ানোর আদেশের" ফল ফলবে। এই আদেশ তিনি পেয়েছিলেন ১৯৪৯ সালে। লিখেওছিলেন 'ধর্ম ও অনুভূতি'র ১ম ও ২য় খণ্ড। কিন্তু ছাপা হয়নি তখন। এখন ছাপা হতে চলেছে। এর ফলে তার ব্রহ্মত্ব বা একত্ব ছড়িয়ে পড়বে। অসংখ্য মানুষ তাকে অন্তরে দেখবে। তারা তার ব্রহ্মত্বের আভাস (পাখীর আভাস যেমন ফড়িং) পাবে ও মুক্তির স্বাদ পাবে (আকাশে উড়বে)। লক্ষ্যণীয় এখন আর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে আদেশ করছেন না। শ্রীজীবনকৃষ্ণ তখন অদ্বৈতবোধে প্রতিষ্ঠিত। নিজেকেই নিজে আদেশ করছেন। হাত থেকে বেরোচ্ছে - কারন হাত দিয়ে লিখেছেন যে!

*** শ্রী জীবনকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন আচ্ছা খগেন, "ভগ, অর্যমা" - কথা দুটির মানে জানিস? উত্তরে খগেন বাবু বললেন, না। পরে আবার বললেন, "সামনে পদ পিছনে পদ" - এর অর্থ কী? খগেনবাবু বললেন, জানি না।**

ভগ মানে মধ্যাহ্ন সূর্যের তেজ আছে যার অর্থাৎ ভগবান। অর্যমা মানে দুর্গা - মহামায়া - পিতৃলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী-এই দেহ। ভগ ও অর্যমা বলতে দেহ ও আত্মার কথা বোঝাচ্ছে। সামনে পদ পিছনে পদ অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যৎ। যার দেহ আত্মা পৃথক হয়েছে তার কাছে মনুষ্যজাতির চৈতন্যের বিবর্তনের অতীত অধ্যায় ও ভবিষ্যৎ পরিষ্কার হয়ে যায়।

* নগেনবাবুর স্বপ্ন ঃ- বাজারে একটি দেওয়াল। তাতে একটি টিনের নল লাগানো। দুজন লোক বন থেকে মধু এনে দেওয়াল সংলগ্ন নলের মুখে ঢেলেছেন। নলের পুরো ফাঁক জুড়ে মধু এসে নীচে একটি চৌকো টিনের পাত্রে পড়ছে। সেখান থেকে বাজারে মধু বিতরিত হচ্ছে একটি রবারের নল দিয়ে।

বাজার - জগৎ। দেওয়াল-অবতার লীলার মূর্তরূপ। দুজন লোক- শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীজীবনকৃষ্ণ। বন - তাদের দেহারণ্য। মধু - দর্শন ও অনুভূতি। টিনের নল - দেহতত্ত্বের ব্যাখ্যার ব্যাকরণ। নল থেকে নির্গত মধু- অবতারের বানীর মর্মার্থ। নীচের চৌকো পাত্র - 'ধর্ম ও অনুভূতি' গ্রন্থ। রবারের নল - শ্রীজীবনকৃষ্ণের চিন্ময় রূপ যা অন্তরে দেখলে দেহ যোগযুক্ত হবে ও ধর্ম ও অনুভূতির ভিতরে রাখা চৈতন্য উপভোগে সক্ষম হবে মানুষ।

* শ্রী জীবনকৃষ্ণের এক অনুরাগী লিখেছেন, শ্রীজীবনকৃষ্ণ বেদান্তবিদ্ নন, তিনি বেদান্তবাহী। একথা ঠিক যে বেদান্ত তাঁকে পড়ে শিখতে হয়নি। তাঁর প্রাণের স্পন্দনে বেদান্ত সৃষ্টি হয়েছে, পুঁথির ভাষা থেকে বেদান্ত তার জীবনের ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু পুঁথির বেদান্ত তত্ত্বগতভাবে ছিল অসম্পূর্ণ। স্বামীজি বলেছেন, Vedanta is not yet complete. Vedanta searches for its final unity. বেদান্তের একত্বের তত্ত্ব সম্পূর্নতা পেল তার দেহে যখন তা অনুভূতি হয়ে ফুটে উঠল। স্বামীজি বেদান্তের One and oneness এর কথা বলেছেন। কিন্তু সেই One যে একজন জীবন্ত মানুষ আর oneness ঐ মানুষটির ব্রহ্মত্ব বা একত্ব যা তার চিন্ময় রূপ ধরে অসংখ্য মানুষের মধ্যে ফুটে ওঠে সে কথা কেউ ভাবতে পারে নি।

শ্রীজীবনকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে এই সত্য জগতে প্রকাশ পেল। তাই এক অর্থে তিনি হলেন বেদান্তকৃৎ– বেদান্তের স্রষ্টা। আবার জগতে তিনিই প্রথম এই বেদান্ত ঠিক ঠিক উপলব্ধি করেছেন, হয়েছেন বেদান্তবিদ। অবশেষে সেই বেদান্তকে বহন করার দায়িত্বও নিজে নিয়েছেন - হয়েছেন বেদান্তবাহী। এক কথায় বেদান্তকে সম্পূর্ণতা দান করে তিনি হলেন প্রকৃত বেদান্তের স্রষ্টা - বেদান্তকৃৎ - পরে বেদান্তবিদ্ ও শেষে বেদান্তবাহী।

স্মৃতিকথা

শ্রীজীবনকৃষ্ণের পূতসঙ্গধন্য কিছু মানুষের টুকরো কিছু স্মৃতিকথা এখানে উল্লেখ করা হল।

অসীম বিশ্বাস ঃ ১) একদিন তিনি মহাপুরুষ মহারাজের জীবনের একটি ঘটনা বললেন - স্বামীজী, রাজা রাজড়ার বাড়ি অতিথি হয়ে ঘুরছেন। অনেক রাজা স্বামীজীর শিষ্য হয়েছিলেন। কিন্তু বাকি যাঁরা আছেন, তাঁরা তো স্বামীজীর মতন অতিথি হয়ে থাকেননি। আর স্বামীজীর মতন রাজশিষ্যও তাঁদের ছিল না। পথে পথে ঘুরতেন। কোনদিন খাওয়া জুটতো কোনদিন জুটতো না। একবার মহাপুরুষ মহারাজের দুদিন কোথাও খাওয়া জোটেনি। এক গাছের নীচে বসে আছেন। এমন সময় একটু তফাতে ধুপ করে একটা শব্দ হল। অণ্বেষণ করে দেখেন, একটা খুব বড় সাইজের বেল। সেই বেলটি ভক্ষণ করে তিনি উপবাসের ক্লান্তি দূর করলেন।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলে চললেন, আর একটা শোন - শশী মহারাজের কথা। শশী মহারাজ ও আরও দুজন আছেন। ওঁরা করতেন কি সকালে স্নানটা সেরে রাখতেন। তারপর যেখানে খাওয়া জুটতো সেখানে খেতেন। একদিন ওই রকম স্নান করে নিচ্ছেন, বাগানের ভিতরে পুকুর। একজন করে যাচ্ছেন, স্নান করে ফিরে আসছেন। শশী মহারাজ গেছেন। আসতে তাঁর দেরী হচ্ছে দেখে, একজন তাঁর কাছে গেলেন। তিনি দেখেন যে, শশী মহারাজ সবুজ ঘাসের উপর উবু হয়ে বসে যেন কী করছেন। তিনি যেতেই শশী মহারাজ বললেন - দেখ কী রকম কচি কচি ঘাস। স্নান করে তাই দুটি খেয়ে নিচ্ছি। জান তো স্নান করে আমার কিছু খাওয়ার অভ্যাস। এই গল্প শুনে আমরা হেসে উঠলাম। কিন্তু শ্রীজীবনকৃষ্ণের মুখে হাসি দেখলুম বেদনা-মধুর। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর সন্তানদের কথা এমন দরদ-ভরা কণ্ঠে বলতে আমি কাউকে শুনিনি।

২) একবার আল পুকুরের শ্মশানে একটা গাছের ছায়ায় বসে শ্রীজীবনকৃষ্ণ গায়ের জামা খুলে ফেললেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, কালকে দুপুরে ধ্যানে এইরকম আকাশ দেখলুম। ঠিক আকাশের রং এইরকম।

একজন লোককে আসতে দেখে, শ্রীজীবনকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন - আপনি কোথায় যাবেন? লোকটি বললেন - আমি ডাক্তার, রোগী দেখতে গিয়েছিলাম। আপনারা কোথায় এসেছেন? শ্রী জীবনকৃষ্ণ বললেন - আমরা এখানে থাকি না, হাওড়া কদমতলায় থাকি। এখানে একজনের বাড়িতে আমরা কয়েকজন এসেছি।

ডাক্তারবাবু - ধর্ম চর্চা করতে বুঝি?

শ্রীজীবনকৃষ্ণ - ধর্ম করতে কোথাও যেতে হয় না। ভগবান এই দেহের ভিতরে। নিজ দেহ দেখিয়ে শ্রীজীবনকৃষ্ণ ভাবস্থ হলেন।

ডাক্তারবাবু চলে গেলেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণ আমায় বললেন - জামা খোল। একটু ধ্যান কর - শরীর জুড়িয়ে যাবে। ওঁর কথামতো জামা খুলে পাশাপাশি বসে, ধ্যান করতে লাগলুম।

দিলীপ ঘোষ ঃ তাঁর ঘরে শচীন এল। কোন দিকে দৃক্‌পাত নাই। শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন - যেন মিলিটারী ঢুকল (সকলের হাস্য)। (তমলুকের ভক্তটির প্রতি দরদভরা কণ্ঠে) কী বলব এদের কথা। এরা যে কী ধ্যানী! (আনন্দের প্রতি) তুই এখন আর ধ্যান করিস নি। (সৌরেনের প্রতি) তুইও না। (বিমলের প্রতি) তুই ইচ্ছা হয় কর, না হয় শোন - যা ইচ্ছা।

বিমল (করজোড়ে) - আপনাকে দেখাই আমার ধ্যান। আবার ধ্যান কিসের ?

শ্রীজীবনকৃষ্ণ (ভাবস্থ হইয়া) - আহারে! তোকে প্রণাম হই রে!

আনন্দমোহন ঘোষ ঃ শ্রীজীবনকৃষ্ণ এক সন্ধ্যাবেলায় (১৫/০৬/৬৬) বলছিলেন, দেখ্ না কী রকম অবস্থায় কাটালাম। একটু কিছু কি অনুকূল অবস্থা পেয়েছি জীবনে? (হাসতে হাসতে বললেন) থাকি পরের বাড়িতে, সারা জীবন পরের ঘরের ভাত খেয়ে কাটালাম। (একটু হেসে) আজ বেড়াতে গিয়েছিলাম - প্রথমে কলেজ স্কোয়ার, তারপর হেদো। ঠাকুরের কথা মনে পড়ল - 'হাতির বাইরের দাঁত আর ভিতরের দাঁত।' বাইরের দাঁতে শোভা আর ভিতরের দাঁতে খায়। এত লোক আমায় ভিতরে দেখছে। আর তাও যদি পৃথিবী সুদ্ধ লোক দেখতো, তবু

যা হয় কিছু একটা বোঝা যেত, তাও নয়। আর এখন বুঝছি এরকম করে হয় না। এত লোক আমায় দেখছে - এ হল আমার শোভা আর আমার যা ব্যষ্টি তা হল ভিতরের দাঁত। সে আমার নিজস্ব। তার সঙ্গে কি তুলনা চলে! হাতি হল মন। ভিতরের দাঁত বাইরের দাঁত - মানুষের মনের দুটি অবস্থা আছে - একটা তার অন্তর্মুখীন মন, আর একটা বাইরের। কী হবে আমার শোভা দিয়ে - দূর ছাই! তার চেয়ে পুরীতে বেশ ছিলাম। ভাবছিলাম কি হবে এখানে থেকে, পুরী চলে যাই। দুর্ দুর্ এসব কী হবে! ব্যষ্টির চেয়ে মধুর আর কিছু নেই।

অনাথনাথ মণ্ডল ঃ পুরীতে থাকার সময় একদিন উনি বেরিয়ে ফিরলেন। রান্নার যোগাড় শেষ হতে উনি তৈরী হয়ে রান্না ঘরে এসে ছোট টুলের ওপর বসলেন রান্না করার জন্য। গোপালদা কে বললেন গোপাল, আমার যন্ত্রপাতি নিয়ে আয় তো বাবা। গোপালদা দৌড়ে গিয়ে ওঁর নস্যির কৌটো আর রুমাল নিয়ে এল। উনি প্রথমে বাঁধাকপি-সীম-বেগুন-ন্যাপ্সি তরকারীটা নামিয়ে বললেন কী রকম হয়েছে দ্যাখ্! এক্ষুনি খেতে ইচ্ছে করছে। তারপর রাঁধলেন আলুপোস্ত। নামানোর পর দেখলুম তার ওপর প্রায় আধ ইঞ্চি পুরু তেল দাঁড়িয়ে। কড়াই থেকে অন্য পাত্রে ঢালতে ঢালতে বললেন, ওঃ যা হয়েছে, এক্ষুনি খেতে ইচ্ছে করছে। এরপর কৈ মাছের ঝাল রান্না করে নামিয়ে ফের বললেন, আহা এক্ষুনি খেতে ইচ্ছে করছে রে! রান্না সেরে স্নান করে কাপড় পরে রান্না ঘরে এসে গোপালদা-কে বললেন, দাদা (দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়) তরকারী পাঠাবার আগে তুই দাদাদের তরকারী দিয়ে আয়। বাটিতে গোপালদার তরকারী সাজানো দেখে বললেন, ও কি করছিস? বাটিতে করে তরকারী দিলে কম কম দেখাবে। তার চেয়ে সব তরকারীই প্লেটে করে সাজা। দেখবি কেমন বেশী বেশী দেখাবে। আমি ঐ কথা শুনে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি দেখে উনি আমাকে বললেন, কী দেখছিস বাবা! আমার এখন ত্যাজ্য-গ্রাহ্য নেই রে! আমি ওঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি ভাল রান্না কী করে জানলেন? উনি হাসতে হাসতে বললেন, শ্বশুর-বাড়িতে অনেকদিন রাঁধতে হয়েছিল তো, সেইখানেই এইরকম রান্না শিখেছি।

মানিক ৫৮ সংখ্যা

ভূমিকা

শ্রীরামকৃষ্ণের আগে কারও ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে থাকলেও তিনি আর ফিরে এসে খবর দিতে পারেননি - তার দেহ চলে গেছে। একথাটি তিনি গল্পচ্ছলে বলেছেন যে চার বন্ধু আলোচনা করল পাঁচিলের ওপারে কী আছে দেখতে হবে। একজন পাঁচিল বেয়ে উপরে উঠে ওপারে তাকিয়ে হা-হা-হা-হা করে ওপারে পড়ে গেল। ফিরে এল না। তখন আর এক বন্ধু পাঁচিলে উঠল। তারও সেই অবস্থা হল। হা-হা-হা-হা করে ওপারে পড়ে গেল। একে একে চারজনেরই ঐ অবস্থা হল। কী দেখল তা বলতে পারল না (কথামৃত ১/৬/২)।

পাঁচিল বেয়ে উপরে উঠে অর্থাৎ দেহজ্ঞান শূন্য হয়ে জড় সমাধি লাভ হল কিন্তু নাদভেদ হয়ে (হা-হা-হা-হা করে) দেহ টুটে গেল। দেহাতীত অখণ্ড চৈতন্যের পরিচয় জগৎকে জানাতে পারল না। চারজন বন্ধু ব্যর্থ হল - অর্থাৎ চার যুগে কেউ পারে নি। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই অসাধ্য সাধনে ব্রতী হলেন।

জগতে তিনিই প্রথম মানুষ যিনি জড় সমাধির পর, তত্ত্বজ্ঞানে নেমে এলেন। পরে অবতারতত্ত্বের সাধনে অনন্তের পরিচয় পেলেন ও দেহ নিয়ে বেঁচে থাকলেন । এবার চেষ্টা চলল জগৎকে তা বোঝানোর।

একদিন বাহ্যে করতে গিয়ে দেখলেন, নরুণ দিয়ে একটা দেওয়াল ছেঁদা করছেন। ছেঁদা একটু হয় হয় আবার আপনা থেকে তা পুরে আসে। শেষে আপনা হতে অনেকটা ছেঁদা হল।

তিনি শ্রীমকে বললেন, দেওয়ালের মাঝে একটু গোল ফোঁকর থাকলে দেওয়ালের ওপারে দিক্‌দিগন্ত ব্যাপী ফাঁকা মাঠ অনেকটা দেখা যায়। অবতার হলেন সেই গোল ফোঁকর, এটা তুমি বুঝেছ? মাষ্টারমশাই বললেন, হ্যাঁ, আপনিই সেই গোল ফোঁকর যার মধ্যে দিয়ে অনন্ত ঈশ্বরের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ শ্রীরামকৃষ্ণময় হয়ে অবতারত্ব পর্যন্ত সাধনে ঈশ্বরকে নানাভাবে দেখলেন, জানলেন। পরে তার চাহিদা আরও বাড়ায় তাঁর মনে হল

শ্রীরামকৃষ্ণ যেন অসীমের মাঝে একটা সীমা টেনে সেখানে অফুরন্ত লীলাখেলা দেখাচ্ছেন। গোল ফোঁকরের মধ্যে দিয়ে যা দেখা যায় তা-ও বৃহত্তর এক গোলাকার অংশে দৃশ্যমান খোলা মাঠ। কোথায় যেন একটা সীমাবদ্ধতা থেকেই যাচ্ছে!

শ্রীজীবনকৃষ্ণ অবতারত্ব অতিক্রম করে হলেন জগদ্‌ব্যাপী। অসীম হয়ে অসীমকে দেখলেন, অর্থাৎ পাঁচিলের ওপারে গিয়ে অনন্ত বিস্তারী মাঠকে দেখলেন প্রাণভরে। স্থায়ীভাবে ঈশ্বরত্ব লাভ করে ওপারেই থাকলেন। কিন্তু মানুষের প্রতি তাঁর প্রেম তাঁকে সাধারণ মানুষের জন্য উতলা করল। ঘটল অঘটন। তার চিন্ময় রূপ অন্তরে দর্শনে ও তাঁর সত্তা লাভে এবার সাধারণ মানুষও পাঁচিলের ওপারে ক্ষণিকের জন্য গিয়ে, অনন্তের আস্বাদন পেয়ে আবার এপারে ফিরে আসতে লাগল। মানুষের ধর্মজীবনের কৌতূহল - ''কী আছে শেষে'' তা জানার পথ খুলে গেল॥ মানুষ জীবনের পরম সার্থকতা খুঁজে পেল।

– ২৬শে কার্তিক, ১৪১৯

প্রথম আলো

মিটেছে তৃষ্ণা

আমি শ্রীজীবনকৃষ্ণের কথা শুনলেও স্বপ্নে কখনও দেখিনি। হঠাৎ গত ০৮/০৬/২০১২ তারিখে অদ্ভুত এক স্বপ্ন হল। দেখছি - আমি যেন খুব কম জল খাই। আমি খুব করে জল খাচ্ছি। বাড়ির বাইরে যেখানেই যাচ্ছি সঙ্গে থাকছে একটা গ্লাস, জল খাবার জন্য। একদিন সকালে তরুন কাকুর কাছে পড়তে গিয়ে ধ্যানে বসেছি তখনও খুব জলতেষ্টা পাচ্ছে। হঠাৎ আমার সামনে শ্রীজীবনকৃষ্ণ এসে বললেন, ''তুই শান্তভাবে ধ্যান কর, তোর জলতেষ্টা মিটে যাবে।'' তাঁকে দেখেই যেন আমার তৃষ্ণা মিটল। ... স্বপ্ন ভাঙল। এই প্রথম শ্রীজীবনকৃষ্ণ কৃপা করে আমায় দর্শন দিলেন।

- অর্ণব চ্যাটার্জী (গড়গড়িয়া, বীরভূম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই তৃষ্ণা ভগবৎ প্রেমতৃষ্ণা। ভগবৎ লীলা দর্শনেই এই তৃষ্ণা মেটে॥

* গত ১১।০৬/২০১২ তারিখে আমাদের বাড়িতে স্নেহময় কথামৃত পাঠ করতে আসবে বলে জানিয়েছে। তার আগের রাত্রে স্বপ্নে দেখছি - স্নেহময়, 'ঐ দেখুন' বলে হাত ঈশারা করে দেখিয়ে দিল একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ধ্যানমগ্ন শ্রীজীবনকৃষ্ণকে। খালি গায়ে ধুতি পরে আছেন। ঐ মহাযোগীকে দেখে ভিতর আলোড়িত হল। ঘুম ভেঙে গেল। পরদিন শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের সব কথার জীবনকৃষ্ণের দেওয়া ব্যাখ্যা যত শুনছি ততই দেহে সাড়া জাগছিল। অদ্ভুত এক তৃপ্তি অনুভব করেছিলাম।

- মন্দিরা মুখার্জী (আমোদপুর, বীরভূম)।

এত দিন যে বসেছিলেম

* আমি দীর্ঘদিন ধরে পাঠচক্রে আসি। বিচিত্র সব স্বপ্নও দেখি। কিন্তু কখনও স্পষ্টভাবে শ্রীজীবনকৃষ্ণকে দেখিনি। গত ০৫/০৭/১২ তারিখ রাত্রে প্রথম শ্রীজীবনকৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখলাম। দেখছি - আমাদের বাড়িতে শ্রীজীবনকৃষ্ণ এসেছেন। তক্তার উপর বসে আছেন। ক্যামেরাটা দেখে বললেন, এতে একটু ত্রুটি আছে। বললাম, আপনাকে দিয়েই কেনাবো ভেবেছিলাম। কোথায় ঠিক করা যায় বলুন তো! উনি বললেন, কলকাতায়। আমি ভাবলাম তাহলে একটু খোঁজ নিয়ে আসি। মনে হচ্ছে কলকাতা খুব কাছেই আর দাদার গাড়ীটা নিয়ে ঘুরে আসব। ঘর থেকে বেরোলাম। ভাবছি জীবনকৃষ্ণ এসেছেন অথচ স্নেহময়দা এখনও কেন এল না? স্নেহময়দার তো আসা উচিত। অমনি দেখি স্নেহময়দা আসছে সাইকেল চড়ে। বললাম, জীবনকৃষ্ণ আছেন বাড়িতে। তুমি চল। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছি। গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। একটা টালির দোকানের কাছে গাড়ীটা ঘোরাতে গিয়ে একটা টালির কোন্ একটু ভেঙে গেল। দোকানী বলল, হয় পয়সা দাও না হয় পুরো সেটটা কিনে নিয়ে যাও। পকেটে হাত দিয়ে দেখি একটাও পয়সা নেই। চিন্তায় পড়লাম। তখন এক বন্ধু এসে বলল, আমি দেখছি, তুই যা!... ঘুম ভাঙল। দেরিতে হলেও শ্রীজীবনকৃষ্ণ স্বপ্নে দেখা দিলেন ভেবে খুব আনন্দ হল। মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের একটি গান "এতদিন যে

বসেছিলেম পথ চেয়ে আর কাল গুনে, দেখা পেলেম ফাল্গুনে।"

- জয়দেব দাস (সুরুল, বীরভূম)।

ব্যাখ্যা ঃ বাড়িতে জীবনকৃষ্ণ - দেহেতে শ্রীভগবান। স্নেহময়দা এল - অনুশীলন শুরু হল। বন্ধু চিন্তামুক্ত করল - ভগবৎচর্চার পরিবেশ অনুকূল হল।

জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে

* স্বপ্নে দেখছি (২৫.০৬.১২) - আমাদের বাড়িতে পাঠচক্রের শ্রীমতী কেয়া পাঠক এসেছে। তাকে বলছি - আমার ছেলে (অর্ণব) একটা টি.ভি. কিনেছে। তাই পুরানো টি.ভি. টা একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রী-কে দিয়ে উপরের ঘর থেকে নীচে এনেছি। তারপর বলছি - যে ঘরে আমি শুই সেই ঘরে আমার পাশে শ্রীজীবনকৃষ্ণ শোন। তখন আমি শ্রীজীবনকৃষ্ণকে বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে থাকতে দেখছি, যেন তিনিই আমার স্বামী। তারপর আবার আমি ও শ্রীমতী পাঠক পাশের ঘরে এসে দেখলাম যে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বিছানায় শুয়ে আছেন। ওনার শরীর ভাল নয়। আমি বললাম, উনি তো মারা গেছেন! ... আমার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙার পর দেখছি আমি মুখে জীবনকৃষ্ণ, জীবনকৃষ্ণ - নাম করছি। এই প্রথম শ্রীজীবনকৃষ্ণ আমায় দেখা দিলেন তাও আবার এমন অদ্ভুত স্বপ্নে!

– প্রণতি চক্রবর্তী (সখেরবাজার, কলকাতা)।

ব্যাখ্যা ঃ শ্রীজীবনকৃষ্ণ জীবিত আবার মৃত। স্থূল জগতে তাঁর দেহাবসান হলেও, অন্তর্জগতে তিনি জীবিত শুধু নন, তিনিই স্বামী - অবলম্বন।

* গত লক্ষ্মীপুজোর দিন (২৯.১০.১২) - স্বপ্নে দেখছি - অনেকগুলো প্যাণ্ডেল দেখে বাড়ি ফিরে এলাম। এবার পাঠ হবে। জেঠু (স্নেহময়) বললেন, তুই তো এখনও জীবনকৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখিসনি না? আমি বললাম, না। অমনি মনে পড়ল, না তো দেখেছি! একটা প্যাণ্ডেলে লক্ষ্মীঠাকুর জীবনকৃষ্ণ হয়ে বসে সমাধিমগ্ন হয়ে গেলেন যেমন ফটোতে দেখা যায়। ... স্পষ্ট দেখলামও।

- সৌরভ দত্ত (গড়গড়িয়া)।

ব্যাখ্যা ঃ অনার্য কৃষ্টিতে যাকে লক্ষ্মী বলা হয়, বেদে তাকেই ব্রহ্ম বলেছে - বলেছে

অন্নং ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মের প্রকৃত রূপ হল একজন সর্বজনীন মানুষের রূপ - শ্রীজীবনকৃষ্ণের রূপ।

স্বর্ণ মস্তিষ্ক

* স্বপ্নে দেখছি - জীবনকৃষ্ণ ওনার খাটে বসে আছেন। পাশে আমিও আছি। ওনার সাথে কথা হচ্ছে। আমি বলছি - জীবনকৃষ্ণ, তোমার মত যেন আমার গোল্ডেন ব্রেন (golden brain) হয়। উনি শুনে হাসলেন। ... স্বপ্ন ভাঙল। ঘুম ভাঙতেই মা কে বললাম, তুমি যে বললে জীবনকৃষ্ণের খাট বোলপুরে চলে গেছে। জীবনকৃষ্ণের খাট কোথাও যায় নি। এখানেই আছে - আমি যে স্বপ্নে দেখলাম! স্বপ্নে জীবনকৃষ্ণকে দেখতে পেয়ে কী ভাল যে লাগছে! খুব আনন্দ হচ্ছে।

-তানিশা কয়াল (বয়স ৩.৫ বছর/ সখেরবাজার, কলকাতা)।

ব্যাখ্যা ঃ Golden brain - দর্শন ও অনুভূতির বিশ্লেষণ করে নিজের আত্মিক পরিচয় লাভ ও জগতের মানুষের সাথে সত্য সম্পর্ক উপলব্ধির ক্ষমতা লাভ।

স্বপ্ন সুধা

নতুন কলেজ

* আমি দেখছি - আমাদের স্কুল বোলপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় আর বোলপুর বয়েজ হাইস্কুল একসাথে একটা কলেজে পরিণত হয়েছে। মনে হচ্ছে যেন ওখানে যতদূর পড়তে চাইব ততদূর পড়া হবে। কলেজটির নাম ''বহু মানুষের মধ্যে একত্ব দর্শন''। আমি কলেজে গিয়ে দেখছি বিয়ে হচ্ছে। একটা মানুষই সবাইকে বিয়ে করছে। আমি গোটা কলেজ নেচে বেড়াচ্ছি এই বলে যে আমার বিয়ে হবে। কিন্তু সবারই মন খারাপ একটা বয়স্ক মানুষকে বিয়ে করতে হবে বলে। ঐ বয়স্ক মানুষটি সবাইকে বিয়ে করতে করতে এবার আমার কাছে এল, আমাকে বিয়ে করতে। আমি আর আনন্দে থাকতে পারছি না। ভাবছি কতক্ষণে আমার বিয়ে হবে। ঘুম ভাঙল। খুব আনন্দ পেলাম। অবাকও হলাম।

- শালিনী রুজ (৭ম শ্রেণী/ বোলপুর)।

ব্যাখ্যা ঃ পরম একের (Absulute One) একত্ব বা ব্রহ্মত্ব সকলের অবলম্বন হয়ে উঠছে। দ্রষ্টারও। তাই এত আনন্দ। নতুন কলেজটি হল জীবনকৃষ্ণ প্রদত্ত ''বহুত্বে একত্ব'' বিষয়ক বাণী চর্চার কেন্দ্র - অর্থাৎ পাঠচক্র॥

* স্বপ্নে দেখছি (০৬.০৯.১২) - বিছানায় শুয়ে আছি। আমার পাশে আমারই মতো দেখতে আরও ৭/ ৮ জন ছেলে শুয়ে আছে। মনে হচ্ছে ওরা আমিই। আমি শুয়ে শুয়ে যা করছি ওরা তাই-ই করছে। খুব আশ্চর্য লাগল। ঘুম ভাঙল। -সাগর ব্যানার্জী (৯-ম শ্রেণী/ বোলপুর)।

ব্যাখ্যা ঃ ''একা আমি হই বহু হেরিতে আপন রূপ'' - এর সামান্য আস্বাদন পেলেন দ্রষ্টা।

অমৃতলোক পথযাত্রী

* স্বপ্ন দেখছি (০৭.১০.১২) - তবলা বাজাচ্ছি। হঠাৎ আমি তবলার তাল বাজাতে বাজাতে বাঁয়া তবলায় স্পষ্ট শ্রীজীবনকৃষ্ণকে দেখলাম। আমি এটা সবাইকে বললাম ও দেখালাম। কিন্তু কেউ দেখতে পেল না। আমার কথা কেউ বিশ্বাস করল না। হঠাৎ একটা বৃদ্ধ এল। সে ঠিক মহাত্মা গান্ধীর মত দেখতে। সে আমাকে বলল, তুমি জীবনকৃষ্ণের দেখা পেয়েছ। আমি বললাম, আপনি জীবনকৃষ্ণকে চিনলেন কী করে? উনি বললেন, জানবো না? আমি দীর্ঘকাল তাঁকে নিয়ে চর্চা করেছি। এই বলে তিনি পিছন ফিরে যেতে শুরু করলেন। অমনি আমি চিনতে পারলাম উনিই জীবনকৃষ্ণ। ... স্বপ্ন ভাঙল।

- আবীর ব্যানার্জী (কান্দি, মুর্শিদাবাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ তবলায় শ্রীজীবনকৃষ্ণ - দেহমধ্যে আত্মিক স্ফুরণের বিভিন্ন রাগরাগিনীর উৎস তিনি। মহাত্মা গান্ধী - তিনি মহাত্মা - তিনি নিজেই নিজের পরিচয় দান করেন।

* গত ১৮ আগষ্ট শনিবার (২০১২) পাঠ শুনতে শুনতে দর্শন হল - আমি যেন মারা গেছি। জয় এসেছে বাড়িতে। বাড়ির সকলে বলছে, আগে ডাক্তার আনা হোক তবে বুঝব সত্যিই মারা গেছে কিনা। জয় বলছে, সে

তোমার যা হয় করবে, আমি এখন ওকে অমৃতলোকে নিয়ে যাচ্ছি। এই বলে সে আমার দেহের জামা খুলে দিল। তারপর নাভিতে হাত দিয়ে কী যেন উপর দিকে টেনে তুলতে লাগল। মনে হচ্ছে আমিই উপরে উঠছি। কাছে রয়েছে ভাইপো অমৃত। পাঠে তখন 'মৃত্যোর্মা অমৃতংগময়' ... কথাটার ব্যাখ্যা হচ্ছিল।

- সমরেশ চ্যাটার্জী (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যা ঃ ধরার ধূলিতে অমৃতপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে। অমৃতলোকে যাত্রা আজ আর কল্পনা নয়।

ডাক দিয়েছ কোন সকালে

* একদিন রাত্রে (ডিসেম্বর, ২০১১) - আমি স্বপ্নে দেখছি - ভোর হয়ে গেছে। দরজায় ঠক্‌ঠক্ আওয়াজ হচ্ছে। ভাবলাম আমাদের কাজের মেয়ে বুড়ি এসে গেছে। সেই সময় আমি খুব বিরক্ত মুডে বললাম, আর বাবা একটু শোবার যো নেই। প্রত্যেক দিন হয়েছে ভোর বেলায় কাজ করতে আসা। এই বলে দরজা খুলে দিয়ে বললাম, এসো। কিন্তু মুখের দিকে তাকালাম না। ঘরে ঢুকছে না দেখে মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন পরিচিত সমাধি অবস্থার ছবিটির ভঙ্গীতে। আমি অবাক হয়ে তাকালাম কিছুক্ষণ। দৃশ্য মিলিয়ে গেল। ঘুম ভাঙল।

- পিউ মুখার্জী (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যা ঃ শ্রীভগবানই আমাদের সেবা করেন।

* স্বপ্নে মনে হচ্ছে আজ ১৫ই আগষ্ট, স্বাধীনতা দিবস। কিন্তু আশ্চর্য, কোথাও দিনটি পালিত হচ্ছে না। কোন অনুষ্ঠান নেই। তখন ভাল করে ক্যালেণ্ডার দেখতে লাগলাম সন্দেহ মেটাবার জন্য। দেখছি আজ ১৫ই আগষ্ট ঠিকই কিন্তু নীচে বাংলায় লেখা রয়েছে ৭ই জ্যৈষ্ঠ। ...

- অমৃত চ্যাটার্জী (নবম শ্রেণী/ ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যা ঃ ৭ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীজীবনকৃষ্ণের জন্মদিন। ধর্মজগতে তিনিই প্রথম স্বাধীন মানুষ - সর্ব-সংস্কারমুক্ত মানুষ। তাই তাঁর জন্মদিনটি আমাদের আত্মিক মুক্তির কথা স্মরণ করায়।

যোগে-ভোগে

* স্বপ্নে দেখছি (১৯.০৭.১২) - টিভি.তে ভাল ছবি হচ্ছে না। তাই রেগে ওটাকে ভেঙে দিলাম। পরে ঘর ছেড়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। সঙ্গে একজন বৃদ্ধ। মনে হচ্ছে উনি জীবনকৃষ্ণ। কিছুদূর যাবার পর কথায় কথায় উনি বললেন, তুই কি চাস? বললাম সংসারেও থাকব আবার তোমাকেও চাই। উনি চুপ করে রইলেন। হঠাৎ দেখি - সামনে একজন নির্দোষ লোককে দুজন দুষ্ট লোক মারছে। আমি জীবনকৃষ্ণকে বললাম, ওকে বাঁচান। উনি গিয়ে লোকটিকে বাঁচালেন। ... ঘুম ভাঙল।

- করবী রুজ (বোলপুর)।

ব্যাখ্যা ঃ টিভি - মনকে বহির্মুখী করার যন্ত্র। তাই তা ভেঙে ফেললেন। নির্দোষ লোকটিকে বাঁচালেন - বিরুদ্ধ পরিবেশ অনুকূল করে দিলেন যাতে করে সংসারে থেকেও দ্রষ্টার ধর্ম হয়, ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে যুক্ত থাকা সম্ভব হয়॥

* গত ০৫/০৮/১২ তারিখে একরাশ দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও দুপুরে ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখলাম - আমার গায়ে যেন বাজ পড়ল। বিদ্যুতের আলো আমার গা থেকে ঠিকরে পড়ল ঘরের এক প্রান্তে। সেখানে ঐ উজ্জ্বল আলো চক্র হয়ে ঘুরতে লাগল। তার মধ্যে স্পষ্ট দেখা গেল ছোট্ট শ্রীজীবনকৃষ্ণ বসে রয়েছেন। ... ঘুম ভাঙল। কিন্তু দেহ যেন অসাড় হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ এর রেশ ছিল। বিকেলে হাঁটতে বেরোই। তাও পারলাম না। আর চোখের সামনে ভাসছে ঐ অপূর্ব দৃশ্য - আলোর চক্রের উপর ছোট্ট ধ্যানমগ্ন জীবনকৃষ্ণ।

- পলি ব্যানার্জী (গড়গড়িয়া)।

ব্যাখ্যা ঃ উপনিষদ কথিত বিদ্যুৎ পুরুষ দর্শনে দ্রষ্টা ধীর হলেন, শান্ত হলেন।

বীজবৎ বিশ্বপ্রাণ

* স্বপ্ন দেখছি - আমাদের বাড়িতে কারও বিয়ে উপলক্ষ্যে অনেক মানুষের জমায়েত হয়েছে। অতিথি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এসেছেন। আমার বাবাও আছেন - তবে তিনি একটা আলাদা ঘরে থাকেন - কারোর সাথে কথা বলেন না। হঠাৎ দেখছি রবীন্দ্রনাথ আমাকে বলছেন, তুমি Singularity

বলতে কী বোঝ? আমি বললাম, যখন বিগ্‌ব্যাঙ্গ (Big bang) হয়েছিল তখন এই সিঙ্গুল্যারিটি পয়েন্টের বিস্তার (Expansion) হয়ে এই বিশ্ব (Universe) তৈরী হয়েছিল।

তিনি বললেন, এটা জানবে, মানুষের দুটি জীবন আছে - ব্যবহারিক ও আত্মিক - এই দুটি জগতের মধ্যে Singularity-র মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করা যায় এবং একটা মানুষ এইভাবে তার ব্যবহারিক ও আত্মিক জগতে Switch over করে। পিছনে দেখি বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। বললেন, হ্যাঁ, উনি যা বলছেন একদম ঠিক। আমি যে রকম সম্পূর্ণ আত্মিক জগতে চলে গেছি। ইচ্ছে থাকলেও Switch over করতে পারি না।

দৃশ্য পালটে গেল। আমি যেন হাজার হাজার বছর পেরিয়ে চলে গেছি। আমিও একজন বিজ্ঞানী, Singularity প্রমাণ করতে মরুভূমিতে এসেছি। মরুঝড় উঠল। সূর্যটা বাদে সারা আকাশ কালো হয়ে গেল। সূর্যটা যেন একটা আলো বিচ্ছুরিত ব্ল্যাকহোল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সূর্যটা ঢেকে গিয়ে সেই সিঙ্গুল্যারিটি পয়েণ্ট সৃষ্টি হল - যেখান থেকে একদা এই বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিল। আমি সহকর্মী বিজ্ঞানীকে বলছি - দেখলেন, এই হল সেই বিগব্যাঙ্গ (Big Bang)-এর মুহূর্ত।

তারপর দেখি বিয়ে বাড়িতে ফিরে এসেছি। দাদাকে বলছি এই দৃশ্যের কথা॥

- সোহিত্রী সেন (নিউ আলিপুর, কলকাতা)।

ব্যাখ্যা ঃ শ্রীজীবনকৃষ্ণ বীজবৎ ঘনীভূত বিশ্বপ্রাণ - Singularity Point, আবার তিনিই সদা বিস্তৃত বিরাট আত্মিক জগৎ। তাঁর সত্তা লাভে মানুষ স্থূলজগত থেকে প্রথমে Singularity Point এ পৌঁছায় তারপর অনন্ত আত্মিক জগতে বিহারে সক্ষম হয়।

এষ ব্রহ্মেতি

* দেখছি (১১.০৬.১২) - আমাকে বাসুদেবদা একটি নৌকা করে নিয়ে চলেছে। সমুদ্রে ভেসে চলেছি। একটা দ্বীপে পৌঁছে গেলাম। সেখানে একটা আম গাছের তলায় জীবনকৃষ্ণ বসে রয়েছেন। ওনার কাছে যেতেই উনি

আমাকে চারটি পাকা আম দিলেন। বললেন, একটা খা আর বাকী তিনটে আম বাড়ি গিয়ে পাঠের লোকদের খাওয়াবি। হঠাৎ ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়ায় বাড়ি ফেরার জন্য ব্যাকুল হলাম। তখন শংকরদাকে দেখতে পেলাম। শংকরদাকে বলায় ও আমাকে নৌকা করে পৌঁছে দিল। ... স্বপ্ন ভাঙল। ভীষন আনন্দ হল।

- মানসী মুখার্জী (কাগাস, বীরভূম)।

ব্যাখ্যা ঃ দ্বীপ—সহস্রার। আম - অমৃতফল, ব্রহ্মত্ব। বাসুদেব - কৃষ্ণ - ভক্তিরসের গুরু। শ্রীজীবনকৃষ্ণ - ব্রহ্ম, ব্রহ্ম বিদ্যা করায়ত্ত যার। দ্রষ্টা তত্ত্বজ্ঞান নিয়ে সংসারে থাকবেন আর পাঁচজনকে এই ব্রহ্মত্ব বিলোবার জন্য।

* অনেকদিন আগে একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখেছিলাম। দেখছি - ঘন কুয়াশা থেকে বেরিয়ে এলেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। দেখি উনি স্বয়ং জীবনকৃষ্ণ। উনি নিজের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বললেন, 'এষ আত্মেতি, এষ ব্রহ্মেতি ...'।

- রামরঞ্জন চ্যাটার্জী (চারুপল্লী)।

* দেখছি - দিদির সাথে মেলা গেছি। অনেক সুন্দর সুন্দর পুতুল দেখে কিনতে ইচ্ছে করছে। যেটা কিনব ভাবছি সেটাই হঠাৎ পেট মোটা হয়ে বিসদৃশ হয়ে যাচ্ছে - তাই কেনা যাচ্ছে না। ...

- সাগর ব্যানার্জী (বোলপুর)।

ব্যাখ্যা ঃ দ্রষ্টার যোগদৃষ্টি লাভ হয়েছে। তাই মায়ার আবরণ সরে গিয়ে পার্থিব মনোরঞ্জনকারী বস্তুর তুচ্ছতা ধরা পড়ে যাচ্ছে।

নবীনা

পাঠে দেখা

* দেখছি (অক্টোবর, ২০১২) - পাঠের সকলে কোথাও বেড়াতে গেছি। বাড়ি ফেরার ট্রেন রাত্রে। অনেকটা সময় ফাঁকা। স্নেহময় স্যার বললেন, আয় একটু পাঠ করি। কিন্তু পাঠ শুরু হতেই কয়েকজন এসে বলল, তোমাদের শুধু পাঠ আর পাঠ। এখন খাওয়া হবে পাঠ হবে না। স্যারের খারাপ লাগল।

বললেন, তাহলে খাওয়াই হোক, পাঠ হবে না। তারপর আমি, আমার স্বামী ও ছেলে ঘুরতে ঘুরতে একটি বড় পুকুরের পাড়ে এসে দেখলাম আমাদের বিপরীত পাড়ে বাঁধানো ঘাটের নীচে একটি সিঁড়িতে বসে স্যার পাঠ করছেন। আমি বললাম, আপনি পাঠ করছেন আমরাও যাব। স্যার বললেন, এখানে সকলে জড়ো হলে আবার কেউ কিছু বলতে পারে। তার চেয়ে মনে মনে 'জয় জীবনকৃষ্ণ' বল তাহলে পাঠ শোনা হয়ে যাবে।

তারপর আমরা স্যারের কাছে গেলাম ও বললাম, ভগবানের নাম করলে পাঠ শোনার সমান হয় কিন্তু পাঠের বিষয়বস্তুগুলি দেখা যায় না । কারণ আপনি যখন পাঠ করছিলেন তখন আমি যেন সব দেখতে পাচ্ছিলাম। .... ঘুম ভাঙল।

- বানী দাস (সুরুল, বীরভূম)।

* দেখছি (৯.০৯.১২) - একটি শরকাঠি নিয়ে সূর্যের মধ্যে জীবনকৃষ্ণের মুখটা আঁকবার চেষ্টা করছি। কিছুতেই হচ্ছে না। তখন নিজের মুখটা সূর্যের গায়ে ঠেকিয়ে চাপ দিলাম। একতাল নরম মাটির গায়ে মুখ ঠেকলে যেমন মুখের ছাপ ওঠার কথা, সেইরকম হল। সেই চিহ্ন ধরে এবার দাগ কাটলাম। আশ্চর্যের ব্যাপার, দেখি ওটা জীবনকৃষ্ণের মুখের ছবি হয়ে গেল। ...

- প্রকৃতি ব্যানার্জী (গড়গড়িয়া)।

ব্যাখ্যা ঃ সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ শ্রীজীবনকৃষ্ণের রূপ আসলে আমারই রূপ। "যোসাবসৌ পুরুষঃ সোহমস্মি"।

দিল্লী চলো

* গত আগষ্ট ২০১২, এক রাত্রে স্বপ্ন দেখছি - পাঁচটি হাতি। তাদের সন্তান একটি মানব শিশু । আবার মনে হচ্ছে ঐ বাচ্চা ছেলেটি আমার সন্তান। ওকে এক্ষুনি দিল্লি নিয়ে যেতে হবে তা না হলে ও মারা যাবে। ...

- শোভন ধীবর (অবিনাশপুর)।

ব্যাখ্যা ঃ পাঁচটি হাতি - দ্রষ্টার পাঁচ রকম বিষয়ে ছড়িয়ে থাকা মন। সেই মন অন্তর্মুখী হলে পরিণামে আত্মা সন্তান লাভ হয়। দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি যাদের,

যাদের যোগ ভোগ দুই-ই আছে, তাদের আত্মিক জীবন রক্ষা ও বিকাশের জন্য প্রয়োজন সমষ্টির সাধনের নিরিখে দর্শন-অনুভূতির বিশ্লেষণ শোনা। তাই দিল্লি নিয়ে যেতে হবে। দিল্লি মানে সেই পাঠচক্র, যেখানে সমষ্টির সাধন তথা আত্মিকে এক হওয়ার (কেন্দ্রীভূত হওয়ার) বিষয়ে চর্চা হয়।

* সম্প্রতি বেশ কিছুদিন পাঠে যাওয়া হয় নি। পাঠে না গেলেও বাড়িতে নিজে নিজে কেন পাঠ করিনি - এ নিয়ে কাকু মৃদু তিরস্কার করলেন। পরদিন (০১.১১.১২) স্বপ্নে দেখছি - একটা ঘরে ঢোকার সময় দরজার দু'পাশে দু'জন লোক কথামৃত ও 'ধর্ম ও অনুভূতি' বই হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। তারা পাঠ করছেন। সেই পাঠ শুনে তবে ভিতরে যেতে হয়। ভিতরে গিয়ে দেখি স্বয়ং জীবনকৃষ্ণ পাঠ করছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, দরজায় ওরা পাঠ করছে কেন? উনি বললেন, ঐ পাঠ শুনে মন শান্ত হবে। শান্ত মনে আমার পাঠ শুনলে তবে তা ভিতরে গাঁথবে। ...

- প্রিয়াংকা দাস দালাল (গড়গড়িয়া)।

চেতয়িতা

* গত ১৪.০৭.২০১২ স্বপ্নে দেখলাম - তুতুনদিকে নিয়ে সমুদ্রের বালিতে খেলছি। বালি দিয়ে জীবনকৃষ্ণের মূর্তি গড়লাম। সেখান থেকে জীবনকৃষ্ণ বেরিয়ে এসে বললেন, আমাকে বালির মধ্যে খুঁজছিস কেন? আমাকে বালির মধ্যে পাবি না। মানুষের মধ্যে খুঁজবি। আমি মানুষের মধ্যে থাকি। ... স্বপ্ন ভাঙল।

দু-এক দিন পর আর একটা স্বপ্ন দেখলাম। দেখছি বিরাট একটা সাপ। তার মুখে আলোক শিখা। সেই আলোর ভিতর জীবনকৃষ্ণের মুখ। পরে দেখি সাপের দেহটা সাপ নয়, অসংখ্য মানুষ পরপর যুক্ত হয়ে ঐ রকম দেখতে লাগছে।...

- গৌরব দত্ত (গড়গড়িয়া)।

ব্যাখ্যা ঃ ব্যষ্টির সাধনে কুণ্ডলিনী (প্রতীকে সাপ) জাগলে চৈতন্য জাগ্রত হয় ও সেই চৈতন্য চৈতন্যময় পুরুষ শ্রীজীবনকৃষ্ণের রূপ নেয়।

সমষ্টির সাধনে - এই জীবনকৃষ্ণের রূপ যে সমগ্র মনুষ্যজাতির প্রাণ চৈতন্যের ঘনীভূত রূপ তা হৃদয়ঙ্গম হয়।

* দুপুরে স্বপ্নে দেখছি (০৪.০৯.১২) - খুব সুন্দর দেখতে একটা গোলাপের পাপড়ি আমার হাতে রয়েছে। সেটি একটা দুধের বাটিতে ডুবিয়ে তুলে নিলাম। অমনি পাপড়িটির মধ্যে শ্রীজীবনকৃষ্ণের মুখের ছাপ স্পষ্ট দেখা গেল।

- প্রকৃতি ব্যানার্জী (গড়গড়িয়া)।

ব্যাখ্যা ঃ আত্মিক (দুধ) দৃষ্টি লাভ হলে বোঝা যায় যা কিছু সুন্দর সেখানে শ্রীভগবানের আভাস আছে ।

বঁধু কোন আলো লাগল চোখে

* দেখছি (২৭.০৫.১২) - একটা কুকুর ভাত খাচ্ছে। আমি একটা পাত্র থেকে গরম জল ছুঁড়ে দেওয়াতে কুকুরটা সরে গেল একটু দূরে। হঠাৎ এক গুচ্ছ সূর্যের আলো এসে পড়ল আমার বাঁ চোখে। আলোর ঝলকানিটা স্থির হয়ে যেন চোখে এঁটে রইল। কী আশ্চর্য! এরপর আমি যত মানুষ দেখছি - তারা সব বিভিন্ন কাজে রত - কিন্তু বোধ হচ্ছে সকলে সমান। কেউ কারও চেয়ে ছোট বা বড় নয়। ... ঘুম ভাঙলে মনে এল রবীন্দ্রনাথের একটা লাইন - 'বঁধু কোন আলো লাগল চোখে!'

- স্নেহময় গাঙ্গুলী (চারুপল্লী)।

ব্যাখ্যা ঃ কুকুর - সংস্কার। ভাত খাচ্ছে - ব্রহ্মজ্ঞানের ধারণা হতে দিচ্ছে না। সূর্যের আলো - ব্রহ্মত্ব বা একত্বের আলো। ডান অঙ্গ ব্যবহারিক জগৎ ও বাম অঙ্গ আত্মিক জগতের প্রতীক। বাঁ চোখে স্থির হয়ে এঁটে রইল - আত্মিক একত্বের দৃষ্টি লাভ হল।

* দেখছি (০১.০৬.১২) - দুজন বান্ধবীকে মেসেজ (SMS) পাঠিয়েছি। ওরা কিন্তু পেল জীবনকৃষ্ণের দেহের একটুকরো হাড়। ঘরে

বসেই তা দেখতে পাচ্ছি। ... স্বপ্ন ভাঙল। পরের স্বপ্নে এই স্বপ্নটা আমি স্নেহময়দাকে বলছি আর দেহের ভিতর অদ্ভুত এক আনন্দ হচ্ছে। দেহটা হাল্কা হয়ে শূন্যে অনেকটা উঠে গেল। ...

ব্যাখ্যা ঃ একজন মানুষ, শ্রীজীবনকৃষ্ণ, ঈশ্বরে পরিবর্তিত হয়েছেন আর তার প্রমাণ পাওয়া যায় - একমাত্র এই বার্তা-ই অন্যকে দেবার আছে দ্রষ্টার। আরও জানা গেল দ্রষ্টার কাছ থেকে মানুষ জীবনকৃষ্ণ সম্বন্ধে Concrete Idea পাবে।

গত অক্টোবরের শেষ দিকে একরাত্রে দেখছি - পাঠ হচ্ছে পাহাড়ের চূড়োয় বসে। স্নেহময়দা আনন্দযজ্ঞের ব্যাখ্যা দিল। প্রত্যেকে নিজ নিজ ঈশ্বরীয় আনন্দের কথা (অনুভূতির কথা) পাঠে দান করলে পাঠচক্র আনন্দযজ্ঞ হয়ে ওঠে। ... - বরুণ ব্যানার্জী (বোলপুর)।

সম্মুখে সদা

* গত আগষ্ট মাসে এক রাত্রে দেখছি - শ্রীজীবনকৃষ্ণ নস্যি নিলেন। পরে রুমাল দিয়ে নাক মুছলেন। পরে পিছনে হাত দুটি মুড়ে রেখে হাতের ঈশারায় আমাকে ওনার পিছু নিতে ডাকছেন। আমি যাব ভাবছি। এমন সময় শাশুড়ী ঢুকলেন ঘরে। তাই আর ওনার কাছে যাওয়া হল না। ...

- শিশির ঘোষ (চারুপল্লী)।

ব্যাখ্যা ঃ শাশুড়ী - সংসার। অনেক সময় শ্রীজীবনকৃষ্ণের আদর্শ অনুসরণে অন্তরায় সৃষ্টি করে সংসার।

* গত ১৭/০৮/২০১২ তারিখ রাত্রে স্বপ্নে দেখছি - গড়গড়িয়া গেছি। খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে। শুধুই মাছ খাওয়া হচ্ছে। আমি একটা মাছ খেতে খেতে সেটা বাঁ হাতে ধরে পিছনে রেখেছি। হঠাৎ একটা কুকুর এসে ওটা মুখে করে টেনে নিয়ে চলে গেল। সেটা দেখতে পেয়ে তরুণ আবার এক পিস মাছ দিয়ে গেল। ... স্বপ্ন ভাঙল। - শ্রীধর ঘোষ (চারুপল্লী)।

ব্যাখ্যা ঃ মাছ - আত্মিক অনুভূতি। ঈশ্বরীয় দর্শন অনুভূতিগুলি স্মরণ মনন

করতে হয় - চোখের সামনে যেন থাকে। অন্যথায় সংস্কার (কুকুর) প্রশ্রয় পায় ও সাধনে বিঘ্ন ঘটায়॥

* দেখছি - একজন দড়ির সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে। আমাকে বলল, তুমিও পিছন পিছন এস। আমি তাই করতে লাগলাম। উপরে উঠে দেখি যুবক শ্রীজীবনকৃষ্ণ দড়ির সিঁড়িতে পা রেখে বসে আছেন। ...

- চন্দ্রাশিস মুখার্জী (সখের বাজার, কলকাতা)।

ব্যাখ্যা ঃ শ্রীজীবনকৃষ্ণ - নিত্য। দড়ি - প্রেম। প্রেম রজ্জু স্বরূপ। এ হল বিনা সাধনে, শুধু তার প্রতি প্রেমলাভে, ২য় স্তরে নিত্যলীলা যোগ।

গিরগিটি

* দেখছি (১৫.০৯.১২) - একটা পোকা। তাকে খাবার জন্য একটা ব্যাঙ স্থির হয়ে আছে। আবার ব্যাঙটাকে খাবার জন্য একটা টিকটিকি ওৎ পেতে আছে। হঠাৎ ব্যাঙটা নড়ে উঠল অর্থাৎ পোকাটাকে ধরেছে। অমনি টিকটিকিটা ব্যাঙটাকে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে দেখছি ঐ পোকা ও ব্যাঙ সহ টিকটিকিটাকে আমি মুখের ভিতর নিয়ে ফেলেছি। টিকিটিকি নয়, ওটা গিরগিটি বুঝতে পারলাম যখন অনুভব করলাম ওর ত্বকটা মসৃণ নয়, খস্‌খসে ও শক্ত। কী অস্বস্তি! সাপের মতই আমি যেন গিলতে পারি কিন্তু মুখ থেকে ফেলতে পারি না। দাঁতেও কাটতে পারি না। পুরো মুখটা ও নাকটা হাত দিয়ে চেপে ধরলাম। কিছুক্ষণ পরে গিরগিটিটা মরে গেল ও তার আয়তন সংকুচিত হল। এবার খুব সহজেই গিলে ফেলতে পারলাম। ... ঘুম ভাঙল। সারাদিন অস্বস্তি ছিল শরীরে। সাপ কিভাবে শিকার গিলে খায় তা বেশ অনুভব করলাম।

- জয়কৃষ্ণ চ্যাটার্জী (জামবুনি)।

ব্যাখ্যা ঃ পোকা - ব্যাঙ - গিরগিটি - দ্রষ্টা = সাধারণ মানুষ (জীব, পোকা)- 'আমি ব্রহ্ম' - এই জ্ঞান হয়েছে যার (বৃহৎ আমি, ব্যাঙ) - নিজের ব্রহ্মত্বলাভের প্রমাণ হিসাবে বহু মানুষের মধ্যে চিন্ময় রূপ ফুটেছে যার (বহুরূপী গিরগিটি) - এই সকল আত্মিক অবস্থাও অতিক্রম করে (গ্রাস করে) এগিয়ে চলেছেন দ্রষ্টা॥

* দেখছি (১৫/১০/১২) - হাতের তালুতে একটু কেটে গেছে - রক্ত পড়ছে। তখন হাত বাড়িয়ে সূর্য থেকে কিছু অংশ চেঁচে নিয়ে ওখানে লাগালাম। অমনি রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেল। ...

- প্রকৃতি ব্যানার্জী।

ব্যাখ্যা ঃ মানব ব্রহ্মের (হাতের কাছে সূর্যের) স্মরণ মননে, তার কিছু সত্তা পেলে দেহ যোগযুক্ত হয় ও প্রাণশক্তির অপব্যয় বন্ধ হয়॥

বাস্তু সাপ

* দেখছি - বাড়ির ভিতর দুটি সাপ। একটা লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে ওদের বের করতে গেলাম। কিন্তু জানলার কাছে একটি ফাঁকে ঢুকে পড়ল। তখন আর একটা সাপ চোখে পড়ল। সকলে বলতে লাগল ওগুলো বাস্তু সাপ, মেরো না। আমি বললাম, এদের মারতেই হবে। এরা হল কাম, ক্রোধ আর লোভ। ... ঘুম ভাঙল। স্বপ্নের কথা স্মরণ করে নিজেই অবাক হয়ে ভাবছি আমি এ কী বললাম!

- সুচিত্রা দত্ত (গড়গড়িয়া)।

ব্যাখ্যা ঃ স্বপ্নে সাপ দেখা মানেই কুণ্ডলিনী –এই সংস্কার থেকে দ্রষ্টা মুক্ত হয়েছেন। বাস্তুসাপ - দেহঘরে স্বাভাবিক স্থিতি যার, দেহের ঐ সকল বদগুণ (কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি)। চেষ্টা করে এদের মারা যায় না। ভগবানের কৃপায় পরিবর্তন হয়।

* দেখছি (২০.০১.১২) - মাধাই (রামরঞ্জন) ও আমি হাঁটছি। একটা কুকুর এল। ঢিল ছোঁড়ার ভান করতেই পালালো। একটু পর আবার এসে গলায় কামড়ে ধরল। দু'হাত দিয়ে কোনক্রমে ছাড়িয়ে ওর মুণ্ডটা ধড় থেকে ছিঁড়ে দিলাম। ধড়টা ছোট্ট হয়ে গেল। কাগজে মুড়ে পকেটে রাখলাম। ফেলার জায়গা খুঁজতে বাড়ি গেলাম। আমাদের বাড়িটা দোতলা ও বেশ বড় হয়ে গেছে। প্রত্যেকের বসার জায়গার উপর Fan রয়েছে। কিন্তু ওটা ফেলার জায়গা খুঁজে পেলাম না।

- জয়কৃষ্ণ চ্যাটার্জী (জামবুনি)।

ব্যাখ্যা ঃ সংস্কার উচ্ছেদ হল। বাইরে সংস্কারের কোন লক্ষনও থাকবে না।

পাঠ প্রসঙ্গে

* ''বাহ্য চৈতন্য না জাগলে অন্তর্চৈতন্য জাগেন না''

আগে বাহ্যজগৎ চৈতন্যময় দর্শন হলে পরে নিজের চৈতন্যময় স্বরূপকে জানা যায়। বাহ্য চৈতন্য জাগলে জগৎ মনকে বাইরে টানে না - ঈশ্বরমুখী করে দেয় অর্থাৎ অন্তর্মুখী করে দেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন কালীঘরে দেখেছিলেন - হঠাৎ কোষাকুষি, মেঝে, চৌকাঠ, বিগ্রহ মূর্তি, ছাদ সমস্তই চিন্ময় জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। জয়কালী জয়কালী বলে চারিদিকে ফুল ছুঁড়তে লাগলেন। ....

পরবর্তীকালে অন্তর্চৈতন্য জাগায়, আমার ভিতর ভগবান (কালী) এই সত্য জানতে পারায় তার বাহ্য পুজো উঠে গেল। তিনি বলতেন, ''আমার ভিতর একজন আছে - সে-ই সব করে।'' এর পূর্ণ পরিণত রূপ দেখি যখন শ্যামপুকুরে কালীপুজোর রাত্রে জীবন্ত কালী রূপে নরেন, গিরিশ ইত্যাদি ভক্ত তাকে পুজো করেছিল।

বিশ্বব্যাপিত্বে — বাইরে বহু মানুষ সাধকের জ্যোতির্ময় রূপ অন্তরে দর্শন করে ও সেকথা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তার কাছে এসে জানায়। সাধকের এই বাহ্য চৈতন্যের প্রকাশ ক্রমে তার অন্তর্চৈতন্য জাগ্রত করে। সাধক এক সময় বোঝেন, তিনি ব্রহ্ম তথা বিশ্বমানব (Universal Man)। তাই জীবনকৃষ্ণ বলেছেন, (৪ ঠা জুন ১৯৫৮) তোরা ভজিস রামকেষ্ট কিন্তু দেখিস জীবনকৃষ্ণ কেন? এই রূপই সত্য, ব্রহ্ম তথা পাতাল ফোঁড়া শিব।

সমষ্টিতে, ২য় স্তরে - একজন মানুষ অন্তরে সর্বজনীন মানুষকে দেখে তাকে ব্রহ্ম বলে পুরোপুরি ধারণা করতে পারেন না। পরে যখন দেখেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বহু মানুষ এই মানুষটিকে বিচিত্রভাবে ভিতরে স্বপ্নে বা ধ্যানে

দেখছে বলে জানাচ্ছে তখন তিনি মানবব্রহ্মকে ধারণা করতে পারেন।

* ''পরীক্ষিৎ প্রসঙ্গ''

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষ দিনে অশ্বত্থামা দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে রাতের অন্ধকারে হত্যা করেন। পর দিন সকালে অর্জুনের মুখোমুখি হলে তিনি তাকে বধ করার জন্য ব্রহ্ম-শির অস্ত্র ছোঁড়েন। কৃষ্ণ অস্ত্রের সামনে বুক পেতে দাঁড়ালে অর্জুন রক্ষা পায়, কিন্তু বিকল্প হিসাবে কৃষ্ণের নির্দেশে ঐ অস্ত্র উত্তরার গর্ভে অভিমন্যুর ছেলেকে অর্থাৎ অর্জুনের নাতিকে বধ করে। উত্তরা মৃত সন্তান প্রসব করলে কৃষ্ণ তার ব্রহ্মতেজে তাকে নবজীবন দান করেন। সন্তানটিকে সকলে কোলে নিতে গেলে সে কারও কোলে গেল না। কিন্তু কৃষ্ণ কাছে এলে তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন কৃষ্ণ বলল, ও সকলকে পরীক্ষা করে দেখে শেষে প্রাণপুরুষকে চিনে নিয়েছে তাই ওর নাম হোক পরীক্ষিৎ।

যোগেতে পরীক্ষিৎ হল সেই ব্যক্তি যিনি দেহের ভিতরে সচ্চিদানন্দ গুরুকে দেখে নতুন প্রাণ পান ও বাইরে সেই সচ্চিদানন্দের জীবন্ত বিগ্রহ যে মানুষটি, তাঁকে খোঁজেন ও চিনতে সক্ষম হন।

ঠাকুরকে মা দেখিয়ে দিয়েছিলেন, ''এরা সব তোর ভক্ত।'' তারাও পরীক্ষিৎ। তারা ঠাকুরের স্থূল সান্নিধ্য লাভ করে তাঁকে তাদের প্রাণপুরুষ রূপে চিনতে পেরেছিল। তবে ঠাকুর যেমন তাদের দেখেছেন তারাও যদি ভিতরে ঠাকুরকে দেখতেন ''তবে দাঁতে দাঁত বসত'' - ষোলআনা হত। এ যুগে, সমষ্টির সাধনের যুগে, পরীক্ষিৎ সে-ই যিনি ব্রহ্মত্ব-লাভকারী মানুষটির সাথে একত্ব লাভ করেছেন তাঁর চিন্ময় রূপ অন্তরে দর্শন করে।

* ধর্ম ও বিজ্ঞানের তফাৎ কি?

বিজ্ঞান বাইরের জগতের কার্যকারণ বিশ্লেষণ করে যান্ত্রিক সত্য (Mechanical Truth) বা জড় জাগতিক সত্য আবিষ্কার করে ও এই জ্ঞানের সাহায্যে মানুষের সুবিধার্থে প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রকৃতিকে নিজের অনুকূলে আনে। মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে।

ধর্ম ভিতরের জগতে কার্য-কারণ বিশ্লেষণ করে জীবনসত্য (Truth of life) আবিষ্কার করে ও এই জ্ঞানের অনুশীলনে মানুষের বোধের পরিবর্তন হয়। মানুষটা বদলে যায় - বাইরের হাজারো অসুবিধা সত্ত্বেও অহৈতুকী ঈশ্বরীয় আনন্দের নিরবচ্ছিন্ন স্রোত বইতে থাকে মানুষের দেহে।

বিজ্ঞান দেয় সুখ আর ধর্ম দেয় শান্তি।

শ্রী জীবনকৃষ্ণ এক স্বপ্নে দেখেছিলেন, একজন কুৎসিত-দর্শন নারী কেঁদে বলছে - 'আমার কীসে শান্তি হবে?' উনি বললেন, 'ভগবান ভগবান কর।'

*** ''পট পড়া''**

শ্রীজীবনকৃষ্ণ এক স্বপ্নে দেখলেন, তিনি বসে আছেন, তাঁর সামনে একটা পট পড়ে গেল। সেই পটে ওনার রূপ। পটের সামনে একটা বাতি। সেটা ওনার দেহে ঢুকে গেল। আর সহস্রার থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সমস্ত দেহটা জ্যোতিতে ভরে উঠল, অস্থি মজ্জা সব জ্বলে উঠল।

রামকৃষ্ণ নিজের ফটো মা ঠাকরুণকে দিয়ে বলেছিলেন, 'কালে এই ছবি ঘরে ঘরে পুজো হবে।' কিন্তু জীবনকৃষ্ণের ফটো পুজো হবে না, তাঁর ছবির পট পড়ে গেল। বাতি দিয়ে পুজোর (আরতির) নতুন ধারা প্রকাশ পাবে জগতে। তিনি চিন্ময় দেহধারী হয়ে সর্বকালে থেকে যাবেন। তাঁকে অন্তরে দেখলেই তাঁর পুজো তথা আরতি হয়ে যাবে। কেননা তাঁকে ভিতরে দেখলে তাঁর কথা স্মরণ মনন হবে আপনা হতে। তিনি নিজের মহিমা নিজেই প্রকাশ করবেন।

*** বসানো শিব ও পাতাল ফোঁড়া শিব।**

শ্রীরামকৃষ্ণ বসানো শিব। তাই বিবেকানন্দ তাঁর প্রচার করেছেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, তোরা ভজিস রামকৃষ্ণ কিন্তু দেখিস জীবনকৃষ্ণ কেন? এই-ই সত্য, পাতাল ফোঁড়া শিব। শ্রীজীবনকৃষ্ণ আবার এক জায়গায় বলেছেন, যারা আমার কাছে এসে আমায় স্বপ্নে দেখছে তারা বসানো শিব। আর যারা

আমার কথা না শুনে আমাকে না দেখে আমাকে স্বপ্নে দেখছে তারা পাতাল ফোঁড়া শিব।

প্রকৃত অর্থে বসানো শিব হয় না। কেননা প্রচারের দ্বারা শিবত্বের জাগরণ ঘটানো যায় না, আপনা হতে হয়। তবে সূক্ষ্ম তফাৎ বোঝাতে তিনি একথা বলেছেন। যারা তাঁর কথা না শুনে তাঁকে চাক্ষুষ না দেখে স্বপ্নে দেখছে তাদের নতুন ভাবনাকে গ্রহণ করার ক্ষমতা (Potentiality) বেশি। অবশ্য অনুশীলনই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

দ্রোণ অস্ত্রবিদ্যা শেখালেন অর্জুনকে। শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর তৈরী করলেন। কিন্তু একলব্য মাটির দ্রোণ তৈরী করে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করলেন - তার ক্ষেত্রে পাতাল ফোঁড়া শিব। তাই তিনি যখন সাতটি তীর মেরে চিৎকাররত কুকুরের মুখ বন্ধ করলেন তা দেখে অর্জুন স্তম্ভিত হয়ে গেল। বুঝল একলব্য তাকেও ছাড়িয়ে গেছে। সপ্তভূমির সাধন তথা বৈদিক সাধন বিষয়ে তার স্পষ্ট ধারণা হয়েছে। তাই প্রচলিত ধর্মের সংস্কার (কুকুর) তাকে বিরক্ত করতে অর্থাৎ জ্ঞানের অনুশীলনে বাধা সৃষ্টি করতে পারল না।

*** পরশুরাম পিতা জমদগ্নির নির্দেশে মা'কে কেটে ফেললেন দু'টুকরো করে। সন্তুষ্ট পিতার বরে শক্তিশালী হয়ে ২১ বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেন।**

মা-কে কেটে ফেললেন। মা - সগুণ ব্রহ্ম। ষষ্ঠভূমির ঈশ্বরীয় রূপ। বেদান্ত সাধন কালে ঠাকুর বলেছেন মা-কে জ্ঞান খড়্গ দিয়ে কেটে ফেলায় মন হু হু করে উপরে উঠে গেল - নির্বিকল্প সমাধি হল। নির্গুণ ব্রহ্মের অর্থাৎ পিতার কৃপা লাভ হল। নিঃক্ষত্রিয় করা - রজোগুণের নাশ।

*** ব্রহ্ম যে কী তা মুখে বলা যায় না। সব জিনিস এঁটো হয়েছে কিন্তু ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন না। অবাঙ্মনসোগোচরম্।**

এযুগে মানুষ মানবব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করছে, তার মহিমা অন্তরে দর্শন করে তা বলতে পারছে। কিন্তু যেহেতু তিনি বিশ্বজনীন এবং সর্বকালীন তাই তা এঁটো হয়েও এঁটো নয় বলেই বিবেচিত হয়। যেমন নদীর বা সমুদ্রের জল কেউ

মুখে নিলে নদীটা বা সমুদ্রটা এঁটো হয়ে যায় না। স্বল্প পরিসর জল হলে, গ্লাসের জল হলে, এঁটো হত। ব্যষ্টিতে ব্রহ্মকে উচ্ছিষ্ট করা যায় কিন্তু বিশ্বব্যাপীত্বের নিরিখে ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন না।

*** শ্রী জীবনকৃষ্ণ বললেন, আমাকে এক অনুভূতিতে বলেছিল - আপনি জানবেন আপনি ভগবান কিন্তু গুপ্তভাবে লীলা। আমার অবস্থাটা কেমন জানিস - রাজা, কিন্তু ভিক্ষা করে খেতে হয়।**

তিনি রাজা অথচ আমাদের স্বপ্নের নৈবেদ্য গ্রহণ করে নতুন নতুন জ্ঞানলাভ করেন, তাতে তার আত্মিক ঐশ্বর্য বাড়ে। তাই বলতেন, তোরাই আমাকে ঈশ্বরত্ব দান করলি। অর্থাৎ ঈশ্বর সত্তার পরিচয় দান করলি। তোরা যত আমায় স্বপ্নে দেখে এসে বলিস ততই আমার আনন্দ বাড়ে, তেজ বাড়ে।

*** একটা ব্যাঙের গর্তে একটি আধুলি ছিল। একটা হাতি তাকে ডিঙিয়ে যাওয়ায় ব্যাঙটা গর্ত থেকে বেরিয়ে হাতিকে লাথি দেখিয়ে বলছে, তোর এত সাহস যে আমাকে ডিঙিয়ে যাস!**

ব্যাঙ অংহকার ও হাতি মনের প্রতীক।

অর্থ অহংকার বাড়ায়। মন যখন ষষ্ঠভূমি অতিক্রম করে শুদ্ধ মন হতে যায় তখন অহংকার বাধা দেয়। এখন প্রশ্ন হল - ব্যাঙ যতই লাথি দেখাক সে কি সত্যিই হাতিকে বাধা দিতে পারে?

মন অশুদ্ধ থাকলে সে অহং-এর বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না। তাই ব্যাঙ লাথি দেখায় এবং বাধা দেয়। কিন্তু শুদ্ধ মনকে পারে না।

*** অর্জুন তীর ছুঁড়ে মাছের চোখ বিদ্ধ করায় দৌপদীকে স্ত্রী হিসাবে পেল।**

তীরবৎ গতিতে কুণ্ডলিনী সহস্রারে গিয়ে আত্মা (মাছ) সাক্ষাৎকার হয় যে সাধকের তিনি অর্জুন। পরম ধন অর্জন করেন। মাছের চোখ - জ্ঞানচক্ষু - আত্মিক দৃষ্টি। ভগবান দর্শন হলে শুদ্ধ মন হয় - আত্মিক অনুভূতির যৌগিক (দেহতত্ত্বের) ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে পারেন সাধক। তখন দেবস্বপ্নে যা দেখেন

ঈশ্বরের কৃপায় তার সাথে ওতপ্রোত হয়ে তাঁর চোখে দেখেন। কেননা স্বপ্নের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা দেহস্থ আত্মা। একবার জীবনকৃষ্ণের একটা দর্শন হচ্ছে। পাশে বসে থাকা আনন্দবাবুকে বললেন, আমাকে ছুঁয়ে দেখ তো! ওনাকে ছোঁবার পর আনন্দবাবুরও ঐ একই দর্শন হল।

দ্রৌপদী - দ্রুপদ কন্যা। দ্রুপদ - যার পা পোড়া - তাই দারুপদ বা কাঠের পা। অগ্নিবিদ্যার নিরিখে যার অগ্রগতি বিচার করতে হয় - অর্থাৎ আত্মিক জগতে যিনি ক্রমাগত এগিয়ে চলেছেন, ঈশ্বরত্ব লাভ করেছেন।

তাই দ্রৌপদী হল - ঈশ্বর কন্যা - বাবুর মেয়ে - ভাগবতী তনু। কৃপা মানে গরীবের ছেলের উপর বড় মানুষের নজর পড়ে গেল। বাবু তার মেয়ের বিয়ে দিলেন। .....

দ্রৌপদী একজনের স্ত্রী নয় সব ভাইয়ের স্ত্রী - সব কৃপাপ্রাপ্ত মানুষই কারণশরীরের (ভাগবতী তনুর) লীলা দর্শনের অধিকারী। জীবনকৃষ্ণকে অন্তরে দর্শন করার পর দেবস্বপ্ন চলতে থাকে, কারণশরীর অর্থাৎ দ্রৌপদী জীবনসঙ্গিনী হয়।

*** বিবেক কী?**

প্রচলিত মতে বিবেক বলতে বোঝায় ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সদ্-অসদ্, ধর্মাধর্ম, কর্তব্য-অকর্তব্য প্রভৃতি বিচারের জন্য মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি। ঠাকুর বললেন, সদ্ অসদ্ বিচারের নাম বিবেক। ঈশ্বর সৎ আর সব অসৎ। ঈশ্বরদর্শন না হলে একথা ধারণা করা যায় না। সপ্তমভূমিতে মন গেলে তবে ষোলআনা ঈশ্বরদর্শন হয়। ষষ্ঠভূমিতে যে ইষ্টদর্শন হয় তা কানার হাতি দেখা - আংশিক দর্শন। তাই ঠাকুর বললেন, সপ্তমভূমিতে মন গেলে বিবেক লাভ হয়।

i) আগমে - সপ্তমভূমিতে আত্মা সাক্ষাৎকার হয় - পরে বেদান্তের সাধনের শেষে মহাকারণে বোধাতীত অবস্থায় প্রাণচৈতন্য লীন হলে সাধক উপলব্ধি করেন ঈশ্বর সৎ আর সব অসৎ।

ii) নিগমে - মানুষরতন দর্শন হলে ধারণা করা যায় যে, ''ঈশ্বর বস্তু আর সব অবস্তু।'' বস্তু - যা দেখা যায়। এখানে ঈশ্বর বা অখণ্ড চৈতন্য মানুষের

রূপে দৃশ্যমান হলেন।

সমষ্টিতে - নিজের আত্মিক দর্শনে ও বহুজনের ঈশ্বরীয় দর্শন শুনে বহুত্বে একত্বের উপলব্ধি হয়েছে যার তারই বিবেক লাভ হয়েছে। তিনি জানেন, তিনি ও জগতের অপর যে কোন মানুষ আত্মিকে এক। তাই অন্যের প্রতি কোন অন্যায় আচরণ তিনি করতে পারেন না। এই মানুষই পারেন ঈশ্বরের জন্য, তথা একত্বের অমৃত আস্বাদনের জন্য মুহূর্তে যে কোন কিছু ত্যাগ করতে।

*** ঠাকুর বললেন, পূর্বজন্মের সংস্কার থেকে যায়। এক রাজার ছেলে পূর্বজন্মে ধোপা ছিল। সে তার বন্ধুদের সাথে খেলা করার সময় বলত, আমি উপুড় হয়ে শুই আর তোরা আমার পিঠের ওপর হুস হুস করে কাপড় কাচ।**

পূর্বজন্ম নয়, বহু প্রজন্মের সংস্কার রক্তের মধ্যে দিয়ে আসে। ঠাকুরের মধ্যে দুই ধরণের সংস্কারই ছিল। সোহম্ - আমি রাজার ছেলে - অমৃতস্য পুত্রাঃ - এটি বৈদিক কৃষ্টির সংস্কার। আবার অনার্য কৃষ্টির সংস্কার হল - সাধন করে দেহ পবিত্র করতে হবে। ঠাকুর নিজের জন্য বলছেন, রাজার ছেলে সাত তলা বাড়ির উপর নিচে যাতায়াত করতে পারে অনায়াসে। কখনও গল্প বলছেন ছদ্মবেশী রাজার, যাকে শেষে প্রজাদের কেউ কেউ চিনতে পেরে গেল। কিন্তু অনার্যদের ভক্তি কাল্ট তথা ধোপার সংস্কার প্রাধান্য পেয়েছিল তাঁর জীবনে । তাই তিনি অন্তরঙ্গ ভক্তদের বলছেন, খুব করে সাধন করবি। পরে তার কাছ থেকে শুধু বৈদিক কৃষ্টির উত্তরাধিকার লাভ করেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ।

*** সখি বলল- রাধে, কৃষ্ণ মেঘে বরিষণ হত, তুই মান ঝঞ্ঝাবাতে সেই মেঘ উড়াইলি।**

ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ থেকে এর ব্যাখা করা যেতে পারে।

রাধা - যিনি নিজেকে বড় ভক্ত ভাবেন - দেহাভিমানী ব্যক্তি।

ধর্ম জগতের মধ্যে দীক্ষাগুরু, গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী, মঠের মোহান্ত, আশ্রমের মালাতিলকধারী সাধু ইত্যাদিরা বহু সখী পরিবৃতা রাধিকার ন্যায় বহু শিষ্য পরিবৃত থাকেন।

কৃষ্ণমেঘ - নির্গুণ। বরিষণ - কৃপাবৃষ্টি। নির্গুনের প্রসন্নতা লাভে কৃপাবারি লাভ, নানা ঈশ্বরীয় দর্শন অনুভূতি লাভ হয়- কিন্তু দেহজ্ঞান বা দেহাভিমানের

জন্য মানঝঞ্ঝাবাতে কৃষ্ণ মেঘ উড়ে যায়, কৃপাবারি লাভের সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। কিন্তু সখী কে? অতি সাধারণ মানুষ - তারা নিরহঙ্কার হতে পারেন। ঠাকুর বলেছেন - এক গয়লানী শিষ্যার জন্য তার গুরুর নারায়ণ দর্শন হয়েছিল। এখানে ঐ শিষ্যা সখী আর গুরুদেব শ্রীমতির উপমা।

*** রাবণ সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে যাবার সময় জটায়ু বাধা দিল। কিন্তু রাবণ তাকে তরোয়াল দিয়ে ভয়ংকর জখম করে বাধাহীনভাবে লঙ্কায় চলে গেল। সীতা ও রাবণের সংবাদ পরে হনুমান পেল জটায়ুর দাদা সম্পাতির কাছে। সম্পাতি ছিল মহাশক্তিধর। একবার সে উড়তে উড়তে সূর্যের কাছে পৌঁছে যাওয়ায় তার ডানা দুটি সূর্যের প্রখর কিরণে পুড়ে গিয়েছিল। তাই সে এক পাহাড়ের চুড়োয় বসে থাকত।**

জটায়ু ও সম্পাতি পাখী আত্মিক স্ফূরণের দুটি ভিন্ন পর্যায়। জটায়ু অবস্থায় দুটি পক্ষ থাকে - অর্থাৎ ঈশ্বরীয় দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে বলে দ্রষ্টা মনে করেন। পরিণতিতে দ্রষ্টার জীবনে স্বপ্নটির কার্যকরী ভূমিকা থাকে না। কয়েকটি উদাহরণ -

১) একবার মথুরবাবু ঠাকুরকে ঘোড়ার গাড়িতে চড়িয়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ঘোড়া হঠাৎ এলোমেলো ছুটতে শুরু করলে মথুরবাবু ঠাকুরকে ধরে লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামার কথা ভাবছেন। এদিকে ঠাকুর দাঁড়িয়ে ভাবস্থ। গাড়োয়ান কোনক্রমে ঘোড়াগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে গাড়ি থামালেন। মথুরবাবু বললেন, বাবা, এতক্ষণ কী হচ্ছিল তুমি জান? ঠাকুর বললেন, না। আমি দেখছিলুম, আমি যেন সীতা, তুমি রাবণ হয়ে আমাকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছ - আর জটায়ু পাখী তোমাকে বাধা দিচ্ছে। মথুরবাবু বললেন, আমাদের প্রাণ যাবার উপক্রম আর তুমি ভাবে কি না কি দেখছ, তোমাকে নিয়ে আর কোথাও যাব না।

এই দর্শনে দেখালো মথুরবাবুর সেবা গ্রহণে ঠাকুরের আত্মিক শক্তি চুরি যাচ্ছে - তাই তাঁর আত্মাপাখী এতে বাধা দিচ্ছে। মথুরবাবুর সঙ্গ ত্যাগ করতে বলছে। কিন্তু দর্শনটির এই ইঙ্গিত গ্রহণে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। মথুর বাবু তাঁর পরম ভক্ত ও রসদ্দার। দর্শনটির হয়তো অন্য কোনো অর্থ হবে ভেবে

দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ায় প্রকৃত অর্থের উপর জোর দিলেন না।

২) ঠাকুর বললেন, দেখালো ওদেশে হালদার পুকুরে একজন ছোটলোক পানা সরিয়ে জল খেলে। বোঝালো, যে পানা সরায় সে জল দেখতে পায়। সাধন না করলে ঈশ্বর দর্শন হয় না। কিন্তু জীবনকৃষ্ণ ব্যাখ্যা দিলেন, ছোটলোক - যার অহং ছোট হয়েছে - অর্থাৎ ভগবান। ভগবান কৃপা করে পানা অর্থাৎ মায়ার আবরণ সরিয়ে দিলে তবে জল অর্থাৎ সচ্চিদানন্দবারি দেখতে পাওয়া যায়।

কেউ যদি ভাবেন ঠাকুরের ব্যাখ্যা ঠাকুরের পক্ষে সত্য আর জীবনকৃষ্ণের দেওয়া ব্যাখ্যা জীবনকৃষ্ণের পক্ষে সত্য - এই দুই পক্ষকে যিনি মানবেন তিনি সত্য গ্রহণ করতে সমর্থ হবেন না। তিনি জটায়ু অবস্থায় আছেন। আরও উচ্চ অবস্থা, সম্পাতি অবস্থায় পৌঁছালে বুঝবেন জীবনকৃষ্ণের ব্যাখ্যাটাই একমাত্র সঠিক ব্যাখ্যা - তারই জীবনে রাবণ বধের সঠিক দিশা মিলবে অর্থাৎ তিনি মায়ামুক্ত হবেন।

৩) ইলামবাজারের শিখাদেবী স্বপ্নে দেখলেন - তাঁর ছেলে ও ভাসুরের ছেলে হারিয়ে গেছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া গেল না। বাড়িতে কান্নাকাটি হচ্ছে। এমন সময় জীবনকৃষ্ণ ছেলেদুটিকে দুই কোলে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ছেলে দুটির মাথা ন্যাড়া, গলায় পৈতে। উনি বললেন, ভাবিস না, এই নে তোদের সন্তান। আমি নিয়ে গিয়েছিলাম। সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। খুব আনন্দ হল। ঘুম ভাঙল।

ওদের বাড়িতে পাঠ হয়। পাঠে ব্যাখ্যা দেওয়া হল - ছেলে দুটিকে জীবনকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মবিদ) করে দিয়েছেন, আর পৈতে দেবার দরকার নেই।

দ্রষ্টা ভাবলেন, অন্য ব্যাখ্যাও তো হতে পারে। দেখাচ্ছে পৈতে দিতে হবে। কেননা তার অন্তর চাইছে পৈতে দিতে। ব্রাহ্মণের সংস্কার রয়েছে ভিতরে। ব্যাখ্যার এই দুটি পক্ষ দাঁড়িয়ে যাওয়ায় দ্রষ্টা সঠিক অর্থ গ্রহণ করলেন না। ফলে তার জীবনে স্বপ্নটি নিরর্থক হয়ে গেল।

প্রায় ১ বছর পর স্বপ্নদ্রষ্টার বৃদ্ধ শ্বশুরমশাই স্বপ্নে দেখলেন, ঘন কুয়াশা। সেখান থেকে একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কে যেন বলছে, ''তোর

নাতিদের ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে আর আলাদা করে পৈতে দিস না।'' এই স্বপ্নের দ্বিতীয় কোন অর্থ হয় না। ক্রমাগত পাঠ অনুশীলনে থাকায়, সম্পাতি অবস্থায় পৌঁছে যাওয়ায় স্বপ্নের নির্দিষ্ট কল্যাণকর অর্থটি স্পষ্ট হল।

মনে রাখতে হবে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একটি স্বপ্নের বিভিন্ন অর্থ হয়। যেমন স্বপ্নে দ্রষ্টার আত্মিক অবস্থা, বা যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছেন তার অবস্থা বোঝায়, কখনও বা Dream goes by contrary ধরে স্বপ্নের ঠিক বিপরীত অর্থ হয়, কখনও ব্যবহারিক জীবনের ইঙ্গিত থাকে আবার কখনও সকলের জন্য শিক্ষনীয় বার্তা থাকে। তাই স্বপ্নের সঠিক ব্যাখা না করে দুটি পরস্পর বিরোধী ব্যাখ্যা করলে মানুষ বিভ্রান্ত হয়।

*** ১৬.০৯.১৯৫৬ তারিখে দুপুরে শ্রী জীবনকৃষ্ণের একটি স্বপ্ন।**

শ্রী জীবনকৃষ্ণ দেখলেন - 'ঘুম ভাঙতেই দরজা খুলে দেখি মাচার উপর বসে আমারই মত দেখতে এক দাড়িওয়ালা মুসলমান। সে বলল, আমায় চিনতে পারছেন না? আমি ঠিক চিনতে পারছি না অথচ মনে হচ্ছে সে যেন আমার খুব পরিচিত। তা যাইহোক বললুম, হ্যাঁ হ্যাঁ চিনতে পারছি। তারপর সে বলল, সব আতর বিক্রি করে ফেলেছি। শুনে ভাবলুম এরা ব্যবসায়ী, মার্কেট ডাউন হবে জানতে পেরে বুঝি আগে আগেই মাল সাফ করে দিয়েছে। তারপর সে বলল, যে আপনাকে সরবরাহ করে তাকে জিজ্ঞেস করবেন। ঘুম থেকে উঠে ভাবতে লাগলুম, তাই তো রে শালা কী দেখলুম, মানেই বা কী? তোমরা কেউ বলতে পার? সত্যবাবু, সুধীন, ক্ষিতীশ, রাধু- আমি তোমাদের শরণাপন্ন হচ্ছি''।

ক্ষিতীশ - মনে হচ্ছে এ যুগে আত্মিক ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ Maximum (সর্ব্বোচ্চ) হয়ে গেছে, আর হবে না।

শ্রী জীবনকৃষ্ণ - কী জানি, আমি কিছু মানে করতে পারছি না।

আমাদের মনে হচ্ছে, এই স্বপ্নে দেখিয়েছিল, মুসলমানটির আতর - Semitic cult এর Essence - অর্থাৎ তাঁর জীবনে ভক্তিবাদের মাধুর্যরস আস্বাদন চরমসীমায় পৌঁছেছে - এরপর শুরু হবে অদ্বৈতবাদ - ও পরে একত্বের মহিমা প্রকাশ। এই স্বপ্নের পর আর বেশি দিন মানুষ তাঁকে সচ্চিদানন্দগুরু

রূপে দেখেনি। ১৯৫৭ সালেই তাকে ভগবান রূপে মানুষ দেখতে শুরু করেছিল।

*** ১৯৬৩ সালে জীবনকৃষ্ণ এক স্বপ্নে দৈববানী শুনলেন, খুব মৃদু আর কম্পিত কণ্ঠে একটু আবদার মিশ্রিতও বটে, কে যেন খুব দূর থেকে বলছে, ''ইচ্ছামৃত্যু চেয়ে নে না।''**

এই দৈববাণীর কোন অর্থ সম্পর্কে তখন জীবনকৃষ্ণ কোন মন্তব্য না করে শুধু বলেছিলেন, ''ইচ্ছা মৃত্যু মানে আজ পর্যন্ত ঠিক হয়নি আর আমি নিজেও জানি না। এসব বিশ্বাসও করি না। তবে একটা মজা বটে।''

জীবনকৃষ্ণ তো নিজের মৃত্যুঞ্জয় সত্তা আবিষ্কার করে অমর হয়েছেন। তাঁর আবার ইচ্ছামৃত্যু কি? এটা স্থূল কোন অর্থে নয়। তিনি তো সর্বকালীন।

তাঁরই লীলার একটা নির্দিষ্ট পর্যায় শেষ না হওয়া পর্যন্ত তো তাঁর নতুন লীলার সূচনা হবে না। তাই তারই ইচ্ছায় নতুনকালে মানুষের মধ্যে তার নতুন লীলা শুরু হবে। তার চৈতন্য নতুন আদর্শ দেখাতে নতুন দেহ অবলম্বন করেও প্রকাশ পেতে পারে যদি তিনি ইচ্ছা করেন।

একজন স্বপ্নে দেখলেন সূর্যের ভিতর একটা ছোট্ট শিশু খেলে বেড়াচ্ছে। আত্মিকে তাঁরই (সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ শ্রী জীবনকৃষ্ণের) আবার নতুন লীলার সূচনার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

বিশ্বব্যাপিত্বের সাধনের একটা পর্যায় যেন শেষ হল (মৃত্যু হল) নতুন পর্যায় শুরু হওয়ার জন্য। নতুনভাবে মানুষের মধ্যে একত্বের চেতনা আনছেন। ১৯৫৮ তে যেটা শুরু হয়েছিল তাঁকে সূর্যমণ্ডলে দেখা থেকে সেই লীলার যেন একটা স্বাভাবিক পরিণতি ঘটছে তাঁরই নতুন লীলার সূচনার মধ্য দিয়ে। তিনি একইভাবে চিরদিন লীলা করবেন না। কোন নির্দিষ্ট পর্যায়ে গিয়ে তাঁর লীলার পরিবর্তন যেন তাঁরই ইচ্ছাধীন (ইচ্ছামৃত্যু)।

ইছাপুরের অনিন্দিতা মণ্ডল স্বপ্নে দেখলেন, সন্ধ্যাবেলা, বাড়িতে অনেক লোক। সেখানে যেন জীবনকৃষ্ণের মৃত্যু হয়েছে। উনি মনে মনে খুব উৎকণ্ঠিত, আবার ভাবছেন আজ বাড়িতে জীবনকৃষ্ণ আসবেন। দ্রষ্টা খুব আনন্দ পাচ্ছেন জীবনকৃষ্ণ আসবেন বলে, যেন জীবনকৃষ্ণ জীবিতও বটে আবার মৃতও বটে।

তাঁর বিকাশের এই পর্যায়ে সাধারণ মানুষের মাথাতেও সংস্কার-মুক্তি

ঘটে একত্বের ধারণা হবে। একমাত্র তাঁর (জীবনকৃষ্ণের) ইচ্ছাতেই নতুন পর্যায়টা মানুষের ধারণা হবে॥

*** পুরাণে আছে একদন্তী গণেশের কথা। পরশুরাম গণেশকে উপেক্ষা করে বিশ্রামরত শিবের সঙ্গে জোর করে দেখা করার চেষ্টা করলে গণেশের সঙ্গে তার যুদ্ধ বাধে। পরশুরাম যুদ্ধে হেরে যান। তার অস্ত্র পরশু (কুঠার) বিফল হয়। তখন গণেশ নিজের একটি দাঁত স্বেচ্ছায় ভেঙ্গে ফেলে লোকচক্ষে পরশুরামের বীরত্বকে স্বীকৃতি দেন।**

এর মর্মার্থ হল - পরশুর মত তীক্ষ্ণধার বুদ্ধি থাকলেই (পরশুরাম) জোর করে সকল শুভশক্তির আধার শিবকে (Source of all goods) লাভ করা যায় না। গণেশের অর্থাৎ নির্গুণের সম্যক প্রসন্নতা প্রাপ্ত সর্বজনীন মানবের মাধ্যমে এই শিবকে লাভ করা যায়। বিবিদিষাপন্থী বুদ্ধিমান লোকেরা অপরাবিদ্যায় দাঁত ফোটাবার ক্ষমতা লাভ করেছেন যা মানুষের বাহ্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যোগাতে সাহায্য করে। আর গণেশ নিজে একদন্তী হয়েছেন - শুধু পরাবিদ্যায় দন্তস্ফুট করার ক্ষমতা অর্থাৎ ঈশ্বরীয় অনুভূতির মর্মার্থ গ্রহণের ক্ষমতা নিজের কাছে রেখেছেন। এই গণেশকে অন্তরে দর্শন করে তাঁর সত্তা পেলে তবেই কোন ব্যক্তি ঈশ্বরীয় অনুভূতির অর্থ করতে সমর্থ হন॥

স্মৃতিকথা

আনন্দমোহন ঘোষ ঃ একটা সময় এসেছিল যখন শ্রী জীবনকৃষ্ণ কোন নতুন লোক এলেই তাকে শাক্তী করতেন অর্থাৎ নিজের শক্তি দিয়ে তার চৈতন্য জাগ্রত করে দিতেন। কিন্তু তাদের দেহ সেই চৈতন্য জাগরনের বেগ সহ্য করতে পারত না। শ্রী জীবনকৃষ্ণের এই অবস্থাটি প্রায় দেড় বছর চলেছিল। সেইসময় একদিন শনিবার বিকাল চারটে হবে, ঘরে ঢুকে দেখি একজন রোগা লম্বা

চেহারার লোক মেঝেয় শুয়ে আছে। ঘরের কয়েকজন তার মুখে চোখে কুঁজোর জলের ঝাপটা দিচ্ছেন এবং পাখার বাতাস করছেন। শায়িত ব্যক্তিটি একবার হি হি করে হাসছেন আবার পরক্ষণেই ঢুকরে কেঁদে উঠে চুপ করছেন। আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ওইরকম হাসছেন ও কাঁদছেন। দু'একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম ওই ব্যক্তি একজন পুলিশ কর্মচারী। ঘরের কোন ভক্তের সাথে আজই প্রথম এসেছেন। ঘরে এখন পাঠ বন্ধ। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে তাঁর হুঁশ ফিরে এল। তিনি উঠে বসলেন ও চারিদিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। ওই ব্যক্তি যখন হাসছিলেন ও কাঁদছিলেন, শ্রী জীবনকৃষ্ণ বললেন - এই দ্যাখ্ একেই পরমহংস অবস্থা বলে। যদিও এটি নিম্নস্তরের পরমহংস অবস্থার আভাস।

অনাথনাথ মণ্ডল ঃ শ্রী জীবনকৃষ্ণ পাঠের মাঝে প্রসঙ্গ উঠলেই নানা গল্প বলে পাঠের পরিবেশকে অন্য মাত্রা দান করতেন। একদিন তিনি আমাদের চীন দেশের একটা গল্প শোনালেন। গল্পটি এই - এক চীনা চাষী তার বুড়ো হালের বলদকে তার বাগানে একটা পুরনো গাছের গোড়ায় বেঁধে রেখেছে। বলদ আর গাছের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে। বলদ গাছকে বলছে - দেখ ভাই, আমি কত বছর ধরে মালিকের চাষে খেটে কত ফসল ফলাতে সাহায্য করেছি। এখন আর খাটতে পারি না বলে মালিক আমাকে কসাইয়ের কাছে বিক্রি করবে বলে ঠিক করেছে। গাছ বলদের কথা শুনে বললে - আরে ভাই বলব কি, আমি কত বছর ধরে ফল দিয়ে এলুম মালিককে। এখন আর ফল দিতে পারছি না বলে মালিক কেটে ফেলবে বলে ঠিক করেছে। উঃ, মানুষ কত অকৃতজ্ঞ! উনি বললেন, এ গল্পের moral হল Ingratitude of man (মানুষের অকৃতজ্ঞতা)।

উনি মাঝে মাঝে ঘরে সাহিত্য এবং বিভিন্ন সাহিত্যিকের জীবন নিয়ে আলোচনা করতেন। একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের কথা উঠলে উনি বললেন - বঙ্কিমচন্দ্র বড় অহঙ্কারী এবং দাম্ভিক ছিলেন। একদিন দীনেশ চন্দ্র সেন মশাই বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে গিয়েছেন বাংলা ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করতে। বঙ্কিমচন্দ্র তার সঙ্গে আজে-বাজে আলোচনা করে তাঁকে বিদায় দিয়েছিলেন। পরে যখন রবীন্দ্রনাথ

নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ছিলেন, সেই সময় দীনেশ সেন তাঁর বাড়িতে যান ও বাংলা ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে খুব যত্ন করেন ও সাহিত্য আলোচনা কালে বলেছিলেন - আপনি যদি বর্তমান বাংলা ভাষা সম্বন্ধে জানতে চান, তাহলে স্বামী বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইখানা পড়ে দেখবেন। অতি অদ্ভুত বই।

কথা প্রসঙ্গে একদিন বললেন, আমার শরীরে যদি জোর থাকত, তাহলে Oneness - a priory ও posterityআর protoplasm এবং growth of humanity সম্বন্ধে বই লিখতুম। তবে ওসব মুর্খের জন্য। তা না হলে কোন কিছুরই প্রয়োজন হয় না।

দিলীপ কুমার ঘোষ ঃ মাথার চুল সামান্য বড় হয়ে গেলেই জীবনকৃষ্ণ তা কাটবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পরতেন। একদিনের ঘটনা মনে পড়ছে। ওনার মাথায় প্রায় এক আঙ্গুল মত চুল হয়ে গেছে। ঘরে আমরা সবাই বসে আছি, পথে একজন নাপিত চলে যাচ্ছে। তাকে দেখে জীবনকৃষ্ণ চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন - ও পরামানিক, শোন শোন। কাল তোমার সময় হলে আসতে পারবে? পরামানিক হিন্দী ভাষী। সে বললে - কেন হোবে না বাবু? আপনি যোখন বুলবেন আসবো। পরামানিককে তিনি পরদিন ৭-৩০ মিনিটে আসতে বললেন। সে কিছুটা যেতেই, জীবনকৃষ্ণ সুশীলবাবুকে বললেন, হ্যাঁ সুশীলবাবু, আবার কালকের জন্য ফেলে রেখে কি হবে, আজই হোক না। সুশীলবাবু আনন্দিত হয়ে বললেন, তা হলেই ভাল, যা চুল হয়েছে। এই বলে তিনি নাপিতকে ডেকে আনলেন। জীবনকৃষ্ণ পাঠককে জোড় গলায় পাঠ করতে বলে বারান্দায় বসে চুল কাটলেন। চুল কাটার পর উনি একেবারে স্নান করে ঘরে ঢুকলেন। মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে ঘরে ঢুকছেন আর বলছেন - ওহ্, একটা বড় কাজ চুকলো। শালা রোজই ভাবি কাল কাটবো, কাল কাটবো, কিন্তু কাল আর হয়ে ওঠে না। এরপর সেক্সপিয়ারের লেখা ম্যাকবেথ নাটকের সেই বিখ্যাত উক্তিটি বলতে লাগলেন - Tomorrow and tomorrow and to-morrow creeps in this petty pace from day to day to the last

syllable of recorded time (Macbeth Act 5, Sec 5).

খুব মুগ্ধ ও আশ্চর্য হয়েছিলাম সেদিন তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি আর রসবোধ দেখে।

বরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ সত্যি কথা বলতে কি, জীবনকৃষ্ণকে আমরা সেভাবে কেউ চিনতে পারি নি। উনি নিজেই ধরা দিয়েছিলেন। ওনার একান্ত ইচ্ছা ছিল কয়েকজনকে নিয়ে আলাদা থাকেন। ১৯৬৬ সালে শারীরিক অসুস্থতার কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য জীবনকৃষ্ণ কিছুদিন মধুপুরে অবস্থান করেন। সেখানে তার সঙ্গে কিছুদিন কাটাবার পরম সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। ঐ সময়ের কিছু কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে ধীরেনদার কথা শুনে উনি বলেছিলেন, তোদের অনুভূতির কথা ছেপে বের হলে জগতের অশেষ কল্যাণ হবে। তোদের সব অনুভূতি আগে খাতায় যত্ন করে লিখে রাখবি। আজ থেকেই তোরা খাতা করবি। প্রত্যেকে পঞ্চাশটা করে অনুভূতি লিখে রাখবি।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুরের ঘরে ভাগবত পড়তে পড়তে অসুস্থতা বোধ করি। কাউকে কিছু না বলে ঘরে এসে শুয়ে পড়লুম। তিনি একথা জানতে পেরে ডাক্তার ডাকার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। পরদিন সকাল থেকে তিনি নিজে মাথার কাছে বসে মাথাটা তাঁর কোলে তুলে নিয়ে গায়ে মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন। আমি দু-তিন দিনে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলাম। ওষুধের দরকার হয় নি। সেই দিনের সেই স্নেহের পরশ আজও স্পষ্ট মনে আছে।

একদিন দুপুর বেলা উনি কদমতলায় আমার দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছেন। আমি ছুটে গিয়ে ওনার কাছে দাঁড়ালাম। উনি বললেন, আমার মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। ট্যাবলেট কিনতে হবে। আমি দোকান থেকে ট্যাবলেট কিনে এনে দিলুম। তাঁরও যে আমাদের মত মাথা ধরে, ট্যাবলেট খেতে হয় অথচ তিনি ভগবান, একথা ভাবতে ভাবতে আবার দোকানে বসলাম।

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ঃ কদমতলার ঘরের একদিনের একটা ঘটনা মনে পড়ছে। ইন্দ্রনাথ বাবু বাইরের খোলা বারান্দায় এসে বসলেন। শ্রী জীবনকৃষ্ণের সে দিকে দৃষ্টি পড়া মাত্র বলে উঠলেন - কে, ইন্দু নাকি রে? তা বাইরে বসলি

কেন বাবা ঘরে এত জায়গা থাকতে। ভিতরে এসে বোস।

প্রশ্নোত্তরের ভয়ে ছোকরাদের অনেকেই এরূপ করতেন।

ইন্দু - আজ্ঞে, এখানেই বসি।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ - কেন বাবা? এসো, বাবা এসো, ঘরে এসে বসো। ইন্দুবাবু ঘরে এসে বসলে পর জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা তোরা বেহুলা পড়েছিস?

কেউ কেউ বললেন, হ্যাঁ পড়েছি।

শ্রী জীবনকৃষ্ণ - তোদের মনে আছে? লখিন্দরকে ভেলায় ভাসিয়ে দিল, আর সেই ভেলায় বেহুলাও ভেসে চলেছে। ভেলা ভেসে চলেছে আর আশেপাশের গাঁয়ের লোকেরা কি বলেছিল মনে আছে?

ঘরের সকলেই চুপ করে বসে আছেন। এমনকি যাঁরা বলেছিলেন পড়েছি, তাঁরাও ভাবতে লাগলেন।

শ্রী জীবনকৃষ্ণ - তোদের মনে নেই? ওরে! তারা বলেছিল, নিছনী গাঁয়ের লোকেরা কি হৃদয়হীন! (ইন্দুর প্রতি) তা বাবা, তুই বাইরে বসেছিলি, কেউ দেখলে বলবে, ঘরে এত জায়গা, এ ভদ্রলোকটিকে ভিতরে বসতে দেয় নি, আহা! (সকলের উচ্চহাস্য)।

ইন্দু - (অপ্রতিভ হয়ে) আমি তো নিজের ইচ্ছায় বসেছিলাম।

শ্রী জীবনকৃষ্ণ - লোকে তো তা ভাববে না বাবা (সকলের হাস্য)। (পাঠকের উদ্দেশ্যে) নে, পড় বাবা, পড়।

মানিক ৫৯ সংখ্যা

ভূমিকা

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "মিছরীর রুটি সিধে করেই খাও আর আড় করেই খাও মিষ্টি লাগবে।" মিছরীর রুটি-সহস্রার। মিছরীর রুটি খাওয়া - সহস্রারে মন গিয়ে সমাধিতে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ। এ হল সিধে করে খাওয়া - ব্যষ্টির সাধন। আর, আড় করে খাওয়া - সমাধি দেহে absorb হয়ে (মিশে) যাবার পর বিশ্বব্যাপিত্বে অন্যের স্বপ্নে নিজের আত্মিক ঐশ্বর্যের কথা শুনে ভূমানন্দ উপভোগ করা।

সাধারণ মানুষও যখন আত্মিক একত্ববোধে অন্যের স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা শুনে নিজে স্বপ্ন দেখা ও তার ব্যাখ্যা শোনার সমান আনন্দ পান তখন তিনি আড় করে মিছরীর রুটি খেতে শেখেন। তিনি জানেন একজনের স্বপ্নে সকলের জন্য শিক্ষার বিষয় থাকে।

পাঠচক্রে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীজীবনকৃষ্ণের অমৃতবাণীর মর্মার্থ আলোচনা ও রসাস্বাদনও একভাবে মিছরীর রুটি খাওয়া। সেই সঙ্গে সেখানে বিভিন্ন মানুষের বিচিত্র স্বপ্ন দর্শনের ব্যাখ্যা ও আলোচনা হয়। যারা আড় করে মিছরীর রুটি খেতে চান তাদের জন্য এই পত্রিকায় পাঠচক্রে আলোচিত কিছু মানুষের স্বপ্নদর্শনের অভিনব ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হল। তার সাথে থাকল অমৃতপুরুষ শ্রীজীবনকৃষ্ণকে নিয়ে সঙ্গকারী কয়েকজনের টুকরো কিছু স্মৃতিকথা ও শ্রীজীবনকৃষ্ণ প্রদত্ত একত্বের আলোকে রামকৃষ্ণবাণীর কিছু ব্যাখ্যা। "পাঠপ্রসঙ্গ" অধ্যায়ে রামকৃষ্ণ ও জীবনকৃষ্ণের কিছু কথার নতুন আঙ্গিকে ব্যাখ্যা তুলে ধরা হল - আশা করি পাঠকদের ভাল লাগবে॥

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪২০।

প্রথম আলো

জ্যোতির্গময়

* স্বপ্নে দেখছি (১৬.০১.২০১৩) - নদীর ধারে গেছি। সেখানে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রচুর মাছ ধরেছেন। তিনি হঠাৎ আমাকে বললেন, তুমি এগুলো

নাও। ভদ্রলোকের আন্তরিকতাপূর্ণ কথা অগ্রাহ্য করতে পারলাম না। মাছগুলো বাড়িতে এনে চৌবাচ্চায় জল দিয়ে রাখলাম। পরদিন চৌবাচ্চায় জল কমে গেছে দেখে আবার জল ভরলাম। মাছগুলো দেখে খুব আনন্দ হচ্ছে। ... ঘুম ভাঙলে মনে পড়ল স্বপ্নে দেখা মানুষটি ঠিক জীবনকৃষ্ণের মত দেখতে যার ফটো আছে অমরেশ স্যারের বাড়িতে।

– সোহেল আখতার মোল্লা (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যা ঃ অনেক মাছ - আত্মিক অনুভূতি। মাছ দিলেন - শ্রীজীবনকৃষ্ণ আত্মিক অনুভূতি তথা ব্রহ্মবিদ্যা দান করতে পারেন। চৌবাচ্চায় জল দেওয়া - অনুশীলন।

*গত ডিসেম্বরে (২০১২) একদিন পাঠ শুনতে শুনতে হঠাৎ দর্শন হল - স্নেহময় মামা ও ভগবান জীবনকৃষ্ণ পাশাপাশি বসে আছেন। ওনারা দুজনই হাত মেলে ধরে প্রার্থনার ভঙ্গীতে আছেন। দুজনেরই হাত ঠেকাঠেকি করে আছে। সেখান থেকে একটি ছোট্ট নারী সৃষ্টি হল। সামনে বিরাট জ্যোতির্ময় এক গোলক রয়েছে। তার দিকে নারীটি এগিয়ে গেল। দর্শন মিলিয়ে গেল। সম্বিৎ ফিরে এল। এই প্রথম শ্রীজীবনকৃষ্ণ আমায় দেখা দিলেন। জীবনকৃষ্ণকে দেখলে যে কী তীব্র আনন্দ হয় তা অনুভব করলাম।

- পার্থ দাস (কড়িধ্যা, সিউড়ী)।

ব্যাখ্যা ঃ পাঠকের দেহে শ্রীজীবনকৃষ্ণ তথা সমষ্টিচৈতন্য ক্রিয়া করে ও একজন নারী অর্থাৎ একদল মানুষের ছোট্ট একটি জগৎকে জ্যোতির্লোকে (জ্ঞানের জগতে) পৌঁছে দেন॥

পরমগতি পরমপিতা

* গত ৫.১.২০১৩ তারিখ সন্ধ্যায় আমার বিশিষ্ট প্রতিবেশী শ্রীমতী সন্ধ্যা রুদ্র স্থায়ীভাবে জীবনকৃষ্ণলোকে যাত্রা করেন। আমি ওনাদের ঠিক পাশের বাড়িতে থাকি। ঐ সময় আমি বাড়ির সামনে রাস্তায় পায়চারী করতে করতে স্থূলে স্পষ্ট দেখলাম - সন্ধ্যাদি বলছেন, দাদা আমি যাচ্ছি, আপনাদের নিতুদাকে দেখবেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাবেন? সন্ধ্যাদি উত্তরে বললেন, ঠাকুর জীবনকৃষ্ণের কাছে। দূরে আকাশের গায়ে জীবনকৃষ্ণের আউটলাইন (outline) দেখা গেল। আমি বললাম, কী করে যাবেন? উনি বললেন, রথে

চড়ে। সত্যি সত্যিই সোনার রথ এল। তাতে চড়ে উনি আকাশের গায়ে জীবনকৃষ্ণের ঐ আউটলাইন-এর ভিতর ঢুকে গেলেন। দর্শন মিলিয়ে গেল। আমি চমকে উঠলাম। জীবনে এমন অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয় নি॥

- শনৎ চক্রবর্তী (স্কুলবাগান, বোলপুর)।

* স্বপ্নে দেখছি - বাবা ও আর একজন ভদ্রলোক ছিপ দিয়ে পুকুরে মাছ ধরছে। বাবা একটাও মাছ পাচ্ছেন না, অথচ ঐ ভদ্রলোক প্রচুর মাছ ধরলেন। বাবাকে বলছি, ও বাবা তুমি কেন মাছ ধরতে পারছ না? উনি তো পুকুরের সব মাছ ধরে নিচ্ছেন! ... ঘুম ভাঙল। পরে ঘটনাচক্রে আমার হাতে ''ধর্ম ও অনুভূতি'' বই এসে পড়ল। জীবনকৃষ্ণের বিষয়ে শুনলাম। ওনার ফটো দেখে বুঝলাম আমি স্বপ্নে জীবনকৃষ্ণকেই দেখেছি যিনি পুকুরের সব মাছ ধরে নিলেন।

– মাধুরী সোম (শান্তিনিকেতন)।

ব্যাখ্যা ঃ চৈতন্যের উৎসপুরুষ পিতা নন, পরমপিতা - শ্রী জীবনকৃষ্ণ॥ তাই দেহস্থ চৈতন্য তাঁরই আয়ত্তাধীন॥

* দেখছি (২৫.৪.২০১৩) - আমরা কয়েকজন মহিলা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। সামনে একটা নদী। আমাদের সামনে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার মুখমণ্ডল পুরুষের। অমরেশ বাবুর বাড়িতে জীবনকৃষ্ণের যে ফটো আছে সেইরূপ দেখতে। তিনি আমাদের বললেন, আমাকে এখন এই নদী পেরিয়ে যেতে হবে। এই বলে তিনি নদীর জলে নেমে হাঁটতে শুরু করলেন। এই দৃশ্য দেখতে দেখতে ঘুম ভাঙল।

- অর্চনা দাস বৈরাগ্য (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্ধনারীশ্বর রূপে প্রথমেই দর্শন হওয়ার ফলে জীবনকৃষ্ণের সর্বজনীন সত্তার পরিচয় পেল দ্রষ্টা। সেই সঙ্গে নিজের পরিচয় লাভের যাত্রাও শুরু হল।

স্বপন মাধুরী

নতুন রূপে

* গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ২০১৩, স্বপ্নে দেখছি - প্রভাতের স্নিগ্ধ সূর্য উঠছে পূর্ব আকাশে। জয় (চ্যাটার্জী) আধশোয়া অবস্থায় সেই সূর্যের দিকে চেয়ে আছে। আমি পাশে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে সেই অনুপম দৃশ্য দেখছি। একবার জয়ের দিকে আর একবার সূর্যের দিকে তাকাচ্ছি। মনে হচ্ছে জয়-ই প্রথম মানুষ যে এই সূর্য ওঠা দেখছে।

- বরুন ব্যানার্জী (বোলপুর)।

ব্যাখ্যা ঃ নতুন সূর্যের (একত্বের) স্নিগ্ধতা গায়ে মাখার অপেক্ষায় আমরা সকলে।

* দেখছি (১০.০৩.১৩) - শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে গিরীশ ঘোষের বাড়ি যাচ্ছি। রামকৃষ্ণকে দেখে গিরীশবাবু ছুটে পালাচ্ছেন। ঠাকুর দৌড়ে গিয়ে ওনাকে জাপটে ধরলেন। ... ঘুম ভাঙলে বুঝলাম, মানুষ ভগবানকে চায় না, ভগবান জোর করে মানুষকে তাঁর দিকে টেনে নেন।

- জয় দাস বৈরাগ্য (ইলামবাজার)।

উৎসর্গ

* দেখছি (১০.০৪.১৩) - পাঠের বিরোধী গ্রামের কিছু মানুষের সাথে আমার তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে। ওদের মধ্যে একজন হঠাৎ বলে উঠল, তোর যদি জীবনকৃষ্ণের প্রতি এত ভালোবাসা তাহলে পারবি জীবনকৃষ্ণের নামে তোর জীভটাকে কেটে উৎসর্গ করতে ? আমি কথাটা শোনামাত্র একটা ধারালো অস্ত্র দিয়ে জীভটা কেটে তার হাতে দিয়ে বললাম, এই নাও। এবার বুঝলে?

- দীপঙ্কর বারিক (সুলতানপুর)।

ব্যাখ্যা ঃ ১) দ্রষ্টার বিবেক লাভ হয়েছে। ২) দ্রষ্টার জীবনে জীবনকৃষ্ণের মহিমা বিশেষভাবে প্রকাশ পাবে, মুখে বলে বোঝাতে হবে না।

* স্বপ্নে দেখছি (২৯শে ডিসেম্বর ২০১২) - আমার সামনে খুব সুন্দর

মোটাসোটা একটা বাচ্চা ছেলে শোয়ানো রয়েছে। যদিও আমি যথেষ্ট বুড়ি হয়ে গেছি তবুও মনে হচ্ছে ঐ শিশুটি আমারই সন্তান। বাচ্চাটির পাশেই বসে রয়েছেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। তিনি বললেন, তুমি কি চিনতে পারছ যে এটা তোমার ছেলে? আমি বললাম, হ্যাঁ পারছি। শুনে উনি খুব খুশি হলেন। ... ঘুম ভাঙল।

- সাধনা গায়েন (সুলতানপুর)।

ব্যাখ্যা ঃ সন্তান - আত্মাসন্তান। জীবনকৃষ্ণ - পরমাত্মা। আত্মা সাক্ষাৎকারের পর আত্মার সাধনের বা বেদান্তের সাধনের পর পরমাত্মার অনুভূতি হয়। কিন্তু এ যুগে উল্টো ধারা - ''লাউ কুমড়োর আগে ফল তারপর ফুল।''

পাঠে যেও

* সেদিন (৩.১২.২০১২) রেগে গিয়ে ছেলেকে খুব মেরেছি। রাত্রে স্বপ্ন দেখছি - ননদ বলছে, তুমি পাঠে চল, তাহলে এত রাগ থাকবে না, অশান্তি থাকবে না। আমি মনে মনে ভাবছি তাই আবার হয় নাকি? তখন দেখি ঘরের ভিতর একটা টুলের উপর বসে রয়েছেন জীবনকৃষ্ণ। তিনি আমাকে বললেন, পাঠে চল। পাঠে গেলে তোর ভাল হবে। এই বলে হঠাৎ আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে লাগলেন পাশের ঘরে যেখানে পাঠ হচ্ছিল। স্বপ্ন ভাঙল। পরে দেখছি - স্বপ্নটা স্বামীকে বলছি। বললাম, কী অদ্ভুত স্বপ্ন বলতো! আচ্ছা এটা আবার হয় নাকি? পাঠ শুনলে রাগ কমে যাবে, দুশ্চিন্তা কমবে, শান্তি পাওয়া যাবে! স্বামী বলল, স্বপ্নে স্বয়ং জীবনকৃষ্ণ যখন বলেছেন, তখন তুমি তাই-ই কর। দ্যাখো আমি তো জীবনকৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখেছিলাম, তাই কী ছিলাম আর কী হয়েছি। আমার অনেক উন্নতি হয়েছে। পাঠে নিয়মিত গেলে আমার আরও উন্নতি হ'ত। তোমার ভাই-ও পাঠে গিয়ে জীবনকৃষ্ণকে দেখেছিল। ওরও কত পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু পাঠে যাওয়া পরে ছেড়ে দিল। না হলে আরও উন্নতি হ'ত। তোমার সুযোগ আছে। পাশের বাড়িতেই পাঠ হয়। তুমি যেও। তোমার ভাল হবে। ... ঘুম ভাঙল। বুঝলাম স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন দেখছিলাম।

- পিউ মুখার্জী (ইলামবাজার)।

জুতো পায়ে

মার্চের প্রথম সপ্তাহে (২০১৩) এক স্বপ্নে দেখছি - একজোড়া সুন্দর জুতো। মনে হচ্ছে জীবনকৃষ্ণের জুতো। নাতনী বলল, তুমি জীবনকৃষ্ণের জুতোয় পা গলাচ্ছ কেন? বললাম, তাতে কী হয়েছে? এরপর জুতো জোড়া মাথায় তুলে নিলাম। খুব আনন্দ হচ্ছে। ... ঘুম ভাঙল।

- কল্পনা ব্যানার্জী (শিমূরালী, নদীয়া)।

ব্যাখ্যা ঃ জীবনকৃষ্ণ যে আপনার জন সেকথা ধারণা হয়েছে। জীবনকৃষ্ণের সত্তা লাভে (পায়ে জীবনকৃষ্ণের জুতো পরে) ও তাঁর বাণী মাথায় ধারণা করে নিশ্চিন্তে নির্লিপ্ত হয়ে সংসারের কাঁটাবন হেঁটে পার হবেন দ্রষ্টা॥

সাদা কাগজ

* ২৮/০৩/১৩ তারিখে স্বপ্ন দেখছি - আমি সাইকেল নিয়ে চেক পোস্টের পাশে দোতলা এক বাড়িতে কোন কাজে গিয়েছি। সেখানকার কাজ সেরে সাইকেল নিয়ে বাড়ি এসে স্কুলে যাব। কাজ সেরে বাড়ি না এসে উল্টো দিকে ব্রীজ পার হয়ে গিয়ে খেয়াল হল আমি তো বাড়ি যাব। তখন ছুটতে ছুটতে আগের জায়গায় এসে দেখি সাইকেল নেই। একজন বয়স্ক লোক বসে আছে ধুতি ও গেঞ্জি পরে। আমি ভাবছি ওনাকে আমার সাইকেলের কথা জিজ্ঞাসা করব। তার আগেই উনি বললেন, তোর সাইকেলটা সারাতে দিয়েছি। সব ত্রুটি ঠিক করে দেবে। ভাবছি, আমার সাইকেলে তো কোন ত্রুটি ছিল না। যাই হোক, দোকানে গিয়ে দেখি সাইকেলটা ঠিক করা হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কত দেব? ও বলল, ১৩ টাকা। আমি ব্যাগ থেকে টাকা বার করছি। টাকার পরিবর্তে শুধু সাদা কাগজ বেরোচ্ছে। ঐ এক টুকরো কাগজ ওকে দিলাম। ও বলল, ঠিক আছে। ... ঘুম ভাঙার পর বুঝতে পারলাম, স্বপ্নে দেখা ঐ বয়স্ক লোকটি জীবনকৃষ্ণ। মনটা আনন্দে ভরে গেল॥

- সুনন্দা বিশ্বাস (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যা ঃ সাদা কাগজ - সংস্কার মুক্ত মন। সাইকেল ঠিক করা – দেহ যোগোপযোগী করে দেওয়া যাতে আত্মিক অগ্রগতি ব্যাহত না হয়॥

* দেখছি (২১.০২.১৩) - ভাগ্নে স্কুটারের উপর চেপে খুব লাফালাফি করছে। চিন্তায় পড়লাম। কথা শুনছে না। হঠাৎ আমি চুপ করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ও এবার শান্ত হয়ে গেল। স্কুটার থেকে নেমে চুপ করে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখতে থাকল। তখন দেখি আমার মুখটা জীবনকৃষ্ণের মুখ হয়ে গেছে। বুঝলাম, এ জন্যই ও শান্ত হয়ে গেছে॥

- শুভাশিষ দাস (বোলপুর)।

ব্যাখ্যা ঃ অন্তরে ব্রহ্মের রূপ দর্শনে মানুষ ধীর হয় - বেদ।

মঙ্গলময়

* গত ডিসেম্বর ২০১২, এক রাত্রে স্বপ্নে দেখছি - কালীতলায় গেছি। মা কালীকে দেখছি জীবন্ত ছোট একটা মেয়ের বেশে। গায়ের রঙ কালো। মা- -কে হাতজোড় করে বললাম, মা, আমার ছেলে খুব চঞ্চল হয়ে যাচ্ছে, ওকে একটু শান্ত করে দাও। অমনি দেখি মা নেই - সেই জায়গায় শ্রীজীবনকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন। উনি হাতটা বাড়িয়ে দিলেন - এত লম্বা হাত যে তা মন্দিরের বাইরে আমার ছেলের মাথায় ঠেকল। উনি আশীর্বাদ করলেন। ... ঘুম ভাঙল।

- শিখা চ্যাটার্জী (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যা ঃ দ্রষ্টা ভেবেছিলেন শ্বশুরবাড়ি থেকে কালীপূজা তুলে দেওয়া হয়েছে ও জীবনকৃষ্ণের কথা পাঠ শুরু হয়েছে - এর জন্য বোধহয় ছেলের ক্ষতি হচ্ছে, ও এত চঞ্চল হয়ে উঠছে। এই স্বপ্ন জানালো মঙ্গল করার ক্ষমতা আছে মানুষ ভগবানেরই॥

* স্বপ্নে দেখছি (২৫.১২.২০১২) - বেলেঘাটা মহাসম্মেলনে গেছি। প্যাণ্ডেলের ভিতর বহু লোক। মঞ্চের দিকে শ্রীজীবনকৃষ্ণ ও স্নেহময়দা গল্প করতে করতে এগিয়ে চলেছে। শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, সমরেশকে বলবি জ্ঞানের দরকার নেই। আমার মনে হল বলতে চাইছেন বিচারজ্ঞানের দরকার নেই। অনুভূতি ও উপলব্ধি দরকার। অমনি আমার বমি হল। কালো কালো কী সব বেরোল। ঘুম ভাঙল।... - সমরেশ চ্যাটার্জী (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যা ঃ ধর্ম অনুভূতিমূলক, বিচারাত্মক জ্ঞান নয়। এই স্বপ্নে দ্রষ্টার তর্কের মানসিকতা কাটল, দেহ গ্লানিমুক্ত হল।

দেখছি (১০.০২.১৩) - উত্তর আকাশে বিরাট এক জীবনকৃষ্ণের ছবি। ত্রিমাত্রিক। তাই জীবন্ত মনে হচ্ছে। ছোটমামাকে ঘর থেকে টেনে বের করে দৃশ্যটা দেখালাম।

ব্যাখ্যা ঃ শ্রীজীবনকৃষ্ণ জীবনের ধ্রুবতারা। - চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী (বোলপুর)।

আগুন লেগেছে কোথা

* গত ১০ই ফেব্রুয়ারী ২০১৩ রাত্রে স্বপ্ন দেখছি - (১) চারদিক দাউ দাউ করে জ্বলছে। আমাদের বাড়িতেও আগুন লেগে গেছে। দেখছি বাড়িতে যত ধর্মগ্রন্থ ছিল যেমন গীতা, ভাগবত, মায়াপুর থেকে আনা বইপত্র সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ...

এর পরদিন আবার স্বপ্ন দেখছি - আমার বাবার বাড়ি মহুলার দীনবন্ধুদের বাড়িতে আগুন লেগেছে। আমি চিৎকার করছি। দেখছি বাছুর সহ একটা গাই গরু পুড়ে মরে গেল। ... - জয়া বারিক (সুলতানপুর)।

ব্যাখ্যা ঃ প্রথম স্বপ্নে দেখালো শাস্ত্রীয় সংস্কার ভিতর থেকে পুড়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় স্বপ্নে দ্রষ্টার ভক্তির সংস্কার, অবতারত্বের সংস্কারও উচ্ছেদ হল। এবার ব্রহ্মজ্ঞানের ধারণা হবে॥

* স্বপ্ন দেখছি (২৫.১২.২০১২) - একটা মৃতদেহ নিয়ে হরিনামের দল যাচ্ছে আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে। আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকাতেই দেখছি শবাধার থেকে উঠে বসল একজন মানুষ। ভালো করে তাকিয়ে দেখি উনি শ্রীজীবনকৃষ্ণ। আমার দিকে তাকিয়ে বলছেন, "তোর অহংকার মারা গেল।" ...

ব্যাখ্যা ঃ দ্রষ্টার সত্তা জীবনকৃষ্ণে পরিবর্তিত হল, তাই অহং থাকল না।

- পিউ মুখার্জী (ইলামবাজার)।

* দেখছি (৩০.১২.১২) - একটা ঘরে বেশ ভীড়। জীবনকৃষ্ণ শুয়ে আছেন। যেন মারা গেছেন। কে যেন বললেন, জীবনকৃষ্ণ ফিনিশ। অমনি উনি

উঠে বসে বললেন, কে বললি রে! একজন ওনার সামনে মাইক্রোফোন এগিয়ে দিল। উনি পাঠ করতে শুরু করলেন। ... - হারাধন মণ্ডল (বেহালা)।

মানুষ সত্য

* স্বপ্নে দেখছি (১৭.০৪.২০১৩) - জীবনকৃষ্ণ হেঁটে চলেছেন। তাঁর পায়ে ঘুঙুর বাঁধা। উনি যাচ্ছেন আর প্রতিটি পদক্ষেপে একটা করে ঘুঙুর ছেড়ে পড়ছে। ঘুঙুরটা সঙ্গে সঙ্গে একটা মানুষে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। ...

- প্রকৃতি ব্যানার্জী (গড়গড়িয়া)।

ব্যাখ্যা ঃ আত্মিকে তাঁর এগিয়ে চলার প্রতিটি পদক্ষেপ ঝঙ্কৃত হয়েছে বিশেষ দর্শনে। আর প্রতিটি দর্শনে একজন মানুষের রূপ ফুটে উঠেছে। (বিবেকানন্দ, শ্রীম, কৃষ্ণময়ী, সারদাদেবী, বাবু, মানুষরতন, জওহরলাল, অনাথবন্ধু, অনিল, মনীন্দ্র, আনন্দ, অমর, অভয়, জীতেন্দ্র, অতীন্দ্র, দক্ষিণা ইত্যাদি) তাঁর জীবনে মানুষকে নিয়েই সব, মানুষের জন্যই সব।

* গত ১২-১২-২০১২ তারিখ রাত্রে স্বপ্নে দেখলাম - একটা গুহার মুখে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ সামনে একটা ভূত এসে দাঁড়ালো। বিকট চেহারা। খাড়া চুল, মাথায় দুটো শিং। দাঁত বের করা। ভয় পেয়ে গেলাম। পকেটে জীবনকৃষ্ণের ফটো ছিল। মনে হল ওটা দেখালে ভুত পালাবে। তাই ফটো বের করে ওর দিকে ফটোটা তুলে ধরলাম। অমনি ভুতটা একজন সুন্দর মানুষ হয়ে গেল। ... - সাগর ব্যানার্জী (বোলপুর)।

ব্যাখ্যা ঃ রাম নামে ভুত পালায়। জীবনকৃষ্ণের রূপ দর্শনে পঞ্চভূতে গঠিত দেহের দেহজ্ঞান দূরে যায়। মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠে।

* দেখছি - সূর্য থেকে আগুনের ফুলকি ঝরে পড়ছে। আমি রকেট ও শেল দিয়ে ওগুলো ফাটাচ্ছি। তখন তা কাগজ হয়ে ঝরে পড়ছে। ... খুব আনন্দ হচ্ছে। - ইন্দ্রায়ুধ সাহা (কাষ্ঠডাঙা)।

ব্যাখ্যা ঃ সূর্য - এক। ফুলকি - একত্ব। একত্বের রহস্য ভেদ করতে চাইছেন

দ্রষ্টা। পাঠের উদ্দেশ্যও তাই।

নব পরিচয়

* ফেব্রুয়ারী ২০১৩, এক রাত্রে স্বপ্নে দেখছি - একজন বিবাহিত মহিলা ও একজন বৃদ্ধ লোকের সাথে ভগবানের কাছে যাচ্ছি। একটা একতলা পাকা বাড়িতে ঢুকলাম। উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত একটা ঘরে ঢুকেই ভগবানের দেখা পেলাম। তিনি মধ্যবয়সী শ্যামবর্ণ এক ভদ্রলোক। দু'জনে খুব গল্প করছি আর তীব্র আনন্দ হচ্ছে। ঘরে ঢোকার পর পূর্বের ঐ মহিলা ও বৃদ্ধকে আর দেখিনি। স্বপ্ন ভাঙল। এবার দেখছি - তরুনদার পাশে শুয়ে আছি। ঐ স্বপ্নটা নিয়ে কথা হচ্ছে। ব্যাখ্যায় বললাম, বৃদ্ধ মানুষটি নির্গুণ ব্রহ্ম। যুবতী মহিলাটি আদ্যাশক্তি। এদের সাহায্যে মন উচ্চভূমিতে উঠে মানব ব্রহ্মের দর্শন হল। কথা হল অর্থাৎ বিজ্ঞানীর অবস্থা লাভ হল। ... এবার সত্যি সত্যিই ঘুম ভাঙল। - রুদ্রনাথ দত্ত (গড়গড়িয়া)

* আজ সন্ধ্যায় (১৭.১১.২০১২) - পাঠ শুনতে শুনতে হঠাৎ দর্শন হল - শ্রীজীবনকৃষ্ণ শ্রোতাদের মধ্যে বসে আছেন। উনি হঠাৎ উঠে গিয়ে বাঁ হাতের নখ দিয়ে পাঠক স্নেহময় জেঠুর জিভে "একত্ব" কথাটা লিখে দিলেন।

-প্রকৃতি ব্যানার্জী (গড়গড়িয়া)।

ব্যাখ্যাঃ একত্ব সম্বন্ধে বলার অধিকার দান করলেন।

হাভানা

* এপ্রিল ২৫, ২০১৩, আজ সকালে একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙল। দেখছি - জীবনকৃষ্ণ আমাকে বলছেন, তোকে একটা বাড়ি করতে হবে। আমি বললাম, এই তো একটা বাড়ি করলাম, আর আমি পারবো না। উনি জোর দিয়ে বললেন, না, আবার একটা বাড়ি করতে হবে। এই বলে একটা বাড়ির মডেল ডান হাতে করে দেখালেন। ... ঘুম ভাঙল। খুব আনন্দ হল। ছুটে স্নেহময় স্যারের কাছে গেলাম স্বপ্নটা বলতে। উনি তখন চা খাচ্ছিলেন। আমাকে

দুটো বিস্কুট খেতে দিলেন। আমিও তখন স্যারকে হাভানা বিস্কুট একটা দিলাম (জীবনকৃষ্ণ আমাকে কতকগুলো দিয়েছিলেন)। উনি জিজ্ঞাসা করলেন, বল্‌তো হাভানা মানে কী? বললাম, একটা দেশের নাম। উনি বললেন, না, একটা দ্বীপপুঞ্জ। এবার ওনাকে আমার স্বপ্নটা বলায় উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোর স্বপ্নে বাড়ি মানে কী? হাভানা দ্বীপপুঞ্জ আর বাড়ি এসব মিলে আমার মনে হল, পাঠচক্র। ... এইবার সত্যি সত্যি ঘুম ভাঙল।

- শোভন ধীবর (অবিনাশপুর)।

ব্যাখ্যা ঃ স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন - তূরীয় অবস্থা। সেখানে বাড়ি করা - অর্থাৎ তূরীয় অবস্থায় মনের স্থিতিলাভ। হাভানা বিস্কুট অর্থাৎ পাঠচক্রের দর্শন ও অনুভূতি এতে সাহায্য করবে।

* দেখছি - গড়গড়িয়ায় পাঠ হচ্ছে। অনেক লোক শুনছে। পাঠক স্নেহময় কাকার পাশে স্বয়ং জীবনকৃষ্ণ বসে রয়েছেন। কিন্তু অদ্ভুত তাঁর দেহ। মাথা একটি কিন্তু পাঁচটি সরু সরু ধড়। মাথাটা কাৎ করে আছেন পাঠকের দিকে। ..

- সবিতা ঘোষ (চারুপল্লী)।

ব্যাখ্যা ঃ শ্রীজীবনকৃষ্ণ আত্মিকে এক কিন্তু ব্যবহারিকে বহু।

আম গাছেতে জাম

* দেখছি (৩০.১১.১২) - আম গাছে থোকা থোকা জাম ধরে রয়েছে। একটা লগা নিয়ে আমি আম বাগানে জাম পাড়ছি। হঠাৎ একজন এসে ধমকে বলে উঠল লগাটা দাও। ওটা বিশ্বভারতীর। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ তো তোমাদের একটা লগা দিয়েছে। সেটা দিয়ে পাড়। লগাটা নিয়ে নিল। তখন মনে হচ্ছে যে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ আমাদের পাঠচক্রকে একটা লগা দিয়েছে।

পরের দৃশ্যে দেখছি, ঐ বাগানে একটা পুকুর পাড়ে বসে আছি - জল কানায় কানায় পূর্ণ। জলে ভাসছে একটা থালা। তাতে ভাত তরকারী সব দেওয়া। আমি পাড়ে বসে খাচ্ছি। থালাটা স্থির হয়ে আছে। বিশেষভাবে খাচ্ছি জামের আচার। ... ঘুম ভাঙল।

– দেবরঞ্জন চ্যাটার্জী (চারুপল্লী)।

ব্যাখ্যা ঃ বিশ্বভারতী - যত্র বিশ্বম্‌ ভবতি এক নীড়ম্‌। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ - বিশ্বমানব শ্রীজীবনকৃষ্ণ, যিনি সকলকে এক করেন। তিনি ''মাণিক্য'' পত্রিকারূপ লগা নিয়ে নিলেন এখান থেকে। আমাদের এখানে তিনি কৃপা করে ''মানিক'' পত্রিকা রূপ লগা দিয়েছেন। তাকে ভিত্তি করে (অবলম্বন করে) ঈশ্বরীয় চর্চার মাধ্যমে দর্শন-অনুভূতিগুলির একত্বের নিরিখে সম্যক রসাস্বাদন (আচার খাওয়া) সম্ভব।

* দেখছি (০৭.০৯.১২) - বাড়ির দোতলায় শুয়ে আছি। রাত্রি বেলা। হঠাৎ দেখছি একজন লোক বাইরে থেকে জানলার রড ধরে বলল, আমি কি খুন করেছি? কথাটা শুনে আমি ভয়ে চিৎকার করে মেয়েকে ডাকতে লাগলাম। চিৎকার শুনে লোকটা পালাল। তখন দেখছি বাইরে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। সেই ভীড়ের মধ্যে এগিয়ে আসছেন আমাদের জীবনকৃষ্ণ। তিনি চিৎকার করে সবাইকে বলছেন, কীসের ভয়? আমি আছি না? ... ঘুম ভাঙল।

- বাসন্তী চ্যাটার্জী (সুলতানপুর)।

নতুন ধারা

* স্বপ্নে দেখছি (২৩/০১/২০১৩) - এক জায়গায় অনেকে বসে পাঠ শুনছি। ছোটমামা বলল, তুমি এক কাজ কর, এক্ষুণি এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে একটা জিনিস নিয়ে এসো। আমি বললাম, পাঠের পর যাব। মামা বলল, না। এক্ষুণি যাও। আমি যাচ্ছি - সঙ্গে ইতিও যাচ্ছে। একটি মুসলমান ভদ্রলোকের কাছে গেলাম। উনি আমাকে কিভাবে পাঠ করতে হবে সে বিষয়ে অনেক কথা বললেন। তারপর যখন ফিরছি তখন মনে হ'ল কোন জিনিস মামা নিতে বলেছিল তা তো নেওয়া হল না। যাইহোক, তখন আবার ইতি-কে দেখছি সাথে রয়েছে। পাঠের জায়গায় ফিরে এসে মামাকে ও অন্যান্যদের কাছে পাঠ বিষয়ে ঐ ভদ্রলোক যা বলেছিলেন তা সবই বললাম। ...

– জয়কৃষ্ণ চ্যাটার্জী (জামবুনি, বোলপুর)।

ব্যাখ্যা ঃ দ্রষ্টা নির্গুণ থেকে নতুন জ্ঞান লাভ করে অন্যান্যদের শোনাবে আর এর

ফলে পাঠের আলোচনার ধারা বদলে যাবে॥

* স্বপ্ন দেখছি (জানুয়ারী ২০১৩) - কাগজে লিখেছিল আজ চাঁদ ও সূর্যকে একসাথে আকাশে দেখা যাবে। তাই আকাশে ভালো করে তাকালাম। সঙ্গে ক্যামেরা আছে। দেখি চাঁদ উঠল। একটু পরে চাঁদটা সূর্যের মত আলো বিকিরণ করতে লাগল। মনে হল ওকে আর চাঁদ বলা ঠিক নয়, ওটা সূর্যই হয়ে গেছে। হঠাৎ পাশে নজর পড়তেই দেখি আর একটা সূর্য রয়েছে। ওটা কখন উঠল খেয়াল করিনি। মনে হচ্ছে ওখানে প্রথম থেকেই ছিল। খুব আনন্দ হল। ... ঘুম ভাঙল।

- চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী (জামবুনি, বোলপুর)।

ব্যাখ্যা ঃ কেউ ভক্ত থেকে ভগবানে পরিবর্তিত হয়, কেউ বা প্রথম থেকেই ভগবান॥

নবীনা

সরস্বতী পুজো

* স্বপ্নে দেখছি (১৯.০২.২০১৩) - স্কুলে সরস্বতী পুজো হবে। প্রচুর ছাত্র এসেছে। হাতে একটা খড়্গ নিয়ে ওদের দেখিয়ে বলছি, এটা কী? ওরা বলল, খড়্গ। আমি বললাম, এটা জ্ঞান খড়্গ। এবার হেড স্যার বললেন, আপনি বলিদান করুন। ছাত্ররা একটা কালো পাঁঠা আনলো। অন্য শিক্ষকদের দেখতে পাচ্ছি না। আমাকেই বলি করতে হবে। পাঁঠার গলায় আবার লোহার শিকল। শিকল সমেত এক কোপে কেটে ফেললাম। কিন্তু একটুখানি যেন পেরোয় নি। সেটা ঘষে ঘষে কেটে দিলাম। ওদের বললাম, দু'চোট হয়ে গেল, কাউকে বলিস না যেন। ঘড়িতে দেখি চারটে বেজে কুড়ি মিনিট হয়েছে। ভাবছি এত বেলা হল - ছেলেরা খাবে কখন ? . . . .

– স্নেহময় গাঙ্গুলী (চারুপল্লী, বোলপুর)।

ব্যাখ্যা ঃ শিকল সমেত ছাগল ঘষে ঘষে কাটা - অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যষ্টির সাধনের সংস্কার নাশ হল। 'কালো পাঁঠা একটুও খুঁত থাকলে মায়ের বলিতে

লাগে না' - এসব ব্যষ্টির সাধনের কথা। বেলা হল মানে সময় হল। ৪টে ২০মি. - এই সময় ঘড়ির ছোট কাঁটা ও বড় কাঁটা এক জায়গায় থাকে - অর্থাৎ আত্মিক একত্ব উপলব্ধির সময় হয়েছে। সরস্বতী পুজো - ব্রহ্মবিদ্যা তথা ব্রহ্মজ্ঞানের আরাধনা। ব্রহ্মজ্ঞান মানে একজ্ঞান। এতদিনে সাধারণ মানুষও প্রকৃত সরস্বতী পূজায় সামিল হবে॥

* দেখছি (০৯.০৩.১৩) - ব্রেনটা যেন একটা ঘর। সেই ঘরে আমি আছি। দরজা জানলা নেই - হঠাৎ এক ঝাড়ুদার ঢুকল। ঐ পরিষ্কার ঘর ঝাঁট দিয়ে অনেক ধূলো বের করে নিয়ে চলে গেল। আগে কোন ধুলো আমার চোখে পড়ে নি। লোকটি কোন দিক দিয়ে এল আর গেল তা ভেবেও অবাক হচ্ছি॥

- নন্দন দাস (গড়গড়িয়া)।

ব্যাখ্যা ঃ ঝাড়ুদার - ভগবান। ধূলো - সংস্কার॥

অমৃত লোক

*দেখছি (২২.০২.২০১৩) - একটা বাবলা গাছে বাজ পড়ল। বিদ্যুৎ রেখা জীবনকৃষ্ণের আউট লাইন (outline) হয়ে গেল পরে তা ঘনীভূত হয়ে জীবনকৃষ্ণের রূপ নিল। ন্যাড়া মাথা পাঞ্জাবী পরে উনি ঐ গাছেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমি বললাম, প্রভু আমাকে অমৃতলোকে নিয়ে চলুন। অমনি উনি পাঁচ জন হয়ে (পাঁচজনই জীবনকৃষ্ণ) আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন। তারপর দেখি অসংখ্য মানুষ - গ্রামের সব পরিচিত সাধারণ মানুষদের দেখছি - বোধ হচ্ছে এরা সকলেই জীবনকৃষ্ণ। ... ঘুম ভাঙল।

- সমরেশ চ্যাটার্জী (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যা ঃ শ্রীজীবনকৃষ্ণই মনুষ্যজাতি হয়েছেন - সর্ব সাধারণের মধ্যে অমৃতপুরুষ জীবনকৃষ্ণকে অনুভবই অমৃতলোকে উত্তরণ॥

ডাক্তারবেশী শত্রু

* স্বপ্নে দেখছি (০১.০২.২০১৩) - একটা বড় হাসপাতালে ঢুকে

গেছি। হঠাৎ দেখি একটা বাঘ একটা মেয়েকে কামড়াতে আসছে। ওকে বাঁচাতে ঠেলে সরিয়ে দিলাম। অমনি বাঘটা আমাকে আক্রমন করল। সর্বশক্তি দিয়ে এক ঘুসি মারতেই ও মারা পড়ল। এবার দেখি অনেক বাঘ। বুঝতে পারলাম হাসপাতালের প্রধান ডাক্তার বদমাইশ। ও খাঁচা খুলে বাঘ ছেড়ে দিচ্ছে আমাকে মারার জন্য। কী করি! তিনজন পুলিশ আমাকে হেল্প (help) করছিল। তাদেরকেও ঐ ডাক্তার মেরে ফেলল। তারপর ওখানটায় মুহূর্তে জঙ্গলের মত পরিবেশও সৃষ্টি করল। এতে আরও বিপদ হল। কখন কোন দিক থেকে বাঘ অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার উপর তা টের পাব না। মারা পড়ব। উপর দিকে তাকাতেই দেখি ছাদ ফুটো হয়ে সূর্য দেখা যাচ্ছে। তার আলো গায়ে পড়তেই শক্তি পেলাম প্রচণ্ড। তখন জোরে ফুঁ দিতেই গাছপালা সমেত এগিয়ে আসা বাঘগুলো সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এরপর ডাক্তারকে আঘাত করলাম। কিন্তু মরল না। ভাবছি সূর্যটা কিছুক্ষণের মধ্যে অস্ত যাবে। এর মধ্যেই কিছু একটা ব্যবস্থা করে ডাক্তারটাকে মারতে হবে। হঠাৎ দাদাকে দেখতে পেলাম। বললাম, যা হোক একটা অস্ত্র দে। ও একটা ছুরি দিল। সেটা নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে একটা ড্রয়ার টেনে দেখি তিনটে মাছ। ওগুলো ছুরি দিয়ে কুচি কুচি করে কেটে ফেলতেই দেখি ডাক্তার মারা পড়ল। হাসপাতালের সব কর্মীই খুব খুশি হল। ওখান থেকে বেরোতেই স্কুলের বন্ধু আব্দুর রব-এর সাথে দেখা হল। ও বলল, জানিস, এই হাসপাতালের ডাক্তারকে কে মেরে ফেলেছে। পুলিশ তাকে খুঁজছে। দূরে একজন পুলিশকেও দেখলাম। বন্ধুকে বললাম, ডাক্তারকে আমিই মেরেছি। কাউকে বলিস না। এমন সময় বন্ধু রামস্বরূপ এল। রব ওকেও ব্যাপারটা বলল। আমি বললাম, তোরা যা করছিস তাতে তো আমি ধরা পড়ে যাব আর পুলিশ আমায় ফাঁসি দেবে! স্বপ্ন ভাঙল। কিন্তু ঘুম ভাঙেনি। তখন কিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু বোধ হচ্ছে আমি সত্যিই একজনকে খুন করেছি। কিছুক্ষণ পর ঘুম ভাঙল। তখন বুঝলাম স্বপ্নের মধ্যেই স্বপ্ন দেখছিলাম।

- জয়কৃষ্ণ চ্যাটার্জী (বোলপুর)।

ব্যাখ্যা ঃ হাসপাতাল–পাঠচক্র। ডাক্তার - পাঠক। বাঘ ছাড়া - সচ্চিদানন্দগুরুর কথা বলা। এরা ''একত্বে শ্রীগুরু ও হতভাগ্য শিষ্য নেই'' - একথা বলে না।

সূর্য থেকে শক্তি এল - নির্গুণের শক্তি। তিনটি মাছ কাটা - ত্রিপুটি অবস্থায় আত্মা বা ভগবান দর্শন জীবনের উদ্দেশ্য নয় - এটি জানানো। জীবনের উদ্দেশ্য একত্ব লাভ॥ পুলিশরা help করতে পারল না - কোন বিশেষ কর্মের দ্বারা (কর্মফলে) এইসব পাঠকদের মোকাবিলা করা যাবে না। তদন্ত করতে একজন মাত্র পুলিশকে দেখা গেল - একমাত্র অনুশীলনের মাধ্যমেই একত্বের ভাবনা (বোধ) বিশ্বব্যাপী হবে। একজন মানুষ থেকে অপর মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হবে। তারা সকলেই বন্ধু - হিন্দু হোক বা মুসলমান। স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন - তূরীয় অবস্থার দর্শন অনুভূতিতে একত্ব বোধের উন্মেষ ঘটবে॥

* দেখছি - বাবাকে (পঞ্চানন ঘোষ) বললাম, আজ পাঠ করবে না ? বাবা বলল, এই চশমায় ভাল দেখতে পাচ্ছি না। প্রতিদিন নতুন নতুন চশমা পেলে তবে পাঠ করব। আমি তো অবাক উত্তর শুনে। ... ঘুম ভাঙল।

- মানসী মণ্ডল (বেহালা)।

ব্যাখ্যা ঃ নিত্য নূতন জ্ঞানের উন্মেষে দৃষ্টিভঙ্গী বদলালে ঠিক ঠিক পাঠ হয়। নতুবা পাঠ যান্ত্রিক ও নিষ্প্রাণ হয়ে ওঠে॥

মেসেজ

* গত ১৯শে ডিসেম্বর ২০১২, স্বপ্নে দেখছি - পাঠ শুনতে গেছি শ্রীধরদার বাড়িতে। পাঠ শেষে মোবাইলটা অন্ (on) করার সাথে সাথে স্ক্রিনটা বড় হতে শুরু করল। এক সময় সেটি ছোট ল্যাপটপের আকার নিল। জয় পাশেই বসে ছিল। আমি ভয় পেয়ে ওকে মোবাইলটা ঠিক করে দিতে বললাম। জয় সেটা হাতে নিয়ে দেখতে লাগল। ... ঘুম ভাঙল।

- অমরেশ চ্যাটার্জী (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যা ঃ মোবাইল - দেহ, আধার। পাঠ শুনলে বড় হয় – বড় বড় অনুভূতি হয়। কিন্তু সেগুলির অর্থ ধারণা করার জন্য ভগবানের অধিক কৃপা দরকার হয়॥

* দেখছি (১৪.১১.১২) - জয়দা আমাকে SMS করেছে - "Ganges river is spa." গঙ্গায় মাছ পাওয়া যায়নি বলে মাছ খাওয়া হয় নি। তাই যেন দুঃখ। তারপর যা লিখেছে তার মানে হচ্ছে জয়দার মোবাইলে পয়সা ফুরিয়ে গেছে, balance শূন্য। তাই আমাকে call back (ঘুরিয়ে ফোন) করতে বলেছে। ...

- সমীরণ চক্রবর্তী (বেহালা, কোলকাতা)।

ব্যাখ্যা ঃ Message - অনুভূতি। Spa (স্পা) - মানে মিনারেল ওয়াটার। মিনারেল ওয়াটারে মাছ থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, সমাধি কেমন জান? হাঁড়ির মাছ গঙ্গায় ছেড়ে দিলে যেমন হয়। এ ব্যক্তির সমাধি - অহংশূন্য অবস্থা। জয়ের ক্ষেত্রে গঙ্গায় ছাড়া মাছটাকে আর পাওয়া যাচ্ছে না অর্থাৎ ওর আত্মিক সত্তা মনুষ্যজাতির মধ্যে বিলীন হয়েছে। আর এর Support (সমর্থন) চাইছে দ্রষ্টা ও আরও অনেকের দর্শন থেকে। কেননা truth comes from reverse (সত্যের সমর্থন বিপরীত দিক থেকে আসে)।

উজবেক নয়, আরব

* স্বপ্নে দেখছি (১২.০৩.২০১৩) - একটা গিরগিটি জাতীয় প্রাণী দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে। দড়ির এক প্রান্ত আমার হাতে ধরা। আমি একজনকে বলছি, ওর মুখে পেস্ট দিয়ে দিলে ও ওর মুখ দিয়ে আমার দাঁত মেজে দেয়। ওর মুখটা ডলফিনের মত একটু নীচের দিকে, ঠিক horizental নয়। দৃশ্য বদলে গেল। অজানা এক ভদ্রলোক বললেন, ও তোমার দাঁত মেজে দেয় তাতে কী হয়? বললাম, এর মানে হল, আমার ধারণা শক্তি বাড়বে। লোকটি রেগে বলল, ওহে ধারণা হয় মাথায়, দাঁতে নয়। তুমি ঐ বদসঙ্গ ছাড়। এইজন্য কোন কোন স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে তোমার ভুল হয়ে যাচ্ছে। জয় এল। ওকে বললাম, ভদ্রলোক কী বলছে রে! জয় শান্ত ভাবে বলল, ও উজবেক নয়, আরব -এই যেমন হযরত। মনে হল বলতে চাইছে প্রাণীটি একটি মানুষের কথা বোঝাচ্ছে যে উজবেকিস্তানের মুসলমান নয়, আরবের মুসলমান॥ ... ঘুম ভাঙল।

- স্নেহময় গাঙ্গুলী (চারুপল্লী)।

ব্যাখ্যা ঃ আরবের মুসলমান - গোঁড়া ভক্ত। দ্রষ্টা যাদেরকে ঈশ্বরীয় কথা

শোনাচ্ছেন তারা যদি গোঁড়া ভক্ত হন, তাহলে পাঠ অনুশীলনে সাহায্য করতে পারেন (দাঁত মেজে দেন) কিন্তু নতুন কথা ভাবতে সাহায্য করেন না। ফলে নতুনের ইঙ্গিতবাহী স্বপ্নের ব্যাখ্যা ভুল হয়ে যায়।

* দেখছি (১৫.০৩.১৩) - শান্তিনিকেতনের একদল ছেলেমেয়ে গান গাইছে মিষ্টি সুরে। যেখানটা চড়া সুর হবে সেখানে স্বরূপ নামে একটি ছেলে হঠাৎ গলা মেলাল। আমার ভালই লাগল। গান শেষ হলে ওরা দুঃখ করে স্বরূপকে বলল, তুমি গান করায় আমাদের সুর কেটে গেল। তখন আমারও মনে হল কথাটা ঠিক। ...

- জয়দেব দাস (সুরুল)।

ব্যাখ্যা ঃ বিশ্বভারতী একত্বের কৃষ্টির প্রতীক। ব্যক্তি স্বরূপ উচ্চকিত হলে একত্বের সুর কেটে যায়॥

অনন্ত

* দেখছি (২১.০৪.১৩) - দোকানে রয়েছে একটা কোমরে পড়ার সোনার গয়না, মনে হচ্ছে নাম ''অনন্ত''। দেখে কেনার খুব ইচ্ছা হল। অপূর্ব সুন্দর দেখতে। ঘরের সব সোনার বিনিময়ে কিনব ঠিক করলাম। সব গয়না দোকানে নিয়ে গিয়ে ওজন করালাম। কিন্তু ওজন হল মাত্র বারো আনা। দোকানী বলল, আর চারআনা আনলেই 'অনন্ত' পাবেন। আমার কাছে শুনে পাঠের মায়েরা অনেকেই গেল অনন্ত কিনতে। কিন্তু কী আশ্চর্য প্রত্যেকের বাড়ীর গয়নার ওজন হল বারো আনা। দোকানী সকলকে বলল, আর চার আনা সোনা জমান। তারপর নিয়ে যাবেন 'অনন্ত'। ... ঘুম ভাঙল।

- রেনু মুখার্জী (সখেরবাজার)।

ব্যাখ্যা ঃ ব্রহ্মের তিন পাদ প্রকাশ এক পাদ অপ্রকাশ। এই তিন চতুর্থাংশ - বারো আনা - পাঠের অনেকের বোঝা হয়েছে। ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ - নির্গুণ ব্রহ্মের মূর্ত রূপ পরম এক-কে বোঝা শুরু হবে এবার। একের সঙ্গে একত্বলাভে মানুষ অনন্ত হয়ে উঠবে।

* দৈববানী হল স্বপ্নে (২৬.০৪.১৩) - ''পরম একের জন্ম হয়েছে''।

- চন্দন নস্কর (বেহালা)।

পাণ্ডুলিপি

* স্বপ্নে দেখছি (মার্চ ২০১৩) - হাতে নতুন 'ধর্ম ও অনুভূতি' বই। প্রচ্ছদ কালো রঙের - লাল কালিতে "ধর্ম ও অনুভূতি" লেখা। স্নেহময়দাকে বললাম, বইটা কি ঠিক আছে? উনি বললেন, দাঁড়া জীবনকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করে দেখি। পাশেই শ্রীরামকৃষ্ণ শুয়ে ছিলেন। তাঁকে দাদা কথাটা জিজ্ঞাসা করলেন। উনি বললেন, 'যোগাযোগ'। ... ঘুম ভাঙল। শ্রীরামকৃষ্ণের অবশ্য গোঁফ-দাড়ি দেখিনি। দাদা ওনাকেই জীবনকৃষ্ণ বললেন।

- অতনু মাইতি (কাষ্ঠডাঙা, সরশুনা)।

ব্যাখ্যা ঃ গোঁফদাড়িহীন শ্রীরামকৃষ্ণ - রামকৃষ্ণময় জীবনকৃষ্ণ। যোগাযোগ - দৈব যোগাযোগে 'ধর্ম ও অনুভূতি' গ্রন্থের ব্যষ্টির সাধনের ব্যাখ্যাগুলির পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। ফলে সংশোধিত সঠিক বই পাওয়া যাবে।

* দেখছি (০৩.০৩.১৩) - বাড়িতে অনেক লোকজন এসেছে। তাদের খাওয়ানোর জন্য ভাত চড়িয়েছি। আমি একজনকে বলছি, পাণ্ডুলিপি দেখে দেখে রান্না করতে হবে, বুঝলে? ... ঘুম ভাঙল। পাণ্ডুলিপি কথার মানে জানতাম না। পাঠে গিয়ে শুনলাম। – বাণী ঘোষ (সখের বাজার)।

ব্যাখ্যা ঃ পাণ্ডুলিপি দেখে "ধর্ম ও অনুভূতি" সংশোধন করতে হবে, তারপর তা মানুষকে পরিবেশন করতে হবে।

* দেখছি (০৭.১২.১২) - আমি উঠোন ঝাঁট দিচ্ছি। প্রয়োজন মত ঘাস ছিঁড়ছি। হঠাৎ ঘরে ঢুকে দেখি খাটে বসে ছোড়দা (বরুন) ও স্নেহময়দা 'ধর্ম ও অনুভূতি' বইটা correction (সংশোধন) করছে। আমি অবাক হয়ে ভাবছি এই বইয়েরও correction দরকার ! ... ঘুম ভাঙল।

- কৃষ্ণা ব্যানার্জী (বোলপুর)।

পাঠ প্রসঙ্গে

১) শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, "আমার এই দেহের ভিতর আর একজন আছে। হাত ভাঙার কষ্ট কিন্তু তার নয়। তোমরা এ দেহটিকে ভালবাসছো - এটি বিদ্যামায়া। বিদ্যামায়া যেন ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পথে শেষ পৈঠা, তারপর ছাদ।"

ষষ্ঠভূমিতে মন গিয়ে ঈশ্বরীয় রূপ দর্শনে ঈশ্বর আছেন এ বিশ্বাস দৃঢ় হয়। তাঁর প্রতি ভালোবাসা জন্মায়। এটি বিদ্যামায়ার কাজ। তাই ষষ্ঠভূমিতে দর্শন হয় গরদের শাড়ী পরে বই হাতে চলেছেন এক ভক্তিমতী নারী। ইনি বিদ্যামায়া। ইনি মায়া কেন? না সহস্রারে (ছাদে) মন গিয়ে অখণ্ড চৈতন্যের অনুভূতি লাভে ইনি বাধা দেন। অল্প জ্ঞানে সাধককে তুষ্ট রাখতে চান। সাধক প্রিয় ইষ্টের রূপ দর্শনে মোহিত হন। এর উপরে মন উঠতে চায় না। তাই বেদান্ত সাধনকালে ঠাকুর জ্ঞান খড়গে মাকে কেটে ফেলায় মন হু হু করে উপরে উঠে নির্বিকল্প সমাধি হল। বিদ্যামায়ার প্রভাব অতিক্রম করলেন।

সাধারণ মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালবেসে স্থূলে তাঁর সঙ্গ করে তারা বিদ্যামায়ার প্রভাবে অন্তরমুখী বা ঈশ্বরমুখী হয়। কিন্তু পরে তার চিন্ময় রূপ ভিতরে বার বার দেখে যখন বোঝে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহস্থ চৈতন্যকে তারা অন্তরে দেখছে এবং তিনিই প্রকৃত ভগবান রামকৃষ্ণ তাখন তারা বিদ্যামায়ার উর্দ্ধে ওঠে ও ঠিক ঠিক রামকৃষ্ণময় হয়।

এযুগে শ্রীজীবনকৃষ্ণকে অন্তরে দেখেও মানুষ যদি তাঁকে সচ্চিদানন্দ গুরু বা ভগবান ভাবে তাহলেও তার গতি এক জায়গায় গিয়ে থেমে যাচ্ছে - – সীমিত হচ্ছে – এও বিদ্যামায়া। একমাত্র তার সাথে একত্ব লাভ হলেই আত্মিক অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে – বিদ্যামায়ার পারে যাওয়া সম্ভব হবে।

২) ঠাকুর রামকৃষ্ণ একদিন দর্শন করলেন, নিক্তির উপরের কাঁটা ও নিচের কাঁটা এক হয়ে গেল।

সাধারণ মানুষের জীবনে কামিনী কাঞ্চনের ভার থাকে বলে উপরের কাঁটা নিচের কাঁটা এক হয় না।

ঠাকুরের বিষয়াসক্তি ছিল না, তিনি সংসারে নির্লিপ্ত ছিলেন। তাই ঠাকুরের ভগবান দর্শন হয়েছিল। তিনি বলেছেন, "মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য ভগবান দর্শন"।

কিন্তু শ্রীজীবনকৃষ্ণ দেখেছিলেন শূন্যে একটা পতাকা উড়ছে পত্‌পত্‌ করে। অর্থাৎ জীবনে ক্রমাগত কৃপাবায়ু বইতে থাকায়, একটার পর একটা অনুভূতি হতে থাকায় দেহে যোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে একসময় তিনি দেহ সমেত ঈশ্বরে পরিবর্তিত হন, বিশ্বব্যাপী হন। তাই তিনি বললেন, "মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য মনুষ্যজাতির সাথে আত্মিক একত্ব লাভ।"

পতাকা ওড়ানোর জন্য বায়ু প্রবাহিত হওয়া দরকার, শূন্যে বায়ুপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই, কিন্তু দাঁড়িপাল্লার একদিক ঝুঁকে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। তেমনি ব্যষ্টির সাধনে স্খলন পতনের সম্ভাবনা থাকে কিন্তু বিশ্বব্যাপীত্বলাভ হলে আর সে সম্ভাবনা থাকে না।

সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও এই বিশ্বমানবের সাথে আত্মিক একত্বলাভ হলে আর পতনের ভয় থাকে না।

৩) "গাছের গুঁড়ি মোটা হয়ে গেলে হাতী বেঁধে দিলেও কিছু হয় না।" —শ্রীরামকৃষ্ণ।

১ম স্তরে – ব্যষ্টির সাধনে - স্মরণ মনন মাত্র দেহে ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশ ঘটে। মন সর্বদা অন্তরে আবদ্ধ।

বিশ্বব্যাপিত্বে – সর্বজনীন ও সর্বকালীন হওয়া।

২য় স্তরের অনুভূতি যাদের তাদের গুঁড়ি মোটা হওয়ার লক্ষণ -

ক) অখণ্ড চৈতন্যের সাথে একত্ব লাভ করে বহুত্বে একত্বের বোধ লাভ।

খ) দর্শন অনুভূতির মর্মার্থ (স্বপ্নের প্রতীকার্থ) উদ্‌ঘাটনের সামর্থ্য লাভ।

গ) নিরন্তর ভগবৎ অনুশীলনের পরিবেশ লাভ।

ঘ) সৎ ও সাধারণ জীবন যাপন।

৪) "Cosmic man in Jainism and cosmic woman in Tantra." (ধর্ম ও অনুভূতি, পুরাতন সংস্করণ)।

জৈনরা বিশ্বাস করে মহাবিশ্বের আকৃতি (universe এর shape) দু'হাত কোমরে রেখে পা ফাঁক করে দাঁড়ানো এক মানুষের আকারের। তাকেই cosmic man বলা হয়েছে। Cosmic man আসলে কোন man বা God এর কথা নয়। সুতরাং জৈনধর্মে cosmic man বলতে অবতারের অবস্থা বোঝায় না। কেননা অবতার জীবন্ত একজন মানুষ।

অপরপক্ষে ইহুদীরা cosmic man বলতে তাদের ঈশ্বর জিহোবাকে বোঝে। কেননা জিহোবা নিজের রূপে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন আদমকে। অর্থাৎ জিহোবার আকৃতি ঠিক মানুষের মত। তিনিই cosmic man in true sense - ইহুদীদের কাছে।

তন্ত্রে cosmic woman বলে কোন কথা নেই। এখানে cosmic woman বলতে মা কালীকে বোঝানো হয়েছে যার ভিতর থেকে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও যার মধ্যে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের লয় হতে দেখেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। এই কালী সংস্কারজ কল্পিত মূর্তি, কোন জীবন্ত মানবী নয় সুতরাং অবতারের অবস্থার সঙ্গে তুলনীয় নয়। বরং এটি অবতার পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণেরই আত্মিক অবস্থার ইঙ্গিত, কালীর নয়।

তবে ইহুদী ধর্মে, খৃষ্ট ধর্মে ও ইসলাম ধর্মে আদমকে cosmic man বলা হয়। হিন্দুধর্মের পুরুষ সূক্তের পুরুষকে cosmic man বলা হয়েছে কেননা তার থেকে জগৎ ও মনুষ্যজাতি সৃষ্টি হয়েছে।

৫) প্রসঙ্গ ঃ ব্রহ্মযোনি। (কথামৃত ৪র্থ ভাগ, ২৩ খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ।)

বেলতলায় অনেক তন্ত্রের সাধন হয়েছে। এখানেই ব্রহ্মযোনি দর্শন হয়েছিল। সেই যোনি থেকে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও তাতেই লয় হয়। অতি গুহ্য কথা। দেখেছিলাম - লক্ লক্ করছে। (শূন্যে ঝুলছে এক বিরাট জিভ - লক্ লক্ করছে - বোধ হচ্ছে ব্রহ্মযোনি।— English translation of Kathamrita.)

জিভকে ব্রহ্মযোনি বোধ হচ্ছে। এর অর্থ - তিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর

রসনা থেকে ঈশ্বরীয় অনুভূতি লব্ধ সত্য বাণীরূপে স্ফুরিত হবে যা শুনে অসংখ্য মানুষের অন্তরে সৃষ্টি হবে আত্মিক জগৎ এবং নাশ হবে কল্পিত সংস্কারজ ঈশ্বরীয় ভাবনার জগৎ সমূহ। এইভাবে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও লয় হবে।

৬) মধুপুর থেকে ১৯৬৬ সালে আনন্দমোহন ঘোষের লেখা এক চিঠিতে শ্রীজীবনকৃষ্ণের একটি স্বপ্নের উল্লেখ পাওয়া যায়। উনি দেখেছেন - একটা পাকা পটল ভাতে মেখে খাচ্ছেন।

পাঠে এই স্বপ্ন শোনার পর ঐ রাত্রেই অমরেশ চ্যাটার্জ্জী স্বপ্ন দেখল - - একটা পাকা পটল, খোসা ছাড়ানো - দু'আধখানা করে কাটা। মনে হচ্ছে শ্রীজীবনকৃষ্ণ খাবেন। দ্রষ্টা বরুণকে বলল, ঐ পটলটা কে জানো? ওটা আমি। ... ঘুম ভাঙল।

বোঝা গেল, জীবনকৃষ্ণের পটল খাওয়ার মানে হল - নির্গুণের ক্রিয়ার ফল স্বরূপ শিবত্ব প্রাপ্ত মানুষদের তিনি স্থায়ীভাবে আত্মীকরণ (assimilation) করছেন অর্থাৎ তাদেরকে নিজের সাথে সম্পূর্ণ এক করে নিচ্ছেন। দু'ভাগ পটল দেখিয়ে বোঝালো এতদিনে স্বপ্নে দেখা ঐ পটলের রহস্য উদ্ঘাটিত হল, কেননা ঐ স্বপ্নের ফল পেতে শুরু করল জগৎবাসী।

৭) শ্রী জীবনকৃষ্ণ বললেন, কাল (২২.০১.১৯৬২) আমায় দু'টো দৈববাণী করেছে। এক - "দরজা খুলে দে" দুই - "যত পারিস খেয়ে নে।" (Ref. - জীবনসৈকতে)।

১৯৬৩ তে "ধর্ম ও অনুভূতি" (৩য় ভাগ) লেখার মাধ্যমে তিনি তার বিশ্বব্যাপী সত্তার পরিচয় প্রকাশ করে দিলেন। তিনি ধরা না দিলে দরজা না খুলে দিলে কেউ তো তাকে জানতে পারবে না!

"যত পারিস খেয়ে নে!" - বিশ্বব্যাপী সত্তার পূর্ণ প্রকাশে যুগোপযোগী সাধন দেহে ফুটল। যুগের প্রয়োজনে সমষ্টির ধর্ম ও আত্মিক নিয়ন্ত্রণ (spiritual control) ফুটবে পরের ধাপে।

৮) অবতারত্ব ঘোচার অনুভূতির পর (নভেম্বর ১৯৫২) ভগবানত্বের সূচনা পর্বে শ্রীজীবনকৃষ্ণ একদিন স্বপ্নে দেখলেন, বাইরে থেকে ঘরে ঢুকছেন। ঘরে ঢোকার আগেই শুনতে পেলেন ভিতরে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কোন্দল হচ্ছে। শেষে লক্ষ্মী সরস্বতীকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলেন ঘর থেকে। .....

লক্ষ্মী ভক্তির প্রতীক। ব্যষ্টির সাধনে ভক্তি থাকে। অবতারত্ব ঘুচে যাওয়ার পর বিশ্বব্যাপিত্ব লাভ হল ঘরের বাইরে আসা - সেখানে ভক্তি নেই। আছে শুধু জ্ঞান - সরস্বতী। অবতারত্ব পর্যন্ত জ্ঞান ও ভক্তি। যদিও ভক্তিরই (লক্ষ্মীর) প্রাধান্য সেখানে।

এর কিছুদিন পর উনি দেখলেন, অন্ধকার গুহা থেকে চুলের মুঠি ধরে একজন মানুষকে বের করে আনলেন, মনে হল তার নাম অনাথবন্ধু। সে হাতজোড় করে বলল, "বাবুজী, মশাই, আপনি জানবেন আপনি ভগবান তবে গুপ্তভাবে লীলা।" এবার শুরু হল তাঁকে ভগবান রূপে দেখা – সরস্বতীর প্রকাশ।

৯) অবতাররূপ কার্তিকের বাহন ময়ূর কারা?

কাশীপুর উদ্যানে ঠাকুর একটুকরো কাগজে লিখে দিয়েছিলেন, "নরেন শিক্ষে দিবে।" নীচে গলা পর্যন্ত একটি মানুষের ছবি - তার গলায় ঘায়ের চিহ্ন। আর এই ছবির পাশে একটি ময়ূরের ছবি এঁকে দিয়েছিলেন।

গলায় ঘা যুক্ত মানুষটি হলেন ঠাকুর নিজে। আর ময়ূরটি নরেন। ঠাকুর অবতার, যিনি মানুষরতনকে ভিতরে পেয়েছেন। মানুষরতনের তথা অবতারের প্রতীক হল কার্তিক। কার্তিকের বাহন ময়ূর। ঠাকুরের ভাবধারার ধারক ও বাহক হবেন নরেন। নরেনকে চাপরাশ দিয়ে ময়ূরের ছবি এঁকে বোঝালেন, ওঁর প্রকৃত কাজ ঠাকুরের শিক্ষার ধারক বাহক হওয়া।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত রচয়িতা শ্রীম সম্পর্কেও অনুরূপ কথা বলা যায়। তৃতীয় দর্শনের পরদিন বিকেলে একই সময়ে তিনি ঠাকুরের কাছে এলে, ঠাকুর বলে উঠলেন, "ঐ রে আবার এসেছে। একটা ময়ূরকে বেলা চারটের

সময় আফিম খাইয়ে দিয়েছিল। পরদিন ঠিক ঐ সময় ময়ূরটা উপস্থিত। আফিমের মৌতাত ধরেছিল, ঠিক সময়ে আফিম খেতে এসেছে।”

আবার কেশব সেনকে বেলঘরিয়ার ব্রাহ্ম সমাজে দেখে তার দর্শন হয়েছিল - একটি ময়ূর পেখম ছড়িয়ে বসে আছে। বাস্তবিক কেশবচন্দ্র সেনই ছিলেন ঠাকুরের প্রথম প্রচারক।

১০) 'গৃহস্থের বৌ-এর সন্তান হলে শাশুড়ী কর্ম কমিয়ে দেয়। সে ছেলেটিকে নিয়েই নাড়াচাড়া করে, ঘরকন্নার কাজ শাশুড়ী, ননদ, জা - এরা সব করে।' —শ্রীরামকৃষ্ণ।

গৃহস্থের বৌ - ভাগবতী তনু। সন্তান - আত্মা সন্তান। শাশুড়ী - স্থূলদেহ। কাজ—খাওয়া-হাগা-ঘুমোন। “আমি খাবো, হাগবো আর ঘুমোব” – শ্রীরামকৃষ্ণ। ননদ - সূক্ষ্ম শরীর। জা - কারণ শরীর। ধারাবাহিক অনুভূতির বাইরেও কারণ শরীরে নানা অনুভূতি হয় যাতে দেহের যোগ বিঘ্নিত না হয়। ওমুকের কাছে বা ওমুক জায়গায় যাস না - শ্রাদ্ধে খাস না ইত্যাদি নানান দৈব নির্দেশ লাভ হয় কারণ শরীরের লীলায় - সে অনুভূতি বেদান্তের ধারাবাহিক অনুভূতি নয়, কিন্তু দরকার। তবেই দেহী বেদান্তের দর্শন নিয়ে মনন অর্থাৎ ছেলেটিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারবে নিরবচ্ছিন্নভাবে।

ষষ্ঠভূমিতে কারণ শরীর জাগে, পরে ভাগবতী তনু। ভাগবতী তনু ইষ্টে পরিবর্তিত হয়। সপ্তমভূমিতে গিয়ে এই ভাগবতী তনু আত্মায় পরিবর্তিত হয়। এ যাদের বস্তুতত্ত্বের সাধন তাদের হয়। অন্য সকলের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ২য় স্তরের অনুভূতি যাদের তাদের সব দর্শনই শুধু কারণশরীরে হয়। ১ম স্তরের অনুভূতিতে, ভাগবতী তনুতে সাধক যা দেখেন তা তার পরিবর্তিত অবস্থার কথা। যেমন - আত্মা দর্শন, বিশ্বরূপ দর্শন, মানুষরতন দর্শন ইত্যাদি। কারণ শরীরের দর্শনে কিছু বার্তা থাকে মাত্র। যেমন - শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীজীবনকৃষ্ণকে স্বপ্নে বললেন, তুই এত গরম জিনিস খাস কেন? বুঝলেন, মাছ, মাংস খেতে বারণ করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতা যাবেন বলে বেরিয়ে পড়ে হঠাৎ দর্শন হল নরেন আসছে তাঁর কাছে। তিনি আর কলকাতা গেলেন না। কিছু পরে সত্যিই নরেন

এল। এই দর্শনে রামকৃষ্ণ নরেন হয়ে যান নি। এটি তাঁর কারণ শরীরের দর্শন।

১১) ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে -

“ওঁ অসৌ বা আদিত্য দেবমধু তস্য দ্যৌরেব তিরশ্চীন বংশোন্তরিক্ষম্ অপূপ মরীচয়ঃ পুত্রাঃ।”

এর অর্থ - ঐ সূর্য দেবতাদের মধু অর্থাৎ মানুষের চৈতন্যস্বরূপ। তার (সূর্যের) অবলম্বন দ্যৌ। সেই দ্যৌ বা আকাশ যেন বাঁকা (তীর্যক) একটি বাঁশ। তার নিচে বিধৃত আছে মৌচাক (অপূপঃ) সম অন্তরীক্ষ। আর অন্তরীক্ষের সূর্য হল মৌচাকের ভিতর মধু। মরীচয় অর্থাৎ কিরণসমূহই পুত্রাঃ অর্থাৎ তাকে বহুরূপ দান করে।

দেহতত্ত্বে, microcosm-এ এর অর্থ -

সূর্য = সহস্রারে দপ্ করে জ্বলে ওঠা দীপকের লাল আলো রূপে চৈতন্য দর্শন । মধুর রং লালচে - মধু চৈতন্যের প্রতীক। এই চৈতন্যই সূর্য - The Sun indeed is honey as in Modhuvidya (ছান্দোগ্য)। এই সূর্যের অবলম্বন দ্যৌ = আকাশ - তূরীয় নির্গুণ ব্রহ্ম। তার নিচে অন্তরীক্ষ = শূন্য - সাধকের ষোলআনা অহংশূন্য অবস্থা। অপূপঃ = মৌচাক - অন্তরীক্ষ যেন মৌচাক - বাইরের উপমা। অন্তর্জগতেও এই উপমা প্রযোজ্য। অহংশূন্য মানুষটি মধু বা চৈতন্যের উৎস। মরীচয়ঃ = সূর্যকিরণ - কিরণপাত। দেহতত্ত্বে - সহস্রারে মধুপাত দর্শন। পুত্রাঃ = পরিণতি – বাইরে সূর্যকিরণ সম্ভূত জল অসংখ্য বৃষ্টিকণা রূপে পৃথিবীতে ঝরে পড়ে। আত্মিকে সূর্যসম অখণ্ডচৈতন্যের ঘনীভূত রূপ ঐ মানুষটির মনুষ্যজাতির মধ্যে নিজেকে নিজের অসংখ্য রূপদান।

দ্রষ্টারা অন্তরে সূর্যের মধ্যে তাঁর রূপ দেখে তার ব্রহ্মত্ব বা একত্ব লাভ করে - বহুত্বে এই একত্বই চৈতন্য বা মধু। এই সূর্য হল দেবমধু - সর্বজন প্রিয়। কেননা মানুষই দেবতা, অন্য দেবতা নাই। এই সূর্য তথা সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষকে দেখা স্বপ্নাবস্থার পারে তূরীয় অবস্থায় নির্গুণ ব্রহ্মের প্রকাশ। এই দর্শন যাদের হয় তারাও অহংশূন্য (প্রতীকে অন্তরীক্ষ) হন ও সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষের সাথে এক হন - হয়ে ওঠেন চৈতন্যময় - প্রতীকে অপূপঃ বা মৌচাক।

এখন একথা স্পষ্টত বলা যায় যে আমরা যখন শ্রীজীবনকৃষ্ণকে সূর্য মণ্ডলস্থ পুরুষ রূপে অন্তরে দেখি তখন তা তূরীয় অবস্থায় নির্গুণ ব্রহ্মের প্রকাশ - স্বপ্ন নয়। এটি বোঝাতে অনেক সময় স্বপ্নের ভিতর স্বপ্নে (তূরীয়) শ্রী জীবনকৃষ্ণকে দেখা যায়। আর যখন স্বপ্নে দেখি তখন ভগবান জীবনকৃষ্ণকে অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম জীবনকৃষ্ণকে দেখি। সে কিন্তু জীবনকৃষ্ণের ষোলআনা প্রকাশ নয়।

১২) মাঠে অনেক কাঁকুর হলে চাষী দু'একটা অন্য লোককে দান করতে পারে (কথামৃত)।

কাঁকুর - ''বারো হাত কাঁকুরের তেরো হাত বীচি।'' দেহের মধ্যে অনন্ত ঈশ্বর বীজরূপে রয়েছেন - এই বোধ দানকারী অনুভূতি। চাষী — যার দেহজমিতে বস্তুতত্ত্বে সাধন হয়েছে। দান করতে পারে– ব্রহ্মবিদ্যা দানের বস্তু। এক যুগে একজনের দেহে সাধন হয়। বাকীরা তার সাধনের ফল লাভ করে।

স্মৃতিকথা

শ্রীজীবনকৃষ্ণের পূতসঙ্গলাভে ধন্য কিছু মানুষের টুকরো কিছু স্মৃতিকথা এখানে উল্লেখ করা হল।

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ঃ আন্দুলের মিতুদাসকে লেখা চিঠি থেকে উদ্ধৃত।

তারিখ ঃ ৫ই ডিসেম্বর ১৯৮৯

''প্রিয় মিতু,

আমরা, তার সঙ্গকারীরা, কেউই তোমাদের চেয়ে বিশেষ কোন উচ্চ

আসনে বসে নেই। জীবনকৃষ্ণ সকলকেই একাসনে বসিয়ে গেছেন। আর সেই আসনে তিনি নিজেও বসে আছেন। আমাদেরই সঙ্গে আমাদেরই মধ্যে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কথা মনে পড়ে -

''আমি চেয়ে আছি তোমাদের সবাপানে
স্থান দাও মোরে সকলের মাঝখানে।
নিচে সব নিচে এই ধূলির ধরণীতে
যেথা আসনের মূল্য না হয় দিতে
যেথা রেখা দিয়ে ভাগ করা নেই কিছু
যেথা ভেদ নাই মানে আর অপমানে
স্থান দাও সেথা সকলের মাঝখানে''

সব আচার্য পুরুষরাই মানুষের মাঝখানে অর্থাৎ অন্তরে স্থান চেয়েছিলেন কিন্তু মানুষ তাদের ঠাঁই দেয়নি। কিন্তু দেখো অযাচিতভাবে জীবনকৃষ্ণের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে মানুষের সহস্রারে ব্রহ্মের স্থানটিতে তাঁর রূপ জেগে উঠলো। সেকথা মানুষই তাঁকে জানিয়েছে। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ unconcerned। সুতরাং তাঁর বিশেষ কৃপার পাত্র বলে কেউ ছিল না। তিনি ছিলেন সমদর্শী। কিন্তু আশ্চর্য! সব মানুষই ভাবতেন - ''তিনি আমাকে বেশী ভালবাসেন।''

জীবনকৃষ্ণ অসুস্থ। আমায় ডাকলেন কাছে। বললেন, দেখ্ মাস্টার মশাইকে স্বামীজি একদিন বললেন, দেখুন দিকি - আমরা সাধন করছি বলে রামবাবুরা বলে তাঁকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) দেখেছি - আমাদের আবার সাধন ভজন কী? কিন্তু আমাদের যে তিনি সাধন করতে বলে গেছেন, তাই করছি। তা বাবা আমি তোদের সাধন করতে বলি না। কিন্তু তোরা ব্রহ্মবিদ। এই ব্রহ্মবিদ্যা, এই সত্য লাভের জন্য জগতের নরনারীর তীব্র ব্যাকুলতায় শান্তি দান করতে পারিস কেবল তোরাই - আমার কথা বলে।

কোন এক শীতের রাত্রি। আমি এক মন্দিরের নাট মন্দিরে বসে পাঠ করছি। সামনে ১০০ জনের অধিক নরনারী আগ্রহ ভরে জীবনকৃষ্ণ-বানী শুনছেন। আমি আত্মহারা হয়ে সেদিন পাঠ করছিলাম। জন্মাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাহিনীর যৌগিক রূপ বলছি। কোন এক দুর্যোগময়ী রজনীতে কংস কারাগারে

দেবকী উদরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই কাহিনীই পুরানকারেরা চিরদিন আমাদের শুনিয়ে এসেছেন। কিন্তু এই কাহিনীর কথাজালে যে সত্য এতদিন হারিয়ে গিয়েছিল, সেই সত্যকে আমরা দেহতত্ত্বে যৌগিক রূপে ফিরে পেয়েছি। আমি এবার বোঝাতে আরম্ভ করলাম 'ভগবানের আবির্ভাবে পৃথিবী আনন্দে নেচে ওঠার কথা।' নন্দন বাগানের অপ্রস্ফুটিত ফুল মনোরম রূপ ধারণ করে ফুটে ওঠার কথা। নিরানন্দ ধরা আনন্দে মেতে ওঠার কথা। পরিবর্তে দুর্যোগ কেন? দুর্যোগ আমরা কাকে বলি? প্রাকৃতিক সাধারণ স্বাভাবিক অবস্থার ব্যতিক্রমকেই তো দুর্যোগ বলে থাকি। মহাযোগীর দৃষ্টি কখনও বাইরে থাকে না। তাদের দৃষ্টি থাকে অন্তরে, দেহমধ্যে। হ্যাঁ, ঠিকই তাই। দেহমধ্যেও এই দুর্যোগ আরম্ভ হয়। কখন? দেহের স্বাভাবিক অবস্থা - কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য যখন আপন আপন কাজ করে চলে মাথার মধ্যে তখন দেহী রাজা হয়ে বসে আছে, সে-ই কংস রাজা। ব্যতিক্রম শুরু হল সেদিন যে মুহূর্তে কৃষ্ণ তথা আত্মা পর্যায়ক্রমে বিকশিত হতে লাগলেন দেহের মধ্যে। দুর্যোগ শুরু হল। কারণ কংস রাজার রাজত্ব যে যেতে বসেছে - আর তো রিপুনিচয়ের কাজ চলবে না। তারা জেহাদ ঘোষণা করল। কিন্তু শেষে অসুরের পরাজয়ে সুরের তথা কৃষ্ণের বা আত্মার অর্থাৎ জীবনকৃষ্ণের জয় হল বলেই না আমরা তাকে যুদ্ধ জয়ী রাজা রূপেই দেখলাম ইত্যাদি ইত্যাদি। বলা বাহুল্য শ্রীকৃষ্ণের জন্মের দেহতত্ত্বে যৌগিক রূপের লেখাটি যদি তোমার কাছে থাকে তো মিলিয়ে দেখতে পাবে প্রারম্ভিক কথাটি ছাড়া জীবনকৃষ্ণ আমায় যা বলিয়েছেন, তাই বলেছি কিন্তু এগুলি তিনি লিখে দেন নি।

দুই বন্ধু আমার দেওয়া এই সব ব্যাখ্যা নিয়ে ওনার কাছে নালিশ করেছিলেন। নালিশের খবর আমারও কানে আসতে পরের রবিবার ওনার কাছে কদমতলায় গেলাম। যাওয়া মাত্র বলে উঠলেন, 'আয় বাবা আয়, এসো বাবা এসো। আমি জানতাম তুই আসবি। তাই আজ সকালে আর বেড়াতে বেরোইনি।' কথা প্রসঙ্গে গত বৃহস্পতিবারের পাঠের কথা উঠলো। পাঠে আমি যা বলেছি, সে সব অনর্গল বলে গেলাম। উনি শুনে বললেন, আহা এত সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছিস! কেউ কি টেপ করে রাখেনি? টেপ করে রাখলে ভাল

হত। আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। এত প্রশংসা করবেন তা ভাবতেই পারিনি................"

বঙ্কিম চক্রবর্তী ঃ ১৯৫৫ সালের জুন মাসে - ভোলাবাবুর বাবা রাধিকানাথ মুখার্জী স্বপ্নে দেখলেন - তিনি কদমতলায় এসেছেন। জীবনকৃষ্ণ দোতলা বাড়ির দোতলায় অনেককে নিয়ে বসে আছেন। রাধিকাবাবু উপরে ওঠার সিঁড়ি খুঁজছেন কিন্তু পাচ্ছেন না। এই স্বপ্ন দেখে উনি তার মানে নিজেই বুঝেছেন। তিনি গেরুয়া পরতেন। কিন্তু পরদিন সাদা কাপড় পরে কদমতলায় এলেন ও জীবনকৃষ্ণকে সব বললেন।

জীবনকৃষ্ণ শুনে বললেন, আপনি অনেক বড় ত্যাগ দেখালেন। সাদা কাপড় ছেড়ে গেরুয়া পরতে পারে অনেকে। কিন্তু গেরুয়া ত্যাগ করে সাদা কাপড় পরে ঈশ্বরীয় চর্চায় রত থাকতে পারে ক'জন? এই সংস্কার ত্যাগ অনেক বড় ব্যাপার।

জনৈক বৃদ্ধা (আলপুকুর)ঃ জীবন বাবু তার সাথীদের নিয়ে যখন আসতেন - আমরা জানতাম উনি মেয়েদের মুখ দেখেন না। তাই আমরা ঐ বাড়ীর পাশ দিয়ে যেতে হলে ঘোমটা দিয়ে যেতাম। সবাই জিনিসটাকে খুব সহজ ভাবেই নিয়েছিলাম।

কালীপদ বন্দোপাধ্যায় ঃ একদিন আমার প্রতিবেশী গণেশ মান্না বললেন, আপনি তো দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড়ে যাতায়াত করেন, এক জায়গায় যাবেন? যা আপনি চান তা পাবেন। অফিস থেকে ফেরার সময় ওর সাথে কদমতলায় গেলাম (১৫ই নভেম্বর, ১৯৫৪)। মেঝেতে কয়েকজন বসে - কথামৃত পাঠ করছে একজন। গণেশ ঘরে ঢুকে একজনকে প্রণাম করল। তার বলিষ্ঠ দেহ, শান্ত সৌম্য মূর্তি। আমার পরিচয় দিতেই বলে উঠলেন, "আয় ভিতরে এসে বোস।" অতি প্রিয়জনের সম্বোধনের মত বাজল। জিজ্ঞাসা করলেন, তুই তো কথামৃত পড়িস, খুব ভাল। ধ্যান করিস বাবা? আমি বললাম, আমার ধ্যান হয় না। ধ্যান জানিও না। আবার জিজ্ঞেস করলেন, স্বপ্নে কখনও ঠাকুরকে দেখেছিস? বললাম, না। বললেন - একটু ধ্যান কর না। ছবিতে ঠাকুর যেভাবে বসে আছেন এইরকম বসে ঠাকুরকে মনে মনে ডাক না। তাঁর কথামত চোখবন্ধ করে বসে

আছি। হঠাৎ দেখি উনি আমার উরুতে হাত বুলোতে লাগলেন। তাঁর স্পর্শে শরীরে বিদ্যুতের শক লাগার মত হল ও ক্রমশ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হলাম। এবার দেখছি - আমার সামনে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা উপবিষ্ট। কিছুক্ষণ পর মূর্তি দুটি অদৃশ্য হল। আমারও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল। উনি বললেন - তবে তুই যে বললি ধ্যান হয় না। তা বেশ তো ধ্যান হচ্ছিল। ধ্যানে কিছু দেখলি? সব শুনে বললেন, ''আমায় বাঁচালি বাবা।'' তাঁর কথার অর্থ কিছু বুঝলাম না। এরপর তাঁকে প্রণাম করে বাড়ি ফিরে এলাম। রাত্রে খেয়ে দেয়ে শোবার আগে 'জয় রামকৃষ্ণ' বলে শুতে যাব, অমনি কে যেন বলল, ''ওরে বল, জয় জীবনকৃষ্ণ'' এই দুই-ই এক। শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখছি - ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সামনে। ঠাকুরের কাছে কাঁদছি আর বলছি - আমার কী হবে? আমায় সংসারী করলে কেন? সংসারের আঘাত আমার সহ্য হয় না। ঠাকুর বললেন, তোর ভাবনা কিসের? তোরা যে রাজার বেটা।

পরদিন অফিসে ছুটির পর কদমতলায় তার ঘরে ঢুকলাম। ঢুকতেই উনি খাটের উপর নিজের বিছানার উপর বসতে বললেন। আমি ইতস্তত করছি দেখে বললেন, ওরে তোরা যে রাজার বেটা রে! এই কথাটা কানে যাওয়া মাত্র শিহরণ জাগল। এইভাবে নিত্য তার কাছে যাতায়াতে আমার বহু অনুভূতি লাভের সৌভাগ্য হয়েছে।

অভয়পদ মুখোপাধ্যায় ঃ শ্রীজীবনকৃষ্ণের কাছে যাবার তিন দিন পর স্বপ্ন দেখছি - পুকুরের পূর্বদিক হতে সূর্য উদয় হচ্ছে। সূর্যমণ্ডলের মধ্যে শ্রীজীবনকৃষ্ণ রয়েছেন। পুকুরের অন্য প্রান্তে কয়েকদিন আগে দেখা এক সন্ন্যাসী একটি জীর্ন খাটিয়ায় শুয়ে পুকুরের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছেন..........................।

কয়েকদিন পর ক্ষিতীশবাবুর সাথে গিয়ে শ্রীজীবনকৃষ্ণের কাছে স্বপ্নটি নিবেদন করতেই উনি বসে বসেই যেন লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, আরে! এখানে আসার ৩ দিন পরেই আপনি আমাকে সূর্যমণ্ডলের মধ্যে দেখেছেন। একেই বলে জাত সাপের পাল্লায় পড়লে তিন ডাকে চুপ।

আনন্দমোহন ঘোষ ঃ ঠাকুরের ভাইপো শিবরামবাবু মাষ্টারমশাইকে বলেছিলেন - একবার ঠাকুরের ঘরে চারজন গুণ্ডা প্রকৃতির লোক এসে হাজির।

তারা এসেছে ঠাকুরকে মারতে। তারা আসতেই ঠাকুর তাদের খুব আদর করে বসালেন। তারপর হাঁসপুকুরের দিকে চলে গেলেন - কিছুক্ষণ পর ঘাড়ে করে এক বিরাট পাকা কাঁঠাল নিয়ে এলেন। সে সময়টা পৌষ-মাঘ মাস হবে। তারপর ঘরে সন্দেশ ছিল। সেসব তাদের খাইয়ে দাইয়ে ছেড়ে দিলেন। তারাও আনন্দ করতে করতে চলে গেল। অথচ তারা এসেছিল ঠাকুরকে মারতে।

দিলীপ কুমার ঘোষ ঃ ১) বড় ধীরেনবাবু বললেন - একজন বলেছিল আমার যদি অনেক টাকা থাকত তা হলে বেশ হত। খাটতে খুটতে বা টাকার ভাবনা করতে হত না, সুদেই চলত আর দিব্যি বসে বসে ভগবানকে ডাকা যেত।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মৃদু তিরস্কারের ভঙ্গিতে বললেন, দূর মশাই, সে কখনও হয় ? তখন সুদের হিসাব করতে করতেই দিন কেটে যাবে। ধনৈশ্বর্য থেকে ঈশ্বর অনেক দূরে। দুধও খাবে তামাকও খাবে এ হয় না।

২) শ্রীজীবনকৃষ্ণ একদিন (১৮/০৫/১৯৫৫) বললেন, তোরা এক কাজ করতে পারিস? জগতকে তোদের এই অনুভূতির কথা দান করতে পারিস? এ একেবারে আনকোরা জিনিস।

নিমাই বলল - লোকে বিশ্বাস করবে কেন?

শ্রীজীবনকৃষ্ণ - কেন করবে না? একজন ছাপালে হয়ত অবিশ্বাস করবে, কিন্তু তোদের সকলের স্বপ্নগুলো যদি ছাপানো হয়, তাহলে কী আর অবিশ্বাস করতে পারবে?

মানিক ৬০সংখ্যা

মুখবন্ধ

ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। যুগ যুগ ধরে এখানকার মানুষ ভগবান ভগবান করে এসেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ঋষিদের সত্য উপলব্ধি ও তার ঘোষণা আপামর জনসাধারণের কাছে পৌঁছায়নি। বরং বলা ভালো সংকীর্ণ স্বার্থে পুরোহিত ও গুরু সম্প্রদায় সাধারণ মানুষকে বৈদিক সত্য জানতে দেয়নি।

ফলে আজ যদি কোন ভারতবাসীকে জিজ্ঞাসা করা হয়, ‘‘ভগবান কি?’’ তার উত্তরে এক একজন এক একরকম উত্তর দেবে এবং সে সকল উত্তর-ই অনুমান ও কল্পনা নির্ভর।

শিবলোক, বিষ্ণুলোক ইত্যাদির কল্পনা এবং নানান অলৌকিক পুরান কাহিনীর অবতারণা মানুষকে দ্গি্‌ভ্রান্ত করেছে। ধর্মের কল্যাণতম রূপ রয়ে গেছে অধরা। অথচ কোন্ সুদূর অতীতে ঋক্‌বেদের ঋষি ঘোষণা করেছিলেন, ‘‘একং সৎ।’’ একই আছে। বহু নেই। সেই এককে পাওয়া-ই সত্য পাওয়া। সেই এক হ’ল একজন মানুষ ও তার দেহব্যাপ্ত প্রাণ-চৈতন্য। এই চৈতন্য যদি আপনা হতে সহস্রারে সংকলিত ও ঘনীভূত হয় ও অঙ্গুষ্ঠবৎ আত্মায় পরিবর্তিত হয় তাহলে পরে তিনি বিশ্বমানব হয়ে ওঠেন - হন পরমব্রহ্ম। আর এর লক্ষণ হল - ‘‘স্বেন রূপেন অভিনিষ্পদ্যতে।’’ অর্থাৎ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সংখ্যাতীত মানুষ তাঁকে তাদের অন্তরে দর্শন করবে - সে কথা তাঁকে জানাবে। আবার তিনি মনুষ্যজাতিকে নিজের ভিতর দেখবেন। ‘‘সর্বভূতস্থম্ আত্মানম্ সর্বভূতানি চ আত্মনি, সম্পশ্যন্ ব্রহ্ম পরমং যাতি নান্যেন হেতুনা।’’

মানুষ ব্রহ্ম হয় আর তার প্রমাণ দেয় মানুষ তথা জগৎ। ঋষিরা জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা ঈশ্বরের কল্পনা করেননি। তারা বলেছেন, সম্যক প্রসন্নতা প্রাপ্ত একজন মানুষের ভিতর আত্মার সৃষ্টি, আত্মিক জগতের স্থিতি ও শেষে নির্গুণে লয় হলে তার পূর্ণ স্বরূপ জ্ঞান হয়। ঐ মানুষকে ভিতরে প্রাণসূর্যের মধ্যে দেখে বহু মানুষ বলে, ‘‘যোসাবসৌ পুরুষঃ সোহম’স্মি।’’ ঐ পুরুষ আর আমি এক। ঐ পুরুষের রূপই আত্মার কল্যাণতম রূপ। সে মানুষ

তখন বলতে পারে, ‘‘আমি ব্রহ্ম।’’ শুধু তাই নয়, সে দেখে প্রতিটি মানুষই ব্রহ্ম। ঠাকুরের ভাষায় - ‘‘তুমি জান বা না জান তুমি রাম। তোমরা এতগুলি বসে আছ, আমি দেখছি - এক রামই এতগুলি হয়ে রয়েছে।’’ একদিন ঠাকুর নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ‘‘এখান থেকেই সব হচ্চে যাচ্ছে, বুঝতে পারছিস?’’ ঠাকুরের একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে এ যুগে আত্মা তথা জগৎ চৈতন্যের নির্যাস তার দেহে সংকলিত হয়েছে। তার দেহে দেবত্বের সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটেছে, তাই সে যুগে অন্য সকল দেহে দেবত্ব প্রকাশের একমাত্র উৎস তিনিই।

স্বামীজী বললেন, ঈশ্বরত্ব মানুষের একটি অবস্থা, সেই অবস্থায় মানুষটিই ঈশ্বর। এই মানব-ঈশ্বর একজন ব্যক্তি মানব আবার আত্মিকে তিনি সব মানুষের সমষ্টি। Ishwara is the sum total of individuals yet he is an individual. এ তো বেদেরই কথা।

রবীন্দ্রনাথ ‘‘মানুষের ধর্ম’’ বইতে লিখলেন, ‘‘আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে ‘‘সদাজনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।’’ তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম করে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়। সেই মানবকেই মানুষ নানা নামে পূজা করেছে ...।’’

এযুগে জীবনকৃষ্ণ বললেন, ভগবান কি জানিস বাবা, ভগবান হল - "collected life power of whole human race." আর এই মনুষ্যজাতির প্রাণশক্তির নির্যাস সংকলিত হয় একটি মানুষে। মানুষ ছাড়া আর কিছু ধরবি না, Abstract কিছু নিবি না। ঠাকুরও বলেছেন, ‘‘হাতী এত বড় জন্তু কিন্তু ঈশ্বরচিন্তা করতে পারে না। ঈশ্বরতত্ত্ব যদি খোঁজ তো মানুষের মধ্যে খুঁজবে। মানুষে তার বেশি প্রকাশ’’।

সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। সাধক কবি চণ্ডীদাসের এই বাণী আজও উচ্চারিত হয় কিন্তু তার মর্মোপলব্ধি না হওয়ায় কেউ নাস্তিকতার বড়াই করেন, কেউ বা বলেন, ‘‘আমায় একটু জায়গা দাও মায়ের মন্দিরে বসি।’’ তাই এদেশে রামকৃষ্ণ অনুধ্যানের চেয়ে কালীপূজার ধূম বেশি।

রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক ভাবনার পরিণত রূপটি নিয়ে অনুশীলন হয়

না বললেই চলে। বিবেকানন্দকে শুধু সমাজসেবী ও দেশপ্রেমী হিসাবে দেখা হয়। আধ্যাত্মিকতায় তার নতুন অবদান নিয়ে মানুষ বিশেষ ভাবে না। তিনি বললেন, ভারতের ভবিষ্যৎ ধর্ম হবে বেদান্ত। অর্থাৎ একজনকে কেন্দ্র করে আত্মিক একত্ব তথা অদ্বৈতের উপলব্ধিই ধর্ম। এদিকে তার অনুগামীরা সাড়ম্বরে বেলুড় মঠের দুর্গাপূজার Live Telecast করে জানিয়ে দিচ্ছেন তারা বৈদিক সত্য থেকে বহু দূরে অবস্থান করছেন।

সুখের বিষয়, শ্রীজীবনকৃষ্ণের চিন্ময় রূপ মানুষের অন্তরে জেগে উঠে নানান আত্মিক লীলা প্রদর্শনে বেশ কিছু সাধারণ মানুষের অধ্যাত্ম চেতনার জাগরণ ঘটছে। তারা সংস্কার মুক্ত হচ্ছে, উপলব্ধি করছে ঈশ্বর কোন কল্পিত বস্তু নয়, একজন মানুষ ঈশ্বর হয় আর তাঁকে অন্তরে দেখে তার ঈশ্বরত্ব লাভ করে বহু মানুষ বোঝে মনুষ্য জাতির সাথে আত্মিক একত্ব উপলব্ধি-ই ধর্ম। তাদের কিছু দর্শন ও অনুভূতি নিয়ে এই পত্রিকা সাজানো হল॥

২৬ কার্তিক, ১৪২০

প্রথম আলো

* স্বপ্নে দেখলাম - আমি, বাবা ও মামনি বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ বাবা একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, এটা নতুন হয়েছে। আমাদেরকে একবার এর ভিতর যেতে হবে। আমরা দোকানের ভিতর গেলাম। একটি গদির উপরে ক্যাশ বাক্সের পিছনে একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক বসেছিলেন। ভদ্রলোকের মাথায় ছোট করে ছাঁটা কাঁচা পাকা চুল। বাবা আমাকে ঐ ভদ্রলোককে প্রণাম করতে বললেন। আমি প্রণাম করতে উদ্যত হতেই মনে হল আমার হাতে কিছু একটা লেগে আছে তাই প্রণামের আগে হাত ধোওয়া প্রয়োজন। এমন সময় মিষ্টির দোকানের এক কর্মচারী আমাকে বলল, তুমি আগে প্রণাম করে নাও তারপর হাত ধোবে। এমনিতেও তুমি ব্রাহ্মণ আর উনি ময়রা তো! এ ধরণের জাতপাতমূলক কথা শুনে মনে খটকা লাগলেও হাত বাড়িয়ে ওনার পা স্পর্শ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতে মিষ্টির রস জাতীয় কিছু লাগল যা ঐ

ভদ্রলোকের পায়ে লেগেছিল। উনিও আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। স্বপ্ন ভাঙার পর জীবনকৃষ্ণের ছবি দেখে বুঝলাম স্বপ্নে দেখা ঐ ভদ্রলোক জীবনকৃষ্ণই ছিলেন।

- স্বস্তিকা চ্যাটার্জী (চারুপল্লী)।

ব্যাখ্যা ঃ সংস্কারমুক্ত হয়ে তাঁকে পাওয়া নয়, তাঁর কৃপায় তাঁর সত্তা পেয়ে মানুষ সংস্কার মুক্ত হয় ও চৈতন্যের মিষ্টরস আস্বাদন করে ।

* গতকাল (১৪.০৭.২০১৩) আমার দোকানের সামনে কলকাতার এক মাসীমা (বিভা দাস) হঠাৎ একটা ফোন ধরে ‘জয় জীবনকৃষ্ণ’ বলে কথা শুরু করলেন। কথা শেষ হলে আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি জয় শ্রীকৃষ্ণ না বলে জয় জীবনকৃষ্ণ বললেন কেন? উনি যা বললেন তাতে অবাক হলাম। দোকানে বসিয়ে আরও কিছু শুনতে চাইলাম জীবনকৃষ্ণ সম্বন্ধে। ওনার মেয়ে ও নাতির কেনাকাটা হলে চলে গেলেন। ভাবতে লাগলাম এও কী সম্ভব? এ যুগে ভগবান একজন মানুষের মধ্যে মূর্ত হয়ে সবার অন্তরে চিন্ময় রূপে প্রকাশ হচ্ছেন! যাইহোক, রাত্রে স্বপ্নে দেখলাম - সূর্য উঠছে, তার ভিতর বলিষ্ঠ দেহী একজন মানুষ। মাথা তার নেড়া - খালি গা - ধুতি পরে আছেন। তিনি বললেন, আমি উঠেছি, তুই এখনও ঘুমিয়ে আছিস? ওঠ। আমি তোকে তেজ দান করব। ... ঘুম ভাঙল। ঐ মাসীমাকে ফোনে স্বপ্নটা বললাম। উনি বললেন, আমি নাকি জীবনকৃষ্ণকে দেখেছি। ওনাকে বহু মানুষ স্বপ্নে সূর্যের মধ্যে দেখে। বেদ মতে সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষই পরমব্রহ্ম - অখণ্ড চৈতন্য। জীবনে এ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। - রাজকুমার কর (চন্দন), (দীঘা, মেদিনীপুর)।

* স্বপ্নে দেখছি (১৩.০৯.২০১৩) - একটা চেয়ারে বসে আছি। পাশেই একজন অপরিচিত ব্যক্তি আর একটা চেয়ারে বসে। হঠাৎ জীবনকৃষ্ণ উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন - ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ - মানে কী জানিস? এর মানে হল , আমি জীবনকৃষ্ণ। এই বলে তিনি আমার পিছনে গিয়ে বসলেন। ঘুম ভাঙল। - নীলাদ্রি চ্যাটার্জী (অযোধ্যা, বর্ধমান)।

ব্যাখ্যা ঃ "জীবনকৃষ্ণ" বললে 'ব্রহ্ম'-কে ঠিক মতো বোঝানো যায়। অন্যথায় ব্রহ্ম একটি abstract idea (বিমূর্ত ভাবনা) হয়ে যায়।

* দেখছি - একটা পুকুরের জলে তলিয়ে যাচ্ছি। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক খালি গায়ে - ধুতি পরে - মাথায় কদমছাঁট কাঁচাপাকা চুল - মুখের চিবুকে অল্প দাড়ি - হাত বাড়িয়ে বলল, আমার হাত ধরো। উনি আমাকে জলের উপর তুলে দিলেন কিন্তু তখন ওনাকে আর দেখতে পাচ্ছি না। তাকিয়ে দেখি পাড়ে স্নেহময়দা দাঁড়িয়ে। তিনি বললেন, এসো, এসো, তাড়াতাড়ি যেতে হবে। ... জীবনকৃষ্ণের ফটো দেখে মনে হল আমি ওনাকেই স্বপ্নে দেখেছি।

- বুলবুল চ্যাটার্জী (অবিনাশপুর)।

ব্যাখ্যা ঃ পুকুর - সহস্রার। সেখানে পরমপুরুষের দেখা পেলেন। তিনিই জীবের ত্রাণকর্তা। তাঁর স্থূল দেহ এখন আর নেই, তাই কার মাধ্যমে তাঁর কথা জানতে পারবেন দ্রষ্টা তাও দেখিয়ে দিলেন।

* গত ২৫/০৯/২০১৩-র রাত্রে স্বপ্নে দেখছি - তাজমহলের কাছে দাঁড়িয়ে আছি। অন্ধকার। তাজমহলের শুধু Outline (আউটলাইন)-টা দেখা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর সেটা জীবনকৃষ্ণের Outline হয়ে গেল। "ধর্ম ও অনুভূতি" বই-এর প্রচ্ছদে যেমন আছে ঠিক তেমনি। ... ঘুম ভাঙল। ঐ রাত্রেই আবার স্বপ্নে দেখছি - একটা বিশাল বড় বাড়ির ভিতর বসে আছি। আমার হাতে একটা খাতা আর কলম রয়েছে। আমি যেন কী লিখতে চাইছি। হঠাৎ আমার সামনে জীবনকৃষ্ণ উপস্থিত হলেন। তিনি এসেই খাতা আর কলমটা আমার হাত থেকে নিয়ে ইংরাজীতে কয়েকটা লাইন লিখলেন। ... ঘুম ভাঙল।

- দেবাশিস দালাল (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যা ঃ তাজমহল - ভালবাসার অনুপম স্মৃতি সৌধ - মনুষ্যজাতির প্রতি শ্রীজীবনকৃষ্ণের প্রেমের মূর্ত রূপ হিসাবে তাঁর চিন্ময় রূপ ফুটে ওঠে। পরে দ্রষ্টার ভিতরে নিজের বিশ্বজনীন ভাবধারা ফুটিয়ে তোলেন তাই আন্তর্জাতিক ভাষা (Universal language) ইংরাজীতে প্রাণের কথা লিখে দেন।

* স্বপ্নে দেখছি - একজন অজানা ভদ্রলোক আমাকে একটা অটোতে উঠতে বললেন। তারপর অটো চালিয়ে মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে রাস্তা দিয়ে সাঁই সাঁই করে গাড়ি ছুটিয়ে নিয়ে চলেছেন। ভয় পাচ্ছি না বরং খুব আনন্দ হচ্ছে। ... ঘুম ভাঙল।

এর কিছুদিন পর বাগুইহাটিতে নন্দীদির বাড়িতে পাঠে "শ্রীজীবনকৃষ্ণ" বইতে জীবনকৃষ্ণের ছবি দেখে চমকে উঠলাম। বুঝলাম স্বপ্নের ঐ অটো-চালক জীবনকৃষ্ণই ছিলেন। মন আনন্দে ভরে উঠল।

- দীপালি বাগচী (বহরমপুর)।

ব্যাখ্যা ঃ পরমপুরুষ ভিতরে প্রকাশ হলে আপনা হতে (অটোমেটিক) চৈতন্য ঊর্ধ্বগতি লাভ করে।

* স্বপ্ন দেখছি (সেপ্টেম্বর ২০১৩) - কম্পিউটারের সামনে বসে আছি। উদ্দেশ্য ইণ্টারনেটে ওয়ান্‌নেস্ ওয়েবসাইট খুলে ওখান থেকে জীবনকৃষ্ণের ছবি ডাউনলোড করা। কিন্তু হঠাৎ হ্যাঙ (Hang) হয়ে গেল। স্ক্রিন সম্পূর্ণ কালো (black) হয়ে গেল। মন খুব খারাপ। কিন্তু কী আশ্চর্য! ঐ কালো স্ক্রিনের মধ্যে হঠাৎ উজ্জ্বল জীবনকৃষ্ণের আউটলাইন ফুটে উঠল। গভীর আনন্দে ঘুম ভাঙল।

- চিত্ত রক্ষিত (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যা ঃ কম্পিউটার হ্যাং করল - দেহ নিষ্ক্রিয় হল - সমাধি হল। চেষ্টা করে নয়, আপনা হতে জীবনকৃষ্ণের প্রকাশ হল। জীবনকৃষ্ণকে প্রথম দেখলে আউটলাইন জানা যায়। তাকে বহুবার দেখে দীর্ঘ অনুশীলনের পর একটু একটু করে তার পরিচয় স্পষ্ট হতে থাকে।

* স্বপ্নে দেখছি (০৮/০৮/১৩) - ইলামবাজারের 'প্রয়োজনী হার্ডওয়্যার' দোকানের সামনে জীবনকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন। জয়দেবের দিক থেকে যে সব বাসগুলো আসছে সব বাসের একপাশের চাকাগুলোর হাওয়া কমে যাচ্ছে আর বাসগুলো জীবনকৃষ্ণের দিকে হেলে যাচ্ছে। ঐ অবস্থায় বাসগুলো পেরিয়ে

যাচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে ব্যাপারটা দেখতে দেখতে ঘুম ভাঙল।

- সুদীপ্ত ভট্টাচার্য (ঘুড়িষা, বীরভূম)।

ব্যাখ্যা ঃ আত্মিক জগতে জীবনকৃষ্ণ এতই ওজনদার (হেভিওয়েট) মানুষ যে লোকভর্তি বাসও তাঁর দিকে হেলে যাচ্ছে। এতে বোঝাচ্ছে যে তিনি জগদ্‌গুরু। হাওয়া কমে যাচ্ছে - উচ্চতা কমে যাচ্ছে বাসের, তাঁর সান্নিধ্যলাভে অহং কমে যায়।

* সন্তুকে একদিন বললাম, কয়েকজন মানুষ জীবনকৃষ্ণকে দেখলে তো হবে না, সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কোন লোক কি বলছে যে তার স্বরূপ জীবনকৃষ্ণ? আমেরিকার কোন লোক কি বলছে একথা? কয়েকদিন পর স্বপ্নে দেখলাম (August 2013) - একজন আমেরিকান সারা গায়ে বাঘের ট্যাটু (Tatoo) আঁকা (যার কথা paper-এ আগে পড়েছি) আমার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছে, ''আমি জীবনকৃষ্ণ।'' কথাটা বহুবার আমাকে বলল। হতবাক হয়ে ঐ কথা শুনতে শুনতে আমার ঘুম ভাঙল। বুঝলাম প্রতিটি মানুষই যে স্বরূপত জীবনকৃষ্ণ একথা সত্য।

- চন্দন চ্যাটার্জী (অযোধ্যা, বর্ধমান)।

* দেখছি (২২/০৮/১৩) - পুকুরের জল থেকে একটা নীল রঙের মাছকে লেজে ধরে টেনে তুললাম। মাছটাকে হাতে ধরে উপরের দিকে যেই তাকিয়েছি, দেখছি সামনে বিরাট বড় জীবনকৃষ্ণের ছবি। অমরেশ স্যারের বাড়িতে এই ছবিটা আছে। জীবনকৃষ্ণের ফটোর দিকে তাকানোর সাথে সাথে মাছটা হাত থেকে বুকের মধ্যে পড়ে সেখানেই মিলিয়ে গেল। ...

- অর্পণ পাল (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যা ঃ মাছ - আত্মা। নীল রং সর্বজনীনতার প্রতীক। নীল মাছ - যিনি সকলের অন্তরাত্মা তিনি শ্রী জীবনকৃষ্ণ রূপে প্রকাশ পান। বুকের মধ্যে মিলিয়ে গেল– তিনি আমারও অন্তরাত্মা।

* গত সেপ্টেম্বর মাসে এক রাত্রে স্বপ্নে দেখছি - অমরেশ স্যারের

বাড়িতে দোতলায় রয়েছি। মনে হচ্ছে দুর্গাপূজার নবমীর দিন। সঙ্গে বেশ কিছু বন্ধু রয়েছে। অমরেশ স্যারও আছে। আমাদের সামনে একটা সাদা মূর্তি রয়েছে। কার মূর্তি বুঝতে পারছি না। পাঠ হচ্ছে। হঠাৎ দেখছি মূর্তিটা জীবন্ত মানুষ হয়ে গেল। নেড়া মাথা, খালি গা, ধুতি পরে। স্যার জিজ্ঞাসা করলেন, চিনতে পারছিস ইনি কে? ঘুম ভাঙার পর বুঝতে পারলাম আমি জীবনকৃষ্ণকেই দেখেছি। এরপর জানলাম সত্যি সত্যিই নবমীর দিন স্যারের ঘরে বিশেষ পাঠের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই পাঠে যোগ দিয়ে জীবনকৃষ্ণ সম্বন্ধে ধারণা আমার আরও স্পষ্ট হয়েছে। - শুভজিৎ দাস (ইলামবাজার)।

* গত ১৯শে জুন ২০১৩ রাত্রে স্বপ্ন দেখছি - মাঠে ক্রিকেট খেলছি। হঠাৎ মাথা ন্যাড়া ধুতি পরা একটা লোক কাছে এসে বলছে তুই পাঠে যাসনি কেন? মাঠে খেলার চেয়ে পাঠে যাওয়া ভাল। এবার থেকে পাঠে যাবি। ... ঘুম ভাঙার পর মনে পড়ল, সত্যিই তো, দু'সপ্তাহ আমি পাঠে যাই নি। আরও বুঝলাম স্বপ্নদৃষ্ট ঐ পুরুষ স্বয়ং জীবনকৃষ্ণ। স্বপ্নে শ্রীজীবনকৃষ্ণ আমাকে এই প্রথম দেখা দিলেন। - রজনী দাস বৈরাগ্য (ইলামবাজার)।

* বোলপুরে গত ৭ই জ্যৈষ্ঠের অনুষ্ঠানে আমার যাওয়া হয়নি। ঐ রাত্রে স্বপ্নে দেখছি - অনুষ্ঠানে রয়েছি। অসংখ্য লোক একদিক ঘেরা একটা প্যাণ্ডেলের ভিতর বসে পাঠ শুনছে আর স্বয়ং জীবনকৃষ্ণ একটা উঁচু জায়গায় বসে পাঠ করছেন। খুব আনন্দ হল। ... ঘুম ভাঙল। জীবনকৃষ্ণকে এই প্রথম আমি স্বপ্নে দেখলাম। - চিন্তা ভৌমিক (ইলামবাজার)।

* গত ১৭ই মে, ২০১৩ রাত্রে স্বপ্ন দেখছি - জীবনকৃষ্ণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমি একপাশে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখের একটা দিক দেখতে পাচ্ছি। তাঁর একপাশের চোখ স্পষ্ট দেখা গেল। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম চোখটার আকৃতি সাধারণ নয়, পুরো গোল। ... ঘুম ভাঙতেই মনে পড়ল গোলক আকৃতির জ্ঞান চক্ষু দর্শন হয়েছিল শ্রীজীবনকৃষ্ণের। এখন তিনিই জ্ঞানের ঘন

মূর্তি হয়ে গেছেন। খুব আনন্দ হতে লাগল সারা শরীরে।

- সবিতা পাল (ইলামবাজার)।

* আমার স্ত্রী পাঠে যায়। ওখানে নাকি অনেকে একজন মানুষকে স্বপ্নে দেখে। তাঁকে ওরা ভগবান বলে। আমার স্ত্রী-ও তাঁকে দেখেছেন স্বপ্নে। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না। নিজে যদি দেখি এবং স্বপ্নেই যদি তিনি বলেন, আমি জীবনকৃষ্ণ - তবে তাকে মানব। স্নেহময়বাবুর সাথে এ নিয়ে অনেক কথা হল। উনি বললেন, আপনি প্রমাণ পাবেন। কিছুদিন পর দাঁত তোলাতে গেছি ডাক্তারখানায়। মাড়িতে ইঞ্জেকসন দেওয়া হয়ে গেছে। হঠাৎ ঐ ঘরে এক ভদ্রলোক ঢুকলেন - মাঝবয়সী - ধুতি পরে, মাথায় ছোট ছোট চুল - জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি জীবনকৃষ্ণ? উনি বললেন, হ্যাঁ। বললাম, আপনি please চলে যাবেন না। আপনার কাছে আমার কিছু জানার আছে। দাঁত তোলা হয়ে যাক। তারপর কথা বলব। উনি বললেন, আমিও এখন ব্যস্ত। তোমার ডাক্তারের দেহে ঢুকব। এই বলে অদৃশ্য হয়ে একটা সাদা জামা হয়ে ডাক্তারের গায়ে পড়ে তার পোষাকের সাথে এক হয়ে গেলেন। আনন্দে বিস্ময়ে হতবাক আমি। এরপর দুটি দাঁত তোলা হল নির্বিঘ্নে। তৃতীয় দাঁত তোলার সময় বেশ ব্যথা হল। ... বাড়ি ফিরে ভাবতে লাগলাম, এ কী দেখলাম! জীবনকৃষ্ণকে খালি চোখে দিনের আলোয় দেখে আমার সব সংশয় ঘুচল। কিন্তু ভগবানকে দেখার পর দাঁতে এত ব্যথা হল কেন? ফোনেই স্নেহময় বাবুকে প্রশ্নটা করলাম। উনি বললেন, ব্যথা দিয়ে ভগবান মনটাকে দেহে নামিয়ে আনলেন। অন্যথায় হঠাৎ করে এত বড় স্থূলদর্শনের পর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটার সম্ভাবনা থাকে। যুক্তিটা মনে ধরল। - স্বপন ভট্টাচার্য (বাগুইহাটি, কলকাতা)।

স্বপন মাধুরী

কোচ

* দেখছি (১৩.০৩.১৩) - অমরেশ স্যারের বাড়িটার মুখ বদলে গেছে। পূর্বদিকে ছিল, এখন পশ্চিম দিকে হয়েছে। আমি টিউশন পড়ে বেরোচ্ছি -

দেখি সোজা রাস্তা চলে গেছে অমরেশ স্যারের বাড়িতে। এক ভদ্রলোক - যার বুকে লেখা - Super Teacher - তিনি আমাকে আঙুল দিয়ে অমরেশ স্যারের বাড়িটা দেখিয়ে দিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ অমরেশ স্যারের বাড়ি - পাঠচক্র। সেখানে পরাবিদ্যা লাভ করার নির্দেশ দিচ্ছেন ঈশ্বর স্বয়ং - Super Teacher.

দিন পনেরো পর আবার দেখছি - মাঠে ফুটবল খেলছি। জীবনকৃষ্ণ এলেন। বললেন, 'আমি কোচ। তোকে খেলা শেখাব'। এই বলে আমার বুকে হাত ঢুকিয়ে আমারই মত একটি ছেলেকে বার করলেন। মনে হচ্ছে এ আমার আত্মা। তিনি আমাকে বললেন, তুই এখানে বসে দ্যাখ। আমি অবাক হয়ে দেখছি তিনি ঐ ছেলেটিকে খেলা শেখাতে লাগলেন। কী করে কর্ণার কিক করে গোল করতে হয় দেখাচ্ছেন। ... ঘুম ভাঙল।

- চিত্তরঞ্জন রক্ষিত (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যা ঃ পরমাত্মা নিষ্ক্রিয় নন। তিনি দেহস্থ আত্মার জাগরণ ঘটিয়ে দেহীকে আত্মিক লীলাখেলা দেখান।

* বাবা মারা যাওয়ার পর কয়েকটা দিন মন খুবই খারাপ ছিল। ঐ সময় এক রাত্রে স্বপ্নে দেখছি - বাবা একটা সুন্দর ফুলের বাগানে রয়েছে। আমাকে দেখেই বলল, 'সাগর (ডাক নাম) চিন্তা করিস না। আমি তো তোর মধ্যেই আছি। আমাকে আলাদা করে দেখিস না। বিচ্ছিন্ন করে দেখলে দুঃখ পাবি, সকলের সাথে এক করে দেখবি।' ... ঘুম ভাঙল। মনের অস্থিরতা কমে গেল। - সোহেল আখতার মোল্লা (ইলামবাজার)।

পাখা রাখ

* গত ২৮শে ভাদ্র (১৪/০৯/১৩) রাত্রে একটু বেশি গরম পড়েছিল। বিছানায় শুয়ে হাত পাখা নিয়ে হাওয়া করছিলাম। একটু তন্দ্রা আসতেই দেখছি - জীবনকৃষ্ণ পাশে এসে দাঁড়ালেন। আনন্দে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। উনি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বলছেন, 'পাখাটা আমায় দাও।' আমি তাঁর হাতে আমার

হাতের পাখাটা দিয়ে দিলাম। আমার তন্দ্রা ভেঙে গেল।

- সাধনা গায়েন (সুলতানপুর)।

ব্যাখ্যা ঃ দক্ষিণা বাতাস বইলে মানুষ হাতের পাখাখানা নামিয়ে রাখে। ঈশ্বরের কৃপা বায়ু বইলেও সাধারণ মানুষ সংস্কারের জন্য বৈধী ধর্ম ছাড়তে পারে না। তাই শ্রীজীবনকৃষ্ণ ভিতরে দেখা দিয়ে সংস্কার দূর করে দিচ্ছেন যাতে বৈধী ধর্ম সহজে ত্যাগ হয়ে যায় - সত্যের ধারণা হয়।

* দেখছি (২২/০৮/১৩) - রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। মনে হল হেঁটে গন্তব্যে যেতে অনেক সময় লাগবে। তার চেয়ে বাসে যাই। একটু পিছনে হেঁটে বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়ালাম। বাস এল। কিন্তু দেখি সেটা মেটাডোর ভ্যান। ড্রাইভারের পাশে জীবনকৃষ্ণের ডেড বডি শোয়ানো। একটা বাচ্চা ছেলে ছুটে এল। জানলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ডেড বডির কানে হাত দিয়ে কী দেখল এবং নিশ্চিত হল যে দেহটা জীবনকৃষ্ণের। তখন জানলা দিয়ে ও ঢুকে গিয়ে ছোট্টটি হয়ে জীবনকৃষ্ণের মাথা ও কাঁধের মধ্যে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ল। যেন কানের কাছেই থাকতে চাইছে আনন্দের সঙ্গে। ড্রাইভারের কথায় পিছনের সীটে আমি বসলাম। গাড়ি ছাড়ল। ঘুম ভাঙল। - স্নেহময় গাঙ্গুলী (চারুপল্লী)।

ব্যাখ্যা ঃ ছোট্ট ও গুটিসুটি মেরে শোওয়া - যেন গর্ভাবস্থায় থাকা - অনেকটা কানের আকৃতি - নির্গুণের সাথে যুক্ত হয়ে থাকা। মৃত জীবনকৃষ্ণ - নির্গুণের মূর্ত রূপ। কান দেখা - অনেকের দর্শন অনুভূতি শুনে এই সত্য যাচাই করা ও নির্গুণের সাথে যুক্ত হয়ে আত্মিকে এগোন।

ডেঁও পিঁপড়ে

* দেখছি - দুটি ছেলে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে ছুটছে। আমি কাছে গিয়ে দেখি একজনের জিভে একটি ও অপরজনের জিভে দুটি ডেঁও পিঁপড়ে কামড়ে ধরে রয়েছে। আমি পিঁপড়ে দুটি ছাড়িয়ে দিতেই ওরা চুপ করল। ... - চন্দনা নস্কর (সখেরবাজার)।

ব্যাখ্যা ঃ শুক, নারদ এরা ডেঁও পিঁপড়ে - শ্রীরামকৃষ্ণ। ডেঁও পিঁপড়ে - পৌরাণিক চরিত্র - পুরাণের সংস্কার। এই সংস্কার মানুষকে কাঁদাচ্ছে। কেননা পুরাণ শিখিয়েছে মন্দিরে ভগবান। দেহেতে ভগবান, একথা না জানা পর্যন্ত মানুষের কান্না থামে না।

* দেখছি - শিবমন্দিরের শিব ঠাকুর ভূত হয়ে গেছে। একটা বড় গাছকে আঙুল দিয়ে মাটিতে শুইয়ে দিচ্ছে। পরক্ষণে সোজা করে দিচ্ছে। এগিয়ে গেলাম, দেখি বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আকাশে। সেই বিদ্যুৎ থেকে একটুকরো বরফ পড়ল। মা সেটা ধরল ও আমাকে খেতে দিল। শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল ঐ বরফ খেয়ে। ... ঘুম ভাঙল। - শুভাশিস শেঠ (সখেরবাজার, বয়স - ৫)।

ব্যাখ্যা ঃ পৌরাণিক শিব - মন্দিরের দেবতা - ভয় দেখাতে পারে কিন্তু শান্তি দিতে পারে না। প্রকৃত শিব - পরমাত্মা - প্রতীকে বজ্র বিদ্যুৎ - দর্শন হলে দেহ মন শান্ত হয় - অবশ্য মা ধরে দিলে অর্থাৎ আদ্যাশক্তি প্রসন্ন হলে ধারণা হয়।

* দেখছি - আমাদের ঘরে ধুতি পাঞ্জাবী পরে একটা ভিখারী এসেছে। দাদু ওকে পয়সা দেয়। ভিখারীটা ঘরের ভিতর ঢুকে গেল। তারপর হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। - অর্পণ শেঠ (সখেরবাজার, বয়স - ৬)।

ব্যাখ্যা ঃ ভিখারী - ভালবাসার ভিখারী - শ্রীভগবান। তিনি ঘরের ভিতর ঢুকে অদৃশ্য হলেন - দেহের ভিতর লীন হয়ে বোঝালেন সেখান থেকেই জেগে উঠেছিলেন।

সমান্তরাল

* দেখছি (১১.০৯.১৩) - আমার বাবা আমার মামাকে একেবারে দু'টুকরো করে কেটে ফেলেছে। মামা মারা গেছে। কিন্তু বাবার উপর রাগ হচ্ছে না বা মামার জন্য খুব দুঃখও হচ্ছে না। ...

- স্বস্তিকা চ্যাটার্জী (চারুপল্লী)।

ব্যাখ্যা ঃ বাবা - আর্যকৃষ্টির প্রতীক। মামা - অনার্যকৃষ্টি। ভিতর থেকে অনার্য

কৃষ্টির সংস্কার ঘুচে যাচ্ছে দ্রষ্টার।

* দেখছি (১১.০৯.১৩) - দুটো বড় সাপ পাশাপাশি চলেছে - একেবারে সমান্তরালভাবে। মনে হচ্ছে কিছুতেই এদের যাত্রাপথ মিলবে না। হঠাৎ মনে হল এরা আসলে সাপ নয় - ব্যাখ্যাটা স্নেহময়কে জিজ্ঞাসা করতে হবে। ... ঘুম ভাঙল।

- কৃষ্ণসাধন পাল (বোলপুর)।

ব্যাখ্যা ঃ দুটি সাপ - আত্মিক জগৎ ও ব্যবহারিক জগৎ। আত্মিক জগতের সাথে ব্যবহারিক জগতের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। আত্মিকে অনেক পেয়েও ব্যবহারিকে বহু দুঃখ-কষ্ট (suffering) থাকে মানুষের।

চারসের ঘটি

* দেখছি (৩১.০৭.১৩) - গোয়ালা দুধ দিয়ে যায়নি। আগের দিনের অল্প দুধ রয়েছে বাড়িতে। তাতে সরও পড়েছে। স্বামী দুধ চাইলে ঐ দুধ দিলাম, সঙ্গে সরও। কিন্তু লক্ষ্য করলাম দুধ বা সর শেষ হচ্ছে না। বাটিতে আগের মতোই সর ও দুধ থেকে গেল। ...

- করবী রুজ (বোলপুর)।

ব্যাখ্যা ঃ এক সের ঘটিতে চার সের দুধ ধরে না বটে কিন্তু ভগবানের কৃপা হলে ঘটিটি অক্ষয় ঘটি হয়ে যায়।

* দেখছি (১৭.০৯.১৩) - এক ঝাঁক প্রজাপতি আমাদের বাড়িতে ঢুকল। কিন্তু লক্ষ্য করলাম যখন বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন একটা মাত্র প্রজাপতি। খুব অবাক হলাম। - পায়েল রুজ (বোলপুর)।

ব্যাখ্যা ঃ পাঠে বহু মানুষের আগমন হচ্ছে তাদের নিজস্ব বৈচিত্র্য নিয়ে কিন্তু পাঠ শেষে ফিরছে তাদের নিজস্ব স্বাতন্ত্র ত্যাগ করে, আত্মিকে বহু নেই, আছে এক - এই ধারণা নিয়ে।

সংগোপনে

* গত ৩১.০৭.২০১৩ তারিখ রাত্রে স্বপ্নে দেখছি - ধান বিক্রি করলাম বরকত-কে। ও টাকা দিল। কিছু টাকার নোটে মহাত্মা গান্ধীর ছবির বদলে রয়েছে শ্রী জীবনকৃষ্ণের ছবি। বলল, এগুলো আগে খরচ করবে। আমি বললাম, তা কেন? এগুলো আমি যত্ন করে রেখে দেব - এগুলোতে আমার ঠাকুরের ছবি আছে। - তমালকৃষ্ণ ঘোষ (চারুপল্লী)।

ব্যাখ্যা ঃ আত্মিক ঐশ্বর্যের কথা মানুষকে বলার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতে বলছে এই স্বপ্নে। কিন্তু দ্রষ্টা ব্যক্তিগতভাবে তা উপভোগ করতে চান।

* গত ২২-০৭-২০১৩-য় স্কুল যাওয়ার আগে একটু শুয়েছি। হঠাৎ তন্দ্রার মধ্যে দেখছি - আমার পাশে খাটে জীবনকৃষ্ণ শুয়ে আছেন। আমি বসে ওনার পা টিপতে লাগলাম। ... কয়েক সেকেণ্ড মাত্র, পরেই সংবিৎ ফিরে এল।

- অর্ণব চ্যাটার্জী (গড়গড়িয়া)।

ব্যাখ্যা ঃ জীবনকৃষ্ণ - দ্রষ্টার দেবত্ব। পা টেপা - অনুশীলন করতে বলছে দ্রষ্টাকে, তাহলে তার দেবত্বের বিকাশ অধিক হবে।

* স্বপ্নে দেখছি (০৫/১০/১৩) - গ্রামে কোন উৎসব চলছে। প্রচুর লোকের সমাগম হয়েছে। আমি জীবনকৃষ্ণের সাথে এক জায়গায় খেতে বসেছি। আমাদের পাশে একটি অপরিচিত ছেলে বসেছে। অপূর্ব সুন্দর তার চেহারা। ওকে সবাই পাপাই বলে ডাকছে। খাওয়া শেষ হলে জীবনকৃষ্ণ উঠে গেলেন। যাবার সময় আমার দিকে পিছন ফিরে হাসলেন। অপূর্ব সেই হাসি দেখতে দেখতে ঘুম ভাঙল। - বাসন্তী চ্যাটার্জী (সুলতানপুর)।

ভাগ্যলিপি

* দেখছি (জুন, ২০১৩) - আমি মারা গেছি। কাছে জীবনকৃষ্ণ বসে আছেন। উনি বুক চিরে দিলেন যেভাবে হনুমান বুক চিরে তার বুকের ভিতর রাম-সীতাকে দেখিয়ে ছিল। আমি জীবনকৃষ্ণের বুকের ভিতর ঢুকে গেলাম। ...

- মিঠু বারিক (আমতলা, কণ্যানগর)।

ব্যাখ্যা ঃ এতদিন ভক্ত ভগবানের চিন্তা করেছে, এ যুগে ভগবানই মানুষের কথা

ভাবছেন ও তার সাথে এক করে নিচ্ছেন।

* দেখছি (০৬.০৬.১৩) - গঙ্গা চান করে উঠে দুহাত জোড় করে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করলাম। তারপর লক্ষ্য করলাম আমার হাত দুটো বেশ সাদা (ফর্সা) হয়ে গেছে। বাঁ হাতের চেটোর রেখাগুলি রামকৃষ্ণের ও ডানহাতের রেখাগুলি জীবনকৃষ্ণের আউটলাইন তৈরী করেছে। আমার স্বামীকে দেখালাম হাতটা। ও বলল, বোধহয় স্টিকার (sticker) লাগানো আছে। আমি বললাম, না, তুমি ভাল করে দ্যাখো। ... ঘুম ভাঙল।

- পুতুল বারিক (ঘোষ), (আমতলা, কন্যানগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা)।

ব্যাখ্যা ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীজীবনকৃষ্ণের মধ্যে যে অখণ্ড চৈতন্যের প্রকাশ তারই পরিচয় জানার পথে দ্রষ্টার জীবন অতিবাহিত হবে - এটাই তার ভাগ্যলিপি।

মৌমাছি

* দেখছি (২৪.০৫.১৩) - বাড়ির বাইরের দরজার কাছে দুটি বেলী ফুল ফুটেছে। তাতে দুটি মৌমাছি এসে বসেছে। ফুল দুটি যেমন সুন্দর, মৌমাছি দুটিও ভারী সুন্দর। লক্ষ্য করে দেখলাম, মৌমাছি দুটির মুখগুলি মানুষের মত - ঠিক জীবনকৃষ্ণের মত। চমকে উঠলাম। ... ঘুম ভাঙল।

- সবিতা ঘোষ (চারুপল্লী)।

ব্যাখ্যা ঃ জীবনকৃষ্ণ লীলার দুটি পর্যায়-ই দ্রষ্টা উপভোগ করবেন। একটি হল ব্যষ্টির সাধনের মাধুর্য অপরটি হল সমষ্টির ধর্মে বহুত্বে একত্বের অমৃত আস্বাদন।

* দেখছি (০৪.১১.১৩) - একজন বই ফেরী করছে। আমি বসে আছি অফিসে। 'বই নেবে গো' - ডাক শুনে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম ওর ব্যাগে 'ধর্ম ও অনুভূতি' বই রয়েছে অনেকগুলো। বললাম, এ বই আছে আমার। অফিসের শিবুদা বলল, এই বইয়ে কী আছে? বললাম, ঈশ্বর দর্শনের কথা আছে। সপ্তভূমির দেহে প্রতি ভূমিতে কী কী দর্শন হয় সেসব গরগর করে বলে গেলাম। শিবুদা শুনে অবাক হয়ে বলল, দারুন তো! ... ঘুম ভাঙল।

- পার্থ সারথি ঘোষ (বেলঘরিয়া)।

ব্যাখ্যা ঃ ফেরীওয়ালা - ভগবান। ভগবানের কথা ভগবানই প্রচার করেন। বিশেষত যাদের ঠিক ঠিক ধারণা হয়েছে তাদের মাধ্যমে।

সত্যের পূজারী

* সকালবেলা ১০টা সাড়ে ১০টায় বিছানায় উবুড় হয়ে শুয়ে F.M.-এ গান শুনছি। হঠাৎ একটা ছোট ছেলে এসে দুপায়ের ফাঁকে ঢুকে পড়ে পায়ে হাত বোলাতে লাগল। পায়ে খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল, কামড়াচ্ছিল। মনে মনে ভাবছিলাম মা এলে পাগুলো টিপে দিতে বলব। বাচ্চাটা হাত বোলাচ্ছে ভালই লাগছে। একসময় উঠে দেখতে গেলাম ছেলেটিকে। দেখি কেউ নেই। আর পায়ে কোন যন্ত্রণাও নেই। খুব অবাক হলাম।

আর একদিন স্বপ্নে দেখলাম, আমিই রামকৃষ্ণ হয়ে গেছি। চটি নিয়ে মারতে যাচ্ছি মা কালীকে। লোকে বলছে পাগল। কেন এমন অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম ভেবে পেলাম না।

- তপন দেবনাথ (সখেরবাজার)।

ব্যাখ্যা ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ সংস্কারজ কালীপূজার বিরুদ্ধে গিয়ে মানুষের দেবত্বের জয়গান গেয়েছেন। নরলীলার কথা বলেছেন। স্বপ্নে এই সত্য জানাচ্ছেন দ্রষ্টাকে।

* গত ৭ই জুন (২০১৩) রাত্রে স্বপ্ন দেখছি - বাড়িতে চোর ঢুকেছে। রাত্রিবেলা। আমরা জেগে যাওয়ায় চোর ছুটে পালাচ্ছে। আমিও পিছু পিছু যাচ্ছি। চোরটা ধুতি পরে ছিল। ছুটতে গিয়ে ধুতির একটা অংশ গ্রিলের ফাঁকে আটকে গেল। আশ্চর্য, লোকটা আমার দিকে তাকাতেই দেখি উনি শ্রীরামকৃষ্ণ। কয়েক মুহূর্ত পরেই মুখটা জীবনকৃষ্ণের হয়ে গেল। ...

- শিখা চ্যাটার্জী (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যা ঃ চোর অর্থাৎ শ্রীহরির বিশেষ প্রকাশ কোন আধারে তা জানা যাচ্ছে এই স্বপ্নে।

বঞ্চনা

* দেখছি (১৭/০৯/১৩) - কয়েকজনের মধ্যে কথা হচ্ছে, ''আমি

কে?'' - এই বিষয়ে। আমি বললাম, আমাকে জানা, আমার স্বরূপ জানা। আচ্ছা দাঁড়াও, আমি ইণ্টারনেট থেকে আমার সম্বন্ধে জেনে আসি। ট্যাক্সি ধরে যাচ্ছি। ড্রাইভারকে বললাম, ডানদিকে চল, সোজা গেলে ঘুরতে হবে। ও আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, না, সোজা যেতে হবে (অর্থাৎ দিল্লীর পথে)। তখন দেখি ড্রাইভার যুবক জীবনকৃষ্ণ।

- বনানী দত্ত (সখেরবাজার)।

ব্যাখ্যা ঃ ইণ্টারনেট থেকে জানা - নির্গুণ থেকে জানা, তূরীয় অবস্থার অনুভূতির মাধ্যমে জানা।

* স্বপ্নে দেখছি (২৯/০৯/২০১৩) - আমার জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে যাচ্ছি। বললেন, একটা নতুন A/C ট্রেন হয়েছে চড়বি তো চল। দুজনে রেলস্টেশনে গেলাম। আমি টিকিট কাটতে গেছি - দেখি জ্যাঠামশাই ভিতরে ঢুকে পড়েছেন। বললাম, তোমার টিকিট? উনি উত্তর দিলেন - আমার টিকিট অনেক আগেই কাটা হয়ে গেছে। আমাকে কাউণ্টারের ভদ্রলোক বললেন, আজ ঐ ট্রেনটা নেই। জ্যাঠামশাই বললেন, ওরা কিছু জানে না। ঐ তো ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে। এক্ষুণি ছেড়ে দেবে। বলতে বলতেই ট্রেনটা ছেড়ে দিল। আমি বললাম, ট্রেনটা ছেড়ে দিল যে! জ্যাঠামশাই বললেন, যেতে দে। কিছু জিনিস ছাড়ার মধ্যে অনেক আনন্দ আছে। কথা শেষ করে জ্যাঠামশাই কিন্তু ট্রেনে উঠে পড়লেন। আমি উঠতে পারলাম না। আমি প্রশ্ন করলাম এর মানে কী? উত্তর করলেন, উত্তর দেবার অনেক লোক রয়েছে তাদের জিজ্ঞাসা করবি, তারা বলে দেবে। আমি দেখলাম, ট্রেনটা যখন স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে গেল তখন ট্রেনের পিছনে Danger (বিপজ্জনক) কথাটা লেখার জায়গায় কঙ্কালের মুখের বদলে শ্রীজীবনকৃষ্ণের মুখ। স্বপ্ন ভাঙল।

- চন্দ্রাশিস মুখার্জী (বেহালা, সখেরবাজার)।

ব্যাখ্যা ঃ কিছু জিনিস ছাড়ার মধ্যে আনন্দ আছে - ''আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে।'' এই বঞ্চনা মূলত ভগবানের কৃপা।

* স্বপ্নে (২৫.০৯.২০১৩) মনে হচ্ছে কুকুরে কামড়াবে। ভয়ে ভয়ে

আছি। হঠাৎ দুটি হাত আমাকে ধরল। মনে হচ্ছে জীবনকৃষ্ণের হাত, আবার ভাবছি কুকুরে কামড়েছে। তাই চিৎকার করে বলছি - কামড়াও, আরও জোরে কামড়াও। ... ঘুম ভাঙল। - তরুণ ব্যানার্জী (গড়গড়িয়া)।

ব্যাখ্যা ঃ কুকুর - ধর্ম - যে ধরে আছে। প্রত্যক্ষ ধর্ম হলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। ধর্ম যে হয়েছে তা দর্শন অনুভূতির মাধ্যমে দ্রষ্টা জানতে পারে।

বারান্দা

* স্বপ্নে দেখছি - একটা সভায় গেছি। একদল লোক লাইন দিয়েছে। কী ব্যাপার জানতে চাইলে বলল, ওরা প্রশ্নোত্তরে যোগ দেবে। প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারলে পুরস্কার আছে। আমিও লাইনে দাঁড়ালাম। আমাকে প্রশ্ন করল, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে ক'টা বারান্দা আছে আর তাদের বিশেষত্ব উদাহরণ দিয়ে বলুন। বললাম, চারটি বারান্দা আছে। দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায় তিনি নাপিতের কাছে দাড়ি কামাতেন। পশ্চিমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে গঙ্গা দেখতেন। উত্তর-পূর্বের ছোট বারান্দায় একদিন নরেন্দ্রর গান শুনে সমাধিস্থ হলে মাস্টারমশাই একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কী? তিনি বললেন, এর নাম সমাধি। উত্তরের বারান্দায় মাস্টারমশাইকে একদিন বললেন, 'মন যদি একান্ত হয় তাহলে জগৎ তোমার বশে আসবে। স্ত্রী, দেশের রাজা তোমার অনুকূল হবে।'

আমার উত্তর শুনে খুব খুশি হয়ে উদ্যোক্তারা পুরস্কার হিসাবে আমাকে দুটি বিস্কুট দিল। আমি আনন্দ সহকারে তাই নিলাম। কিন্তু হাতে নিতেই বিস্কুট দুটির প্রতিটি চার টুকরো হয়ে গেল। ওরা বলল, 'চিন্তা করবেন না, বাড়ি নিয়ে গেলে টুকরোগুলো জোড়া লেগে যাবে। তবে এখানকার কথা সকলকে বলবেন।' আমি বাড়ি যেতেই বিস্কুটের টুকরোগুলো জোড়া লেগে আবার দুটি গোটা বিস্কুট হয়ে গেল। তখন সেগুলো প্ল্যাস্টিক প্যাকেটে ভরে স্নেহময়কে দিতে যাচ্ছি আর ভাবছি যাকে যা বলার ও বলবে আর সবাইকে একটু একটু করে এই বিস্কুট খেতে দেবে। ... ঘুম ভাঙল।

- রেনু মুখার্জী (সখেরবাজার, কলকাতা)।

ব্যাখ্যা ঃ চারটি বারান্দা - জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তূরীয় অবস্থার প্রতীক। এই

চার অবস্থায় দেহস্থ ভগবান প্রকাশ পান।

১) উত্তরের বারান্দা - যেখানে ঠাকুর বললেন, জগৎ তোমার অনুকূল হবে - এটি জাগ্রত অবস্থা। এই অবস্থায় ভগবানের প্রসন্নতা লাভে সাধক দেখেন তার ঈশ্বরীয় অনুশীলনে (পাঠে) যাওয়ার বাধা নেই - সব অনুকূল।

২) পশ্চিমের বারান্দা - যেখান থেকে ঠাকুর গঙ্গা দেখতেন - এটি স্বপ্নাবস্থা। স্বপ্নাবস্থায় সুষুম্না বেয়ে জীবনীশক্তির ঊর্ধগতি লাভ ও তার ফলে জেগে ওঠা দেবত্বের বিকাশ দেখা যায়।

৩) দক্ষিণ পূর্ব বারান্দা - যেখানে ঠাকুর নাপিতের কাছে দাড়ি কামাতেন - এটি সুষুপ্তি (নিদ্রা) অবস্থা। এই অবস্থার অনুভূতি বিশেষ মনে থাকে না কিন্তু Effect (ফল) দেহেতে বর্তায়। "আমরা এখন ঘুমিয়ে পড়ি - ঘুম থেকে উঠে দেখব বাবু হয়ে গেছি।" নাপিত (নরসুন্দর) অর্থাৎ শ্রীভগবান আমাদের ভিতরের সৌন্দর্য্য তথা দেবত্ব জাগিয়ে তোলেন তাঁর ইচ্ছা মত।

৪) উত্তর পূর্বের ছোট বারান্দা - যেখানে ঠাকুরের সমাধি হয়েছিল - এটি তূরীয় অবস্থা - সম্পূর্ণ অহংশূন্য অবস্থা। এই অবস্থায়, দেহী ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে যান।

বিস্কুট - জ্ঞানের প্রতীক। দুটি বিস্কুট - ব্যষ্টি চৈতন্য আর সমষ্টি চৈতন্য। চার টুকরো - জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তূরীয় - এই চার অবস্থার অনুভূতি দেহে ধারণা হলে (বাড়ী গেলে) ব্যষ্টিচৈতন্য ও সমষ্টিচৈতন্যের পূর্ণ ধারণা লাভ হয়। স্নেহময় অন্যদের তা বলবে - পাঠে বলতে হবে এই স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যার কথা।

এই স্বপ্নের দেহতত্ত্বের ব্যাখ্যা না জানলে মন বহির্মুখী হবে। মানুষ ছুটবে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে। অপরপক্ষে দেহতত্ত্ব জানলে বুঝবে তার দেহটিই ঠাকুরের ঘর এবং সে এই ঠাকুরের ঘরের ৪টি বারান্দার কোন না কোন একটি বারান্দায় আছে।

* গত ৭ই জুন এক প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথায় মন অস্থির হয়েছিল। ঘুম আসছিল না। ভোরের দিকে স্বপ্ন হল - "আমার সামনে একটা বড় পর্দা। মাথার কাছে ডান পাশে আছে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠবৎ আত্মা। আমি সেটা স্পষ্ট অনুভব করছি। তাকিয়ে আছি পর্দার দিকে। আত্মার ছায়া পড়েছে পর্দায়। ছায়ার আকৃতি একজন মানুষের মত।" ... ঘুম ভাঙলে বুঝলাম, যে সত্তায় আমরা সকলে সত্তাবান সেই এক আত্মার দিকে না তাকিয়ে তারই ছায়ামূর্তির দিকে তাকিয়ে আছি। আমরা সকলে আত্মারই ছায়ামূর্তি। আত্মা বা ব্রহ্মাই সত্য। আমাদের সেই দিকে চোখ ফেরাতে হবে। মন শান্ত হল।

- বরুণ ব্যানার্জী (বোলপুর)।

ঊর্ণনাভ

* দেখছি - (০৭.০৮.২০১৩) - জয়দা আর আমি একটা উঁচু জায়গায় রয়েছি। সেখান থেকে দেখছি - নীচে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে। তার দুপাশে দুটি স্তম্ভ। একটার মাথায় একটা বড় মাকড়সা আর একটাতে অনেকগুলো ছোট মাকড়সা। মনে হচ্ছে সব ছোট মাকড়সার মোট যা বিষ ঐ একটা মাকড়সার বিষ তার সমান। জয়দা ঐ বড় মাকড়সাটা সম্পর্কে জানে আর আমি ছোটগুলোর সম্পর্কে জানি। জয়দা আমাকে বড়টা সম্পর্কে বলছে আর আমি ওকে ছোটগুলো সম্পর্কে বলছি। হঠাৎ কথাগুলো ইংরাজীতে হতে লাগল। পাশে দিদি (প্রকৃতি) দাঁড়িয়ে সব শুনছে। - সাগর ব্যানার্জী (বোলপুর)।

ব্যাখ্যা ঃ মাকড়সা - ঊর্ণনাভ - ব্রহ্ম। তিনি এক আবার বহু। যার বস্তুতত্ত্বের সাধন তিনি এককে ভিতরে পান, পরম এক হয়ে যান। বাকী সকলে তাঁর সাথে একত্ব লাভে ব্রহ্ম হন। এদের দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি। পারস্পরিক অভিজ্ঞতার বিনিময়ে দ্রষ্টার প্রজন্মের মানুষ তথা জগৎ (প্রকৃতি) 'এক ও একত্ব'-র ধর্মের স্পষ্টরূপ জানতে পারবে।

* গত ২৭শে জুন রাত্রে স্বপ্নে দেখছি - আমার হাতে কে একটা পান দিয়েছে। সেটা মুখে ভরে দেখছি তার ভিতরে চিনি দেওয়া রয়েছে। প্রথমে

ভালো লাগল কিন্তু কিছুক্ষণ পর গা বমি বমি করতে লাগল। মুখটা বিস্বাদ হয়ে গেল। পানের মশলা আর চিনি মিশে বিশ্রি এক জিনিস তৈরী হয়েছে। আমি থু থু করে সবটা মুখ থেকে বের করে ফেলে দিলাম।

- দেবরঞ্জন চ্যাটার্জী (চারুপল্লী)।

ব্যাখ্যা ঃ মশলা সহ পান - ভোগের বস্তু। চিনি - ব্রহ্মজ্ঞান - ব্রহ্মানন্দ। দ্রষ্টার যোগ-ভোগ একসাথে সহ্য হবে না। মৌমাছির মত শুধু ফুলের মধু খাবে।

তথাগত

* গত জুন মাসের ২০ তারিখ (২০১৩) রাত্রে স্বপ্নে দেখছি - বোলপুরের জয়দা অসংখ্য গরু নিয়ে একটা মাঠে রয়েছে। মনে হচ্ছে গরুগুলো সব ওর। ওই কন্ট্রোল করে। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই একটা শিং-ওয়ালা গরু আমাকে তাড়া করল। আমি প্রতিহত করতে গেলে জয়দা বলল, 'তুই পারবি না, আমি দেখছি'। গরুটার সামনে দাঁড়াল। গরুটা কিছুক্ষণ থেমে আবার আমাকে তাড়া করল। জয়দা আবার ওর সামনে গিয়ে থামাল। এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর আমরা একটা জলের ট্যাঙ্কির কাছে গিয়ে পড়লাম। জয়দা বলল, আর পারছি না, তুই এই ট্যাঙ্কির উপর চেপে পড়। আমি এবার উঁচু ট্যাঙ্কিতে উঠে পড়লাম। নীচে তাকিয়ে ভাবছি এত উঁচুতে ওঠা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কী করে উঠলাম! নীচে গরুটা ট্যাঙ্কির চারপাশে ঘুরছে আর জয়দা সেখানে লুঙ্গি পরে দাঁড়িয়ে আছে। ...

ব্যাখ্যা ঃ রাখালরাজা কৃষ্ণ - রিপুর নিয়ন্ত্রণ-কর্তা, Controller of animality, এ যুগে সাধারণ মানুষের আত্মিক অবস্থা এত উঁচুতে তুলে দিচ্ছেন যেন সে রিপুর (গরুর) আক্রমণ থেকে নিরাপদ অবস্থানে থাকে। একথা কৃষ্ণ কাহিনীতে নেই।

পরের স্বপ্নে দেখছি - চিত্ত বলল, তথাগত স্যারের কাছে পড়তে যাব বোলপুরে। ওর সাথে বোলপুরে স্যারের বাড়ী গেলাম। স্যার ভিতরে কিছু ছেলেকে পড়াচ্ছিলেন। বেরিয়ে এলেন। দেখি এ তো জয়দা। জয়দা বলল, তোরা বস আমি আসছি - বলে বাড়ীর ভিতর ঢুকে গেল। বাড়ীর পিছনে

জয়দার বাগানটা ভারী সুন্দর। ভিতরে ঢুকলাম। মনে হচ্ছে এটা ঠিক বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের বাগান যেন। কোন মালী নেই অথচ সব গাছে আপনা হতে জল দেওয়া হচ্ছে। ... - জয় দাস বৈরাগ্য (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যা ঃ তথাগত - স আগত - তিনি এসেছেন। পূর্ণ প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে।

আলিঙ্গন

* দেখছি (২৫.০৬.১৩) - আমি বসে বসে জীবনকৃষ্ণের নাম জপ করছি। একটু দূরে শূণ্য থেকে যেন শ্রীরামকৃষ্ণ সৃষ্টি হলেন। যদিও রামকৃষ্ণের মত দেখতে নয় তবু রামকৃষ্ণ বলে মনে হচ্ছে। আমার দিকে শূণ্যে ভেসে এগিয়ে এসে সহসা এক ঝলক বাতাস হয়ে গিয়ে আমার গায়ে বইতে লাগলেন। তখন মনে হচ্ছে এই বাতাস-ই জীবনকৃষ্ণ। উনি আমাকে আলিঙ্গন করছেন। অদ্ভূত এক আনন্দে মন প্রাণ ভরে গেল। ...

- স্নেহময় গাঙ্গুলী (চারুপল্লী)।

ব্যাখ্যা ঃ দ্রষ্টা রামকৃষ্ণময় জীবনকৃষ্ণকে জানার পর সর্বজনীন মানব (বায়ু সর্বত্র বিদ্যমান) জীবনকৃষ্ণকে জানছেন। জগতের মানুষ তাঁর মহিমা শুনিয়ে (শব্দ আসে বায়ুর মাধ্যমে) দ্রষ্টাকে স্মরণ করাচ্ছেন যে জীবনকৃষ্ণ তাকে সর্বদা ধরে আছেন।

* স্বপ্নে দেখছি (১০.০৬.১৩) - সামনে সমুদ্র। মাঝ সমুদ্রে একটা সুন্দর পদ্ম ফুল দেখা যাচ্ছে। একটা নৌকায় উঠে মাঝ সমুদ্রে গিয়ে ঐ পদ্মটা তুলে নিলাম। তখন দেখি ওর রঙ বদলে গিয়ে লাল রঙের হয়ে গেল। একটা বড় বিষাক্ত সাপ (পদ্ম গোখরো) তাকে জড়িয়ে ছিল। সে জিভ বার করল। তার চেরা জিভ যেন মানুষের দুটি জিভ। দুটি জিভেই স্পষ্ট দেখা গেল জীবনকৃষ্ণের ছবি। পরক্ষণে সাপটি সমুদ্রে ডুবে গেল। ... স্বপ্ন ভাঙল।

- সুস্মিতা দে (বেহালা, কলকাতা)।

ব্যাখ্যা ঃ পদ্ম - ব্রহ্ম। লাল হল - রঙ বদলালো - স্থূল দেহ বদলালো। দুটি জিভ - কথা বলবে দুটি জিভে। জীবনকৃষ্ণের জিভে ও পরবর্তী কালে ঠিক ঠিক

জীবনকৃষ্ণের সত্তালাভকারী মানুষের জিভে।

অখণ্ড

* স্বপ্নে দেখছি (১৪.০৯.১৩) - রনিদার বাড়ীতে পাঠ হচ্ছে। জীবনকৃষ্ণের বড় বাঁধানো ফটোটা সামনে রয়েছে। আমার হাতে আর্ট পেপার গোটানো একটা লম্বা নল রয়েছে। আমি সেটার একদিকে চোখ রেখে জীবনকৃষ্ণের ফটোর দিকে তাকালাম। দেখছি সেখানে নেতাজী সুভাষ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি বহু মহাপুরুষের মুখ একে একে ফুটে উঠতে লাগল। আমি রনিদাকে বললাম, 'রনিদা, এই নলে চোখ রেখে জীবনকৃষ্ণের ফটোর দিকে তাকাও, অনেককে দেখতে পাবে।' রনিদা তাই করল। ... ঘুম ভাঙল।

- প্রণব ব্যানার্জী (সখেরবাজার)।

ব্যাখ্যা ঃ দেখাচ্ছে, শ্রীজীবনকৃষ্ণের মধ্যে অখণ্ড চৈতন্যের প্রকাশ।

* গত ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০১৩, রাত্রে স্বপ্ন দেখছি - বাড়ীতে পুজো হয়েছে। বিভিন্ন দেবদেবীর পটের নীচে যে ফুল ছিল তা সরিয়ে এক জায়গায় জড়ো করেছি। সামনে জীবনকৃষ্ণের একটা বড় ফটো আছে। সবিতা বলল, যে ফুলটা জীবনকৃষ্ণের ফটোতে দেওয়া ছিল আমায় সেই ফুলটা দাও। আমি ওকে বললাম, জীবনকৃষ্ণের ফটোতে কোন ফুল দিতে নাই।

- শুক্লা রাহা (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যা ঃ জীবনকৃষ্ণ মানুষের স্বরূপ। নিজেকে নিজের পুজো করার দরকার হয় না।

* সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে এক রাত্রে স্বপ্ন দেখছি - বিছানায় বসে আছি। ঘরে শ্রীজীবনকৃষ্ণ ঢুকলেন। হাত জোড় করে মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, 'জয় মা সিদ্ধেশ্বরী'।

- স্নেহা রায় (সখেরবাজার)।

ব্যাখ্যা ঃ সাধারণ মানুষই সিদ্ধেশ্বরী কালী। তাকে তিনি প্রণাম করে দেবত্ব জাগিয়ে তুলে জীবন্ত দেবী করছেন, যাতে তারা বুঝতে পারে জীবনকৃষ্ণ অখণ্ড চৈতন্যের মূর্ত রূপ।

ফসিল

* দেখছি (২১.০৭.১৩) - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে আমি বসে আছি। দুজনে কথা বলছি - হঠাৎ একটা কালো বিড়াল ওনার পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেল। তখন বললাম, ঠিক এই জিনিসটা একজন স্বপ্নে দেখেছিল। উনি মৃদু হাসলেন। পরের দৃশ্যে দেখছি একটা লেখা পড়ছি - 'যে ভগবানকে পেয়েও ভাবে সব পাওয়া হল না তার চাহিদা কোনদিনও মেটে না।' ... ইত্যাদি। তখন মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের একটা গানে আছে, সব সাধ মিটিল না ...। ভাবছি এ তো স্ববিরোধী। যাই রবীন্দ্রনাথকেই ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করি। তখন দেখি ঐ গানটার বিষয়-বস্তুর জিস্ট (সার সংক্ষেপ) যেন একটা সাপ - সেটা ফসিল হয়ে আমার হাতে ধরা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করলাম, সব সাধ মিটিল না লিখেছেন কেন? উনি প্রশ্নটা শুনে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলেন। পরক্ষণে আমার হাত থেকে সাপটাকে নিয়ে পুরোটা খেয়ে ফেললেন। আনন্দ ও বিস্ময়ের ঘোর না কাটতেই ঘুম ভেঙে গেল। ...

- বরুণ ব্যানার্জী (বোলপুর)।

ব্যাখ্যা ঃ রবীন্দ্রনাথ - ভগবান - জীবনকৃষ্ণ। ধর্ম মানে এতদিন ছিল অন্ধকারে কালো বিড়াল খোঁজা - ''মন কী তত্ত্ব কর তাঁরে উন্মত্ত আঁধার ঘরে।'' কিন্তু মানুষের বহু যুগের স্বপ্ন পূরণ হল জীবনকৃষ্ণের জীবনে। তিনি স্পষ্টভাবে ভগবানকে দেখলেন ও তার প্রমাণ পেল জগতের মানুষ। সাপ - কুণ্ডলিনী - ব্যষ্টির সাধন। ব্যষ্টির সাধনে সাধক স্থায়ীভাবে তৃপ্ত হন না, মনে হয় সব সাধ মিটিল না। ব্যষ্টির সাধন আর কারও হবে না, তা এখন অতীতের বস্তু (ফসিল)। তবুও মানুষ তাকে আঁকড়ে ধরে আছে। এবার পুরোপুরি তাকে উচ্ছেদ করছেন (সাপটাকে খেয়ে নিলেন)। নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে না দেখে জগতের মানুষের সাথে আত্মিক একত্বের উপলব্ধিতে, অখণ্ড চৈতন্যের রসাস্বাদনে সকল চাহিদার অবসান হয় ও পূর্ণ তৃপ্তি ঘটে।

পাঠ প্রসঙ্গে

পাঠচক্রে পাঠ ও আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক নতুন কথা, নতুন ব্যাখ্যা অনেক সময় প্রকাশ পায় তারই কিছু কিছু এখানে তুলে ধরা হল।

*** শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, একসের ঘটিতে চারসের দুধ ধরে না অর্থাৎ ক্ষুদ্র আধারে অনন্ত ঈশ্বরকে জানা যায় না।**

মানুষ অমৃতের পুত্র। অমৃতত্বলাভে যে তার জন্মগত অধিকার। মানুষ মাত্রই জন্মের সময় চারসের ঘটি হয়ে ওঠার সম্ভাবনা নিয়ে জন্মায়। চারসের ঘটি - জাগ্রত, সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও তূরীয় এই চার অবস্থায় ঈশ্বরত্ব লাভের যোগ্য আধার। সাধারণ মানুষ জাগ্রত অবস্থায় ঈশ্বরীয় চর্চা করে মাত্র। ফলে আধারের একসের ঘটিও ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু যার জাগ্রত, সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও তূরীয় অবস্থায় সর্বাঙ্গীণ সাধন ও অনুভূতি হয় তিনি চারসের ঘটি হয়ে ওঠেন। এটি এক যুগে একজনের পক্ষে সম্ভব যার বস্তুতত্বে সাধন হয়। তিনি ষোলআনা ভগবান দর্শন করে ভগবান হয়ে ওঠেন।

সে যুগে বাকি সকলের দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি হয়। এতে আধার চারসের হওয়া সম্ভব হয় না। উপরন্তু প্রচলিত ঈশ্বরীয় ধারণা ও বৈধী ধর্মের সংস্কার পাথরের ন্যায় মাথায় থেকে যাওয়ায় আধারের ধারণ ক্ষমতা আরও কমে যায়। তাহলে উপায়?

উপায় কথামৃতে একটি গল্পে ঠাকুর বলে গেছেন। গয়লানীর ছোট্ট দুধের ঘটিটি ঈশ্বরের কৃপায় অক্ষয় ঘটি হয়ে যেতে পারে। সেই ঘটি থেকে যত দুধ ঢালা হবে - যত ঈশ্বরীয় জ্ঞান বিতরিত হবে মানুষের মধ্যে, বিশেষত পাঠচক্রে - তত নতুন জ্ঞান সঞ্চিত হবে। এক অর্থে তা চারসের দুধ পাওয়ার সমান হয় অর্থাৎ পূর্ণতার স্বাদ পায় মানুষ। নিজের উপলব্ধির কথা বললে পরক্ষণে দেখা যাবে নতুন জ্ঞান জাগছে নিজের দর্শনে অথবা অপরের কাছে শোনা দর্শন থেকে। চারসের দুধ না হলেও দুধ যে অফুরন্ত - ঈশ্বর যে অনন্ত তা উপলব্ধি হবে।

তবে এ অবস্থা হতে গেলে নির্গুণের অনুভূতি বেশী করে হওয়া চাই।

নির্গুণের দ্বার খোলা চাই। অর্থাৎ তূরীয় অবস্থার অনুভূতি দরকার। শুধু জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির দর্শনে মানুষ অনন্ত হয় না - কেননা এই তিন অবস্থায় অহং এর সম্পূর্ণ বিলোপ হয় না। দ্বৈতজ্ঞান থেকে যায়। একমাত্র তূরীয় অবস্থার অনুভূতিতে অহং সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় - মানুষ ঈশ্বরত্বের স্বাদ পায়। তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে ব্রহ্মের চার পাদের মধ্যে তিন পাদের প্রকাশ এক পাদ অপ্রকাশ। অর্থাৎ স্বপ্নে, সুষুপ্তিতে ও জাগ্রত অবস্থার অনুভূতিতে ব্রহ্মের প্রকাশ হয়েছে। সাধারণ মানুষ তূরীয়ের অনুভূতি লাভ করে নিজের ব্রহ্ম স্বরূপ জানতে পারে নি। অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে ব্রহ্মের এক পাদ প্রকাশ, তিন পাদ অপ্রকাশ। সেখানে তিন পাদ অপ্রকাশ বলতে তূরীয় অবস্থার অনুভূতির গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে। জাগ্রত, স্বপ্ন সুষুপ্তিতে ব্রহ্মের যতটুকু জানা যায় তা যেন এক পাদ জানা। আর তূরীয় অবস্থার অনুভূতিতে নির্গুণের শক্তির প্রকাশে ব্রহ্মের বাকী তিন পাদ জানা যায়। এ যুগে সাধারণ মানুষও অখণ্ডচৈতন্য হয়ে ওঠা মানুষটিকে ভিতরে দেখার ফলে তাদের নির্গুণের দ্বার খুলে যাচ্ছে - তাদেরও তূরীয়ের অনুভূতি হচ্ছে। স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন দেখা, স্বপ্নে কুয়াশা দেখা, স্বপ্নেই বোধ হওয়া যে এটা স্বপ্ন এবং তার দেহতত্ত্বে মানে করা তূরীয় অবস্থার অনুভূতির লক্ষণ। সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের চতুর্থ পাদের প্রকাশে নবযুগের সূচনায় জগৎ প্রকৃত অর্থেই মধুমতী হয়ে উঠছে।

*** শ্রীজীবনকৃষ্ণের একটি বিশেষ স্বপ্ন।**

১৯৩২/ ৩৩ সালে একটি স্বপ্ন দেখে শ্রীজীবনকৃষ্ণের মাথায় আপনা হতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের ঠাকুরের অমৃতবানীর দেহতত্ত্বে ব্যাখ্যা স্ফুরিত হতে থাকে। সেই স্বপ্নে তিনি বাবুর বাগান ও জগতের রাস্তার মাঝখানে যে রুদ্ধ গেট ছিল তা খুলে দেন। ঐ স্বপ্নের সূত্র ধরে ৩৪ বছর পর (০৭.০৯.১৯৬৬-তে) তিনি আর একটি বিশেষ স্বপ্ন দেখেন। দেখলেন - সুন্দর বাগান। সেখান থেকে বেড়াতে বেড়াতে রাস্তায় এসে পড়লেন। ডানদিকে একটা লোক এক ঝুড়ি কালো কালো বেগুন বিক্রি করছে। উনি দেখলেন কিন্তু কিনলেন না। বেশ একটু এগিয়ে গেলেন। পরে মনে হল একটা বেগুন কিনে আনবেন। ফিরে এসে

দেখেন সব বেগুন বিক্রি হয়ে গেছে। আবার এগিয়ে গেলেন। কিছুদূর এসে দেখলেন একটা মুদিখানার দোকান। তার পাশেই একটা নতুন ঘর। ঘরে বসন্ত দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের পিছনের দেওয়ালটা সাদা দুধের মত। সেই দেওয়ালে অক্টোগোনাল শেপের (Octogonal shape) একটা দেওয়াল ঘড়ি।

বাবুর বাগান থেকে (ব্রহ্মপুর থেকে) তিনি নেমে এলেন জগতে সাধারণ মানুষের কাছে। নিষ্ক্রিয় নির্গুণ ব্রহ্ম সক্রিয় হয়ে জীবনকৃষ্ণরূপে জগতে প্রকাশ হলেন। তিনি নির্গুনের শক্তির ক্রিয়ার যে ফল (Product) পেয়েছেন (বেগুন) অর্থাৎ দর্শন অনুভূতি লব্ধ জ্ঞান - একত্বের জ্ঞান, তা জগতের মানুষের কাছে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য হয়েছে (সব বেগুন বিক্রি হয়ে গেছে)। এরপর Vedanta in everyday life অর্থাৎ মুদির দোকানের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ন্যায় এই একত্ব মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সমস্যার সমাধান করবে। শ্রী জীবনকৃষ্ণের প্রাণশক্তির বিকাশের সেটাই হবে zenith (সর্বোচ্চ অবস্থা), the maximum, তাই সেখানে বসন্তকে দেখছেন। আর এই অবস্থা হবে চিরস্থায়ী (perpetual) - তার প্রাণ শক্তির ঐ ক্রিয়া চলবে অষ্ট প্রহর, তাই অক্টোগোনাল ঘড়ি দেখলেন।

প্রথম স্বপ্নে যার সূচনা এই স্বপ্নে তার পরিণতির ইঙ্গিত। এর ছ'মাস পর, ১৯৬৭-এর জানুয়ারীতে ইংল্যাণ্ডে সুব্রতবাবু 'এক ও একত্ব' বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তখন তার কপালে শ্রী জীবনকৃষ্ণের মুখমণ্ডল স্পষ্ট দেখলেন এক ইংরেজ রমনী। নতুন যুগের সূচনা হল। তবে এর পূর্ণ পরিণতি জীবদ্দশায় ফোটে নি।

*** ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬ - শ্রী জীবনকৃষ্ণ তাঁর এক দর্শনের কথা উপস্থিত সকলকে বললেন। তিনি বললেন, ''প্রথমে দেখলাম খগেন্দ্রকে, পরে প্রকাশকে আর সব শেষে দেখলাম সতীশকে''।**

শ্রী জীবনকৃষ্ণের আত্মিক জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল - মানুষকে নিয়েই তার সব। অন্তরে বিভিন্ন মানুষের রূপ দর্শনে তিনি তাঁর আত্মিক অবস্থা জানতে পারতেন।

খগেন্দ্র মানে শ্রেষ্ঠ পাখি - গড়ুর পাখি। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে

গড়ুর পাখির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল - তিনি সূর্যের ভিতর থেকে অমৃত এনে নিজের মাকে বিমাতার হাত থেকে দাসত্ব মুক্ত করতে পেরেছিলেন। জীবনকৃষ্ণ এই খগেন্দ্র অবস্থা লাভ করলেন অর্থাৎ নিজে মৃত্যুঞ্জয় হয়ে মা অর্থাৎ জগতকে গুরুগিরি তথা সংস্কারের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য অমৃত তথা ব্রহ্মত্ব লাভ করলেন। তিনিই প্রথম মানুষ যিনি জগৎকে অমৃত তথা মুক্তির স্বাদ দিলেন। সাধারণ মানুষও বলার অধিকার পেল ''আমরাও ব্রহ্ম''।

তার এই খগেন্দ্র অবস্থার 'প্রকাশ' হলে তিনি চিন্ময়রূপে ফুটে উঠতে লাগলেন মনুষ্য জাতির অন্তরে। তাঁকে কেন্দ্র করে আত্মার মহিমার এক বিশেষ রূপ জগৎ প্রত্যক্ষ করল।

এর পরবর্তী ধাপ সতীশ। সতীশ মানে শিব - সতীর ঈশ্বর। জীবনকৃষ্ণ বলেছেন, তোদের শিব নেচেছে। আমার শিব এখনও নাচেনি। অর্থাৎ তাঁর মধ্যে শিব চৈতন্যের পূর্নস্ফুরণের ফলে তার শিবত্ব (divinity) দ্বারা মানুষের আত্মিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হলে সমষ্টিগত ভাবে একটা রূপান্তর ঘটবে। তবেই সর্বজনীন ধর্ম তথা সর্ব সাধারণের আত্মিক অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে। জগতে তার এই আত্মিক অবস্থার পূর্ন প্রকাশ জীবদ্দশায় তিনি দেখে যেতে পারেন নি।

*** পুরানে আছে মা দুর্গা একটি সুদৃশ্য হার নিয়ে বললেন, কার্তিক ও গণেশের মধ্যে যে আগে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসবে তাকে তিনি ঐ অমূল্য হারটি দেবেন এবং কোলে নেবেন।**

কার্তিক দেরী না করে ময়ূরে চড়ে তক্ষুণি পৃথিবী পরিভ্রমণ শুরু করে দিলেন। গণেশ ভাবল মা তো পৃথিবীর সমান। মা'কে এক পাক ঘুরে এলেই পৃথিবী ঘুরে আসার সমান হবে। তিনি তক্ষুণি মা কে প্রদক্ষিণ করে মায়ের কোলে বসে পড়লেন। মা'ও খুশি হয়ে তাকে ঐ হারটি পরিয়ে দিলেন। কার্তিক ফিরে এসে ঐ দৃশ্য দেখে অবাক ও ক্ষুব্ধ। তখন মা তাকে সব বুঝিয়ে দিলেন।

কার্তিক হল অবতার অবস্থার প্রতীক। অবতারের বাহন দরকার হয় প্রচারের জন্য। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়োজন হয়েছিল নরেনকে। চিকাগোতে, পৃথিবীর অপর প্রান্তে গিয়ে তিনি প্রচার করে এলেন। ঠাকুরও কাশীপুর বাগানে

থাকার সময় একদিন একটুকরো কাগজে লিখে দিয়েছিলেন - 'নরেন লোক শিক্ষে দেবে, যখন ঘরে বাইরে হাঁক দিবে'। তার নীচে ছবি আঁকলেন - গলা পর্যন্ত একজন লোক - তার গলায় ঘা - তার পিছনে একটি ময়ূর। এই ময়ূর আসলে নরেন।

আবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত রচয়িতা শ্রীম তৃতীয় দর্শনের পরদিন একই সময়ে ঠাকুরের সাথে দেখা করতে এলে ঠাকুর বলে উঠলেন, ''ঐ রে! আবার এসেছে! একটা ময়ূরের আফিমের মৌতাত ধরেছিল। ঠিক সময়ে আফিম খেতে এসেছে।'' এখানে শ্রীম-ও যে তাঁর বাহন সেকথা জানাচ্ছেন। শ্রীম'র লেখা কথামৃত আজ পৃথিবীর প্রায় সব দেশে সমাদৃত।

গণেশ - ভগবান অবস্থার প্রতীক। ভগবানত্ব লাভ হলে সে মায়ের কোল পায় - জগতের মানুষের অন্তরে ঠাঁই পায়। জগত তাকে বরণ করে নেয়। বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মানুষ রূপে স্বীকৃতি দেয়। শ্রী জীবনকৃষ্ণ এই অবস্থা লাভ করেছেন। তিনি প্রচারের জন্য কোথাও যান নি। তার কোন প্রচারক নেই - অথচ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ তাঁকে স্বপ্নে দেখেছেন বলে জানাচ্ছেন - তিনি জগৎরূপী মায়ের কোল পেয়েছেন।

*** শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, আজ (২২/১২/১৯৬০) একটা নতুন জিনিস দেখলাম। চোখ বুজে বসে আছি, রাধুকে (রাধাচরণ মিত্র) দেখলুম। আর রাধুর মধ্যে ভগবান দর্শন হল। এরকম তো কখনও হয়নি। দেখালে রাধুও এক রূপে সেই ভগবান। - (জীবন সৈকতে)।**

রাধাচরণ মিত্রের মধ্যে শ্রীজীবনকৃষ্ণের এই আত্মা বা ভগবান দর্শনের তাৎপর্য বিরাট। তিনি নিজের মধ্যে আত্মা সাক্ষাৎকার করেছেন যা মনুষ্যজাতির প্রাণশক্তির নির্যাসের ঘনীভূত রূপ। ২৪ বছর ৮ মাস বয়সে এই দর্শন হয়। দ্বিতীয় বার তা দর্শন করা সম্ভব নয় - নিজের বা অন্যের মধ্যেও। তাহলে এই দর্শন প্রতিবিম্ব সূর্য দেখার ন্যায় - অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তরের। তিনি নিজ আত্মাকে প্রতিবিম্বিত হতে দেখছেন রাধু বাবুর মধ্যে। একোহম বহুস্যাম - আমি এক, আমি বহু হব - এ কামনা করতে হয় না। আপনা হতে বহু মানুষ তার আত্মিক

সত্তা লাভ করে তাঁকে জানায় - তুমিই এতগুলি হয়েছ। মহর্ষি পতঞ্জলিও বলেছেন - আকাশে এক চন্দ্র। অসংখ্য পুষ্করিনীতে অসংখ্য প্রতিবিম্ব চন্দ্র। প্রতিবিম্ব চন্দ্রও আকাশের চন্দ্রের গুণ পায়। জীবনকৃষ্ণকে অন্তরে দেখা অসংখ্য মানুষও তাঁর ভগবানত্ব লাভে একরূপে ভগবান হচ্ছেন - তবে দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ ভগবান জীবনকৃষ্ণকে বোঝার উপযুক্ত হচ্ছেন।

*** শিবকে বেদ মান্যতা দিয়েছে - বলেছে- ''শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্''। কোথাও বলছে, শিব ঐক্যস্থাপনে। কিন্তু শিবলিঙ্গ পূজাকে বেদ গ্রহণ করেনি।**

এটি পুরাণ মত। তাই দেখি রামেশ্বরমে রাম বালি দিয়ে গড়া শিবলিঙ্গ পূজা করলেন। পরে হনুমান কৈলাস থেকে শিবলিঙ্গ আনলে তাকেও সেখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু বালি দিয়ে গড়া শিবলিঙ্গ কেন? লিঙ্গপূজা শাস্ত্রের অসার অংশ (বালি) বোঝাতে।

*** ''একটা ছোটলোক পানা ঠেলে জল হাতে তুলে দেখলে। দেখালে পানা না ঠেললে, সাধন না করলে জল দেখা যায় না অর্থাৎ ভগবান দর্শন হয় না।''**

কিন্তু জীবনকৃষ্ণ বললেন, ছোটলোক মানে যার অহং ছোট হয়ে গেছে অর্থাৎ ভগবান। ভুবনমোহিনী মায়ারূপ পানা তাঁর - তিনিই তা ঠেলে সরাতে পারেন। তখন যে ব্রহ্মবারি দর্শন হয় - তা তিনিই দেখেন, অন্যে তার সাক্ষীস্বরূপ হয়।

সর্বভূতস্থম্ আত্মানম্ - সর্বভূতে ব্রহ্ম নিজেকে বিচিত্রভাবে দেখেন। জীবনকৃষ্ণকে অন্তরে অনেকে দেখেন। সেই দর্শনের কথা যখন তাঁর কাছে গিয়ে বলেন, উনি বলতেন এসব দর্শনের কথা শুনে ওনারই নিজেকে দেখা হচ্ছে সর্বভূতের মধ্যে। উপনিষদেও সেকথার সমর্থন আছে। সেখানে বলা হয়েছে স্বপ্নের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা অন্তরস্থ আত্মা। দেহী তন্মাত্র অবস্থায় সাক্ষীস্বরূপ থাকেন।

*** ঠাকুর বলেছিলেন, চৈতন্যদেব অবতার। তাঁর কথা আলাদা।**

তিনি বলেছিলেন, আমি যা বীজ রেখে গেলাম কখনও না কখনও এর কাজ হবে। একজন কার্নিশের উপর একটা বীজ রেখেছিল, বাড়ি ভেঙে গেলে সেই বীজ মাটিতে পড়ল, তা থেকে আবার গাছ হল। আবার অন্যত্র ঠাকুর বলেছেন, ''চৈতন্য অবতার। তিনি যা করে গেলেন তারই বা কী রয়েছে বল দেখি?''

বহু মানুষ তো এখনও মহাপ্রভুর ভজনা করে।তিনি স্বপ্নে কৃষ্ণনাম পেয়েছিলেন। সেই নামবীজ থেকে কৃষ্ণ অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মের প্রসন্নতালাভে কাঙ্খিত সাধনবৃক্ষ জন্মায় নি। সর্বক্ষণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ করেও নাদের রহস্য ভেদ হয়নি কারও। আবার মহাপ্রভু প্রবর্তিত কৃচ্ছ্রসাধনকেও কেউ আদর্শ করতে পারেনি। আর তা সম্ভব নয় বুঝে উনি ভক্তদের বললেন, তোমরা সংসারে থেকে হরিনাম কর। মহাপ্রভুর জীবন দেখে ভক্তেরা সে উপদেশও গ্রহণ করতে পারেনি। মঠ, আশ্রম, ফোঁটা তিলক ধারণ ইত্যাদি কিছু আচার আচরণে সর্বসাধারণের থেকে নিজেদের পৃথক করার চেষ্টাও চলেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে নির্গুণের ক্রিয়া হল - সচিদানন্দ গুরু লাভ হল - আপনা হতে সাধন হল - শেষে নাদভেদ হল। উনি বলছেন, আমি ওঁকার শুনিনি, ঘণ্টার ট-ম্-ম্ শব্দ শুনেছি। নাম ও নামী অভেদ বোধ হ'ল। এরপর নিগমের সাধনে অবতারত্ব লাভ করে, যুগের আদর্শ পুরুষ হয়ে উঠলেন। তিনি কৃচ্ছ্রসাধনের পথ ত্যাগ করে সর্বসাধারণের জীবন যাপন করলেন। চাকরি করে খেয়েছেন - পরে পেন্‌সন পেয়েছেন। আর নিশিদিন হরিপ্রেমে মাতোয়ারা। তাঁর জীবনে মহাপ্রভুর গেরুয়া ধারণ, ফোঁটা তিলক, মাটিতে শোয়া, কলার বাসনায় খাওয়া, 'গোরা নারীর ছবি হেরবে না' ইত্যাদি কোন প্রকার বিবিদিষার চিহ্ন থাকল না। সর্বদা ঈশ্বরের নাম জপ করার ধারাও বদলে গেল। তিনি নিজের দর্শন অনুভূতির কথা ভক্তদের কাছে গল্প করে বলতেন। তাই তিনি বললেন, মহাপ্রভু যা করে গেলেন তা আর রইল না। কেননা এ যুগে নতুন আদর্শ জেগে উঠেছে তাঁর জীবনে। তিনি আরও বললেন, ''বাদ্‌শাহী আমলের টাকা নবাবী আমলে চলে না।''

বর্তমান যুগে আবার শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শও টিকল না। মানুষ তাঁকে

ভিতরে না পেয়ে বাইরে শুধুমাত্র বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে গিয়ে, নিজেকে রামকৃষ্ণের ভক্ত প্রমাণ করতে গিয়ে গেরুয়া ধারণ, মূর্তি পূজা ও অন্যান্য অনেক নিয়মে নিজেদেরকে বেঁধে ফেলছে। তিনি বলেছেন, মা আমার বাহ্যপুজো উঠিয়ে দিয়েছেন। এখন নরলীলা, তাই ভক্তিভক্ত নিয়ে থাকি। শ্রীরামকৃষ্ণ আধার অনুযায়ী বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন নির্দেশ দিয়েছেন। তাকে উদাহরণ করে মানুষ 'যত মত তত পথ' - কথার ব্যাখ্যা করলে, যে যেভাবে চলছে সেটিই ঠিক পথ। কিন্তু শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, তোমার ভিতরে ভগবান। তিনি তোমার ভিতর আপনা হতে রূপ ধারণ করে প্রকাশ পেয়ে যেমন নির্দেশ দেবেন সেভাবে চলবে। নিজেই চিন্ময় রূপে মানুষের ভিতর ফুটে উঠে মানুষকে গাইড করতে লাগলেন। তিনি কোন উপদেশ দেননি। এই আপনা হতে দর্শন হওয়া ও তার দ্বারা পরিচালিত হওয়াই তাঁর জীবনের আদর্শ, এ যুগের আদর্শ।তবে তার সাথে একত্ব লাভ হলে, নিজের মধ্যে নির্গুণের অনন্ত তেজ জাগলে ও তার দ্বারা পরিচালিত হলে তবে এটি হয়।

✻ ১৯৫২ সালে শ্রীজীবনকৃষ্ণ এক স্বপ্নে অনাথবন্ধু দর্শন করেছিলেন।

তিনি দেখলেন, এক অন্ধকার গুহায় হাত ঢুকিয়ে দিয়ে চুলের মুঠি ধরে একজনকে টেনে তুললেন, মনে হল তার নাম অনাথ বন্ধু। তিনি হাত জোড় করে জীবনকৃষ্ণকে বললেন, ''বাবুজী, মশায়, আপনি জানবেন আপনি ভগবান তবে গুপ্তভাবে লীলা''। উনি ভাবলেন গুপ্তভাবে লীলা যখন তখন আমার আর ব্যক্ত করার দরকার নেই। পরে ১৯৫৭ সালে অসীমবাবু এবং বেশ কয়েকজনের স্বপ্নে ওনাকে ভগবানরূপে দেখার কথা শুনে উনি ওনার পূর্বে দেখা এই দর্শনটির কথা বলেন।

এখন ওনার এই দর্শনটিকেই একবার নতুন করে ভাবা যাক। এখানে ভগবান কি? আর অনাথবন্ধু কে? জীবনকৃষ্ণ কিন্তু ভগবান বা আত্মার সংজ্ঞাটাই বদলে দিচ্ছেন। জীবনকৃষ্ণকে ভগবান বললেই লোকে ভাববে প্রচলিত কালী বা শিব ঠাকুর যা জীবনকৃষ্ণও তা। ভগবান হল সমগ্র মনুষ্য জাতির প্রাণশক্তির নির্যাসের সমষ্টি। যা যুগে একজন মানুষের দেহেই সঙ্কলিত হয়। সুতরাং

ভগবান জীবনকৃষ্ণ মানে, জীবনকৃষ্ণ একজন মানুষ আবার তিনি সব মানুষের আত্মিক চেতনার সম্মিলিত রূপ। এবার দেখুন অনাথবন্ধু দর্শনের অর্থ কী। অন্ধকার গুহা থেকে তিনি শক্তি আহরণ করলেন। অনাথ হল - ordinary মানুষ, সাধারণ মানুষ। অনাথবন্ধু হলেন, পাঠকেরা। তিনি যেন নির্গুণের শক্তি সহায়ে অনাথবন্ধু সৃষ্টি করলেন, পাঠক সৃষ্টি করলেন। এই পাঠকেরা মনুষ্যজাতিকে জানাবেন যে জীবনকৃষ্ণের মধ্যেই মনুষ্যজাতির প্রাণের নির্যাস সংকলিত হয়েছে, তিনিই সকলের আত্মিক স্বরূপ। তাঁকে ভিতরে দেখে মানুষ নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করে - বোঝে সেও ব্রহ্ম। এই নতুন মানুষকে পেয়ে মানুষ নতুন যুগে প্রবেশ করে এবং এই মানুষ অর্থাৎ ভগবানকে পেলে তবে সকল মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সাম্য লাভ হয় ও প্রকৃত শান্তি লাভ হয়। ১৯৫২ সালের এই দর্শনটির পরিপূর্ন রূপ ১৯৬৪ সালে পাঠচক্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ধরা পড়ল। ১৯৬৩ সালের শেষ দিকে একদিন জীবনকৃষ্ণকে মানুবাবু জানালেন উনি স্বপ্নে দেখেছেন, জীবনকৃষ্ণ বলছেন, 'ভোলার কাছে আমার হিস্যে আছে, আমি কলকাতায় ফিরে না গেলে ও হিস্যেটা মেরে দেবে'। এই দর্শনটির কথা শুনে জীবনকৃষ্ণ পুরী থেকে তার ফিরে আসার প্রকৃত কারণটি বুঝলেন। তাঁর হিস্যে অর্থাৎ ব্রহ্মত্বের ভাগ পেয়েছেন যারা, ভোলাবাবু ইত্যাদিরা, তারা যদি পাঠে গিয়ে যথার্থ অনুশীলন না করেন তাহলে ঐ ব্রহ্মত্ব জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ লাভ করবে না এবং তাদেরও এই ব্রহ্মত্ব বজায় থাকবে না। হিস্যে মেরে দেবে। এরপর ১৯৬৪ সালে ভোলাবাবুদের তিনি বিভিন্ন স্থানে পাঠ করতে পাঠালেন।

এই অনুশীলনের আর এক লক্ষ্য হল সংস্কার মুক্ত হওয়া। অসংখ্য সংস্কার কেটে এগিয়ে যেতে হয়।তবে জগৎব্যাপ্ত এই চৈতন্য সত্তাকে ধারণা করা যায়।

*** দুরকম চাষার উপমায় ঠাকুর বললেন, নদীর জল চাষের প্রয়োজনে মাঠে যাতে আসে তার জন্য চাষারা পরিশ্রম করছে। এক চাষার স্ত্রী যেই তাকে নাওয়া-খাওয়ার জন্য ডাকল অমনি সে কাজ ফেলে স্ত্রীর**

সাথে চলে গেল। অপর চাষাটি স্ত্রী বা মেয়ে কারোর ডাকেই গুরুত্ব দিল না। তার কাজ শেষ করে জমিতে জল ঢুকলে তবে ঘর গেল।

ব্যাখ্যায় জীবনকৃষ্ণ স্ত্রীকে অবিদ্যামায়া এবং মেয়েকে বিদ্যামায়া বলেছেন।

প্রথম চাষীটি মোহনী মূর্তি অবিদ্যামায়ার কবলে পড়ল। অবিদ্যামায়া কি করে? ভুল বোঝায়। ঈশ্বরবিমুখ করে। পাঠে গিয়ে কি হবে? চল বরং টিভিতে ভাল পোগ্রাম আছে দেখি। এরা সকাল থেকে কি করছে শুধু পাঠ আর পাঠ। সময় নষ্ট করছে - এই ভাব জাগায়। অন্য চাষীটি স্ত্রীর ডাকে গেল না, মানে অবিদ্যামায়াকে প্রশ্রয় দিল না। তার মনোভাব, তুই ভাত খেতে ডাকছিস? কিন্তু আজ ভাত পেলেও চাষ না করলে সারা বছর কী খাব? অর্থাৎ দেহ-জমিতে আত্মিক স্ফূরণ না হলে বয়স বাড়ার সাথে সাথে ক্রমবর্ধমান আত্মিক ক্ষুধা মিটবে কী করে? অবিদ্যামায়া দেহ নিয়ে যে জৈবী আনন্দ তাতেই শুধু মাতিয়ে রাখে। অন্যায়ে আনন্দ, পরনিন্দা পরচর্চায় আনন্দ ইত্যাদি। যেমন বাড়িতে কেউ বেড়াতে এলে - পরনিন্দার মত মুখরোচক গল্প যখন হবে তখন আরো শুনতে চাইবে, কিন্তু যেই বলা হবে আমার একটা সুন্দর স্বপ্ন হয়েছে শুনবে? অমনি তার জরুরী কাজের কথা মনে পড়বে ও বাড়ী পালাবে। এমন মানসিকতার মানুষের জন্য একটা পরিচিত প্রবাদ আছে - রাম নামে ভূত পালায়। এই অবিদ্যামায়া দেহ জমি কর্ষণে বাধা দেয়।

যে চাষারা দূর থেকে চাষের জন্য জল আনছেন তারা বিবিদিষাপন্থী। তারা চেষ্টা করে দেহ জমি কর্ষণ করতে চাইছেন। তারা জানেন না যে এ হবে আপনা হতে। তবে বিষয়টাকে বুঝতে সময় দিতে হবে। অনুশীলন করতে হবে। দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধন নয় বরং দর্শন অনুভূতিকে ভিত্তি করে যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ করলে আত্মিক চেতনার পরিবর্তন সম্ভব।

একদিন রবীন্দ্রনাথ শান্তিকেতনের উত্তরায়ণে বসে বেলা পর্যন্ত তার সাহিত্য রচনার কাজ করছেন। এক সাঁওতাল রমনী সে জায়গাটা ঝাঁট দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে বললেন, "তুর কি কুনো কাজ নাই রে, সকাল থেকে বসে আছিস?" রবীন্দ্রনাথ তো একথা শুনে হেসেই খুন। যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে তাকেই বলছেন, তোমরা আমায় চিনতে পারনি, চিনেছে এই মেয়েটি। ও

কি বলেছে শোন। আসলে মেয়েটি ভাবছে কাজ মানে দৈহিক পরিশ্রম, ঘর সংসারের কাজ, কিন্তু মানসিক পরিশ্রম, এক জায়গায় বসে গভীরভাবে ভাবছেন তা কি কাজ নয়? দর্শন অনুভূতির অনুশীলন করার ফলে যে আত্মিক চেতনার পরিবর্তন হচ্ছে এটা অনেক বড় কাজ। স্থূলবুদ্ধিসম্পন্নরা তা ধরতে পারে না।

ফিরে আসা যাক পূর্ব প্রসঙ্গে। মেয়ের কোমল ভাব। বিদ্যামায়ার প্রতীক। কিন্তু বিদ্যা হলেও মায়া তো থাকছে। তাই তাকেও গ্রহণ করা যাবে না। বিদ্যামায়ায় জাগে ঈশ্বরে অনুরাগ। কিন্তু অল্প জ্ঞানে তৃপ্ত থাকার মানসিকতা জাগায়। পূর্ণ জ্ঞান হতে বাধা দেয় - তাই মায়া - সত্যলাভের পথে বাধা। বিদ্যামায়া বলবে, চল পাঠে চল। ঘরে থেকে অন্য বিষয়ে মন দিয়ে কি হবে? কিন্তু বিদ্যামায়াতেও সমস্যা। নূতন জ্ঞান লাভে বাধা দেয়। অল্প জানাকে চূড়ান্ত মনে করায়। তর্কের ভাব আনে। অহংকার বাড়িয়ে দেয়। তাই দুটি মায়াকেই পরিত্যাগ করতে হবে।

প্রশ্ন হল, রামকৃষ্ণের বিদ্যামায়া কখন গেল? সাধন কুটীরে তোতাপুরী যখন অদ্বৈত জ্ঞানের শিক্ষা দিচ্ছেন তখন রামকৃষ্ণের সম্মুখে চিন্ময়ীকালী এসে বারবার বাধা দিচ্ছিল। জ্ঞান খড়্গ দিয়ে তিনি তা কেটে দিলেন, এই কালী এখানে তার বিদ্যামায়া। কালীকে কেটে দেবার ফলে আমি যে কালী দেখছি তাই চূড়ান্ত, কালী-ই ভগবান, কালী দেখেছি তাই ধর্মজগতে সব পাওয়া হয়ে গেছে– এই গোঁড়ামীর ভাব কেটে গেল। আরও জানার, পূর্নজ্ঞান লাভের পথ খুলে গেল।

জীবনকৃষ্ণ প্রথম বিদ্যামায়া দেখেন ষষ্ঠভূমিতে। দেখলেন, গরদের শাড়ী পরে এক ভক্তিমতী মহিলা, হাতে বই নিয়ে হেঁটে চলেছেন। বই দেখিয়ে বিদ্যা বোঝাচ্ছে। উনি বুঝলেন, এ বিদ্যামায়া। এরপর বেদান্ত সাধন কালে দেখেন আবার এক মহিলাকে। ওনার দেখেই মনে হল এ বিদ্যামায়া ছল করে ঘরে ঢুকেছে, উনি হাতের সামনে দেখতে পেলেন কাটারী, বঁটি ও জাঁতি। ঐ তিনটে নিয়েই তেড়ে গেলেন। বিদ্যামায়া পালাল। বিদ্যামায়া অপূর্ণতেই সাধককে পূর্ণ করেন। পূর্ণ বেদান্ত সাধন হলে তবে তো দেহে পূর্ণতা ফুটবে, ঈশ্বরত্ব লাভ হবে। তৃতীয় বার ঐ বেদান্ত সাধনের সময়েই আবার দেখেন বিদ্যামায়াকে।

এবার উনি টিকিট কেটে বিদ্যামায়াকে জাহাজে তুলে দিলেন। যেন আর কখনও ফিরে না আসে। সমুদ্র পেরিয়ে অন্য কোন দেশে চলে যাবে। অন্য দেশে গেল অর্থাৎ বিদ্যামায়ার কোয়ালিটির পরিবর্তন হয়ে গেল। বিদ্যামায়া পরিবর্তিত (transformed) হয়ে গেল, যেন ভাল কোনো রূপে (form-এ) আসবে। এই তাড়ানোর ফলে জীবনকৃষ্ণের দেহে বেদান্ত সাধন পূর্নমাত্রায় হতে পারল। এই দর্শনে বিদ্যামায়া চলে যেতেই উনি দেখেন একটা ছোট নৌকা। উনি তাতে বসলেন। নৌকা চলতে লাগল। যত যায় ততই নৌকাটা বড় হয়ে যায়, ক্রমে একটা বড় ময়ূরপঙ্খী নাও হয়ে গেল। উনি শুয়ে আছেন। ওনার হাতে নুন টেপা। শূন্যে একটা কুকুর ঘুরছে ওটা খাবার জন্য। এবার উনি লক্ষ্য করলেন একজন সাহেব নোঙরের দিকে মাথা করে শুয়ে আছে। নৌকাটা থামতেই সে উঠে তীরে নেমে গেল।

ঐ কুকুরটা হাতের নুনটা খেতে চেষ্টা করছে - এর অর্থ প্রচলিত ধর্মের সংস্কার রামরস বা একত্বের রসাস্বাদনে বাধা দিচ্ছে কিন্তু পারল না। প্রচলিত ধর্মীয় সংস্কারই বিদ্যামায়ার অস্ত্র।

প্রশ্ন হল, এই সাহেব কে? এখানে সাহেব হল জীবনকৃষ্ণেরই আত্মিকে পরিবর্তিত রূপ। জীবনকৃষ্ণ যেন জ্ঞান সমুদ্রের তীরে এসে নামলেন। তার জ্ঞান পূর্নতা পেল। সাহেব এখানে তীক্ষ্ণ বিচার জ্ঞান তথা ইউরোপীয়ান স্কলারশিপের প্রতীক। বেদান্তের সাধন শেষে বোধাতীত অবস্থায় প্রাণ চৈতন্য লয় হবার পর বোধ ফিরে এলে তত্ত্বজ্ঞানে অধিষ্ঠান হল তাঁর। এরপর অবতারতত্ত্বের সাধন শেষে অন্য প্রকৃতি নিয়ে বিদ্যামায়া জীবনকৃষ্ণের দেহে আশ্রয় লাভ করল। এই সময় জীবনকৃষ্ণ দেখলেন একজন নারী পিছন থেকে এসে ওনার বাহুর ঊর্ধ্বভাগে নিজের দুটি বাহু রক্ষা করল। তার স্পর্শে দেহটা যেন শীতল হয়ে উঠল এবং মনে ফুট কাটল এই বিদ্যামায়া। এই বিদ্যামায়া আশ্রয় করার ফলে ওনার দর্শন অনুভূতির কথা অপরকে বলবার সামান্য ইচ্ছা মনে জেগে উঠল। এর আগে তার মনের ভাব ছিল এই রকম যে - আমার এসব কথা বলার কি দরকার? ঠাকুরের জগৎ ঠাকুর বুঝুক। ভগবান, তোমার জগৎ তুমি বোঝাও। কিন্তু পরে ভাবলেন আমি বলাতে এদের যদি দ্বিতীয় স্তরেও কিছু দর্শন হয় তো হোক না।

তার ছাত্র তারাচরণ ও ভ্রাতৃপ্রতিম ফটিকের কাছে প্রথম মুখ খুললেন। সেই রাতেই তারা তাঁকে নিয়ে নানান দর্শন লাভ করল। বিভিন্ন মানুষ ওনাকে স্বপ্নে দেখে ওনার কাছে এসে তা বলতেন। উনি তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলতেন রামকৃষ্ণের দেওয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী তোমরা আমায় তোমাদের ভিতরে সচ্চিদানন্দগুরু রূপে পাচ্ছ। তারপর ধীরে ধীরে নিজের রামকৃষ্ণময় সত্তার আবরণ উন্মোচন করে বললেন, না, এ তো শুধুমাত্র সচ্চিদানন্দগুরু নয়। আত্মিকে তো দেখছি আমিই আছি। অখণ্ড এক ও তাঁর একত্বই রয়েছে। দুটি সত্তা তো নেই। আমিই আমাকে আবিষ্কার করছি। এই বোধে উত্তীর্ণ হতেই তার বিদ্যামায়া দূর হয়ে যাচ্ছে। বোঝা গেল প্রচারের প্রশ্ন নেই। তাই ব্যষ্টির সাধনে নয় তাঁর বিশ্বব্যাপীত্বেই বিদ্যামায়া অবিদ্যামায়া তাড়ানো কি তা স্পষ্ট হল।

এইবার দেখা যাক সমষ্টিতে ২য় স্তরে অর্থাৎ সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে বিদ্যা অবিদ্যার প্রশ্ন কখন থাকবে না। যদি কেউ একত্বলাভ করে একত্বের উপর ভিত্তি করে দর্শন অনুভূতির অনুশীলন করেন, তাহলে তিনিও বিদ্যামায়ার পারে যাচ্ছেন। কিন্তু যতক্ষণ ভূমি কোষের সাধন অর্থাৎ ব্যষ্টির সাধনের আলোচনা পাঠে প্রাধান্য পাবে ততক্ষণ ব্যাক্তিপুজার সংস্কার থাকবে, মানুষ থাকবে বিদ্যামায়ার অধীন। তাই আমাদের লক্ষ্য থাকবে আত্মিক একত্বের অনুশীলন। আমরা জীবনকৃষ্ণ সূর্যের আলো পেয়ে জেনেছি আমরা বাইরে বহু কিন্তু আত্মিকে এক। তাঁকে পেয়ে মনুষ্যজাতির মধ্যে যে একক প্রাণের বিকাশ ঘটছে তার রহস্য জানাই প্রকৃত ধর্মচর্চা।

স্মৃতিকথা

শ্রীজীবনকৃষ্ণের পূতসঙ্গ লাভে ধন্য কয়েকজনের টুকরো কিছু স্মৃতিকথা এখানে উল্লেখিত হল।

ক্ষিতীশ রায় চৌধুরী ঃ ০৯-১২-৬০-এ অভয় বাবু স্বপ্ন দেখেছেন - উনি বেলা এগারোটার সময় শ্রী জীবনকৃষ্ণের ঘরে বসে ভাত খেলেন। জীবনকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন সবাইকে, তোদের পেট ভরেছে? সকলে কিন্তু শুকনো মুখ করে রইল। তারপর দেখা গেল - এক একটা ভাত সকলের সামনে এসে

পড়ল। অভয় বাবু সে ভাতটা জিভ দিয়ে চেটে তুলে খেয়ে নিলেন। আর পেট ভরে গেল।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন - এর অর্থ কি? বললাম, আপনি খেলে জগতের খাওয়া হবে। উনি বললেন, বহুদিন আগের কথা, পশুপতি বলে একটি ছেলে এখানে আসত। তার বাবাও আসতেন। তিনি আবার ব্রাহ্ম সমাজেও যাতায়াত করতেন। তাকে বলেছিলুম - দেখুন, বেদান্তের ভেতর একটি মাত্র কথায় জন্ম-মৃত্যুর রহস্য ভেদ করা হয়েছে। আপনাদের আচার্যদের কাছে জেনে এসে বলবেন তো কথাটি কী? তিনি অবশ্য জিজ্ঞাসা করেন নি। কথাটি হচ্ছে - ''অজ'' (অর্থাৎ যে জন্মায় নি, তার আবার মৃত্যু কী?)। সে কথা এখন বলছি না। বোধিসত্ত্ব নাটকে অমরত্বের কথা যেমন কত আগে লিখে গেছি ''আজ পর্যন্ত মৃত্যু জগৎ কে শাসন করেছে - আমি মৃত্যুকে শাসন করব'' তেমনি টুকুটুকু কথা বহু আগে অনেক বলে গেছি। সেই পশুপতির বাবাকে বলেছিলাম - দেখুন, আজ পর্যন্ত সকলেই জগতের লোককে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে এসেছে। যদি কেউ মানুষকে তার পেটের ভাত থেকে রেহাই দিতে পারে, সেই-ই মানুষের যথার্থ কল্যাণ করবে। ... তাই জিজ্ঞাসা করছি অভয়ের স্বপ্নের কী অর্থ হতে পারে?

নিমাই ব্যানার্জী ঃ একদিন বিকেলে গিয়ে দেখি ঠাকুরের পিঠের ওপর এক জায়গায় শুঁয়ো পোকার কাঁটা লেগে ঘায়ের মত হয়েছে। সবাই জিজ্ঞাসা করছেন আর ওষুধ বাতলাচ্ছেন। উনি তখনই বলছেন, আচ্ছা ওতে ভাল হবে, নয়? তাহলে তাই দেবো। আর যে যা বলছেন উনি তাই লাগাচ্ছেন। ঘা-টা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে দেখে আমি বললাম, আপনার রোগের চেয়ে ওষুধ বেশি হয়ে যাচ্ছে। উনি হেসে উঠলেন, আর বললেন, ঠিক বলেছিস বাবা। যেন একেবারে বালকের মত অবস্থা। একজন ভদ্রলোক একটা কী ওষুধ এনেছেন। ওঁকে দেখালেন আর বললেন, খুব ভালো ওষুধ। দু'একবার লাগালেই সেরে যাবে। উনি আবার অবাক হয়ে ওষুধের গুণাবলী শুনে বললেন, তাই তো, ওটাই লাগানো হোক। তা কত দাম বাবা? ভদ্রলোক বললেন, না, না, ওর দাম লাগবে না, আমি এনেছি সামান্য দাম। উনি বললেন, তবে থাক বাবা, আমার রোগ সারিয়ে কাজ নেই। আমি বললাম, ৫টা ওষুধ লাগিয়েই রোগটা বেড়ে যাচ্ছে।

এতদিন আপনিই ভালো হয়ে যেত ওষুধ না লাগালেও। উনি শুনেই বলে উঠলেন, 'ঠিক বলেছিস বাবা, আমাদের এখানে সব জিনিসই আপনা থেকে হচ্ছে। কোন কিছু চেষ্টা করে করতে হয় না।'

অনাথ নাথ মণ্ডল ঃ একদিন স্বপ্ন বা অনুভূতি কমে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠায় ঠাকুর বললেন - স্বপ্ন বা অনুভূতি একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়া, আমারও হয় মাঝে মাঝে। একবার আমার বহুদিন স্বপ্ন বন্ধ ছিল। একদিন স্বপ্ন দেখছি - আমি যেন একটা ছোট নদীর ওপর বাঁশের সাঁকোর ওপর দুদিকে পা ঝুলিয়ে বসে আনন্দে হেলছি দুলছি। এমন সময় ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) আমার পেছন দিককার সাঁকোর মুখে দাঁড়িয়ে আঙুল নাড়িয়ে আদেশ করছেন চলে যেতে। আমি সেই দেখে সেখান থেকে চোঁচা দৌড় মেরে পালিয়ে গেলুম।

গৌরবাবু আর লোকেনবাবু দুজনেই ঠাকুরের ঘরে আসতে বড় দেরী করতেন। গৌরবাবু দেরী করতেন তার গরুর দুধ দোয়ানোর জন্য আর লোকেনবাবু দেরী করতেন অন্য কারনে। কিন্তু লোকেনবাবুর একটা পাটনাই ছাগল ছিল, খুব দুধ দিত । একদিন ঠাকুর, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের ব্রহ্মজ্ঞানের প্রসঙ্গে নগেনবাবুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, নগেনবাবু একটা কাজ করুন। গৌরের গরুটা এক হাতে আর লোকেনের ছাগলটা আরেক হাতে ধরে রাস্তা দিয়ে বলতে বলতে যান - 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'।

আশালতা বসু ঃ একবার কালী ব্যানার্জী লেনের বাড়িতে মেজ ছেলের অসুখ করেছে। উনি কেষ্ট মহারাজকে নিয়ে পেনিসিলিন কিনতে গিয়েছেন। যেতে যেতে বলেছিলেন, কেষ্টদা! কী হবে ওষুধ কিনে, বাড়িতে হয়ত এতক্ষণ কান্নার রোল উঠেছে। কেষ্ট মহারাজ বলেছিলেন, আসুনতো আপনি, চলুন। পরে কেষ্ট মহারাজ বলেছিলেন - আরে ভগবানেরও এত চিন্তা হয়?

জিতু চট্টোপাধ্যায় ঃ দক্ষিণেশ্বরে তখন একজন লোক থাকত। সে নিজেকে বলতো পরমহংস। লোকেদের কাছে গিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করত আর কানে মন্ত্র দিত। সে অনেক দিনের কথা, কুলার্নব তন্ত্রে আছে যার কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়েছে তার সামনে কুণ্ডলিনী জাগরণের কথা বললে সে ব্যাঙের মত লাফাতে থাকবে। সেবার আমি গেছি দক্ষিণেশ্বরে। সঙ্গে হেয়ার স্কুলের এক মাস্টার। বেলতলায়

বসেছি ধ্যান করতে, ধ্যানে যেন ডুবে যাচ্ছি। এমন সময় সে এসেছে আর মাস্টারের সঙ্গে কুণ্ডলিনী জাগরণের কথা বলছে। আমার কানে যেই না ওসব কথা ঢুকেছে আমি তো ব্যাঙের মত লাফাতে শুরু করেছি। তাই না দেখে সে তো মার ছুট্। ... তোদের কি কিছুর জন্য আটকাচ্ছে? কিছু না। তোরা জানিস না তোদের সকলেরই কুণ্ডলিনী জাগরণ হয়েছে। কুণ্ডলিনী জাগরণ হলেই যে ব্যাঙের মত লাফাতে হবে এমন কোন কথা নেই। ও প্রথম প্রথম হয় বটে, পরে ও জিনিসটা দেহের সঙ্গে মিশে যায়। তোদের সকলেরই অদ্ভুতভাবে কুণ্ডলিনী জেগেছে। কুণ্ডলিনী না জাগলে দেবস্বপ্ন দেখা যায় না।

———o———

পাঠপরিক্রমা - ১

(ঢাকুরিয়া সম্মেলনের (১০.১.২০১৬) একটি পাঠের নমুনা এখানে তুলে ধরা হল।)

ঠাকুর বললেন, ঈশ্বর কল্পতরু, যে যা চাইবে তাই পাবে। কিন্তু কল্পতরুর কাছে চাইতে হয়। তিনি ভাবগ্রাহী। যেমন ভাব তেমনি লাভ। একজন বাজীকর খেলা দেখাচ্ছে রাজার সামনে আর মাঝে মাঝে বলছে, ''লাগ ভেল্কি লাগ, রাজা টাকা দেও, কাপড়া দেও।'' এমন সময়ে তার জিভ তালুর মূলের কাছে উল্টে গেল। অমনি কুম্ভক হয়ে গেল। আর কথা নাই, শব্দ নাই, স্পন্দন নাই। তখন সকলে তাকে ইঁটের কবর তৈরী করে সেই ভাবেই পুঁতে রাখলে। হাজার বছর পরে সেই কবর কে একজন খুঁড়েছিল। ইঁটের দেওয়াল ভেঙে দেখে একজন সমাধিস্থ হয়ে বসে আছে। লোকে তাকে সাধু মনে করে পূজা করতে লাগল। এমন সময় নাড়াচাড়া দিতে দিতে তার জিভ তালু থেকে সরে এল। তখন তার চৈতন্য হ'ল। আর সে চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'লাগ ভেল্কী লাগ। রাজা টাকা দেও, কাপড়া দেও'।

ভেল্কি মানে যোগ। তাই ঠাকুর বলতেন, 'যোগমায়া ভেল্কি লাগিয়ে দেয়'। এখানে বাজিকর ঠাকুর নিজে। তাঁর প্রার্থনা, দেহ যোগযুক্ত হোক – যোগেতে ভেল্কি হয়, যোগের সেই মহাশক্তি জগৎ দেখুক তাঁর মধ্যে দিয়ে। রাজা অর্থাৎ ভগবান, টাকা অর্থাৎ আত্মিক সম্পদ – যোগৈশ্বর্য, দান করুন। 'কাপড়া দেও'। কাপড় মানে দেহ। অর্থাৎ তিনি প্রার্থনা জানাচ্ছেন ভগবান দেহধারী হয়ে দেখা দিয়ে তার মধ্যে লীলা করুন আর অপরের মধ্যেও শ্রীভগবান তাঁর চিন্ময় রূপ ধরে লীলা করে জানিয়ে দিন যে তিনি ঈশ্বরত্ব লাভ করেছেন তথা বাজীকর হয়েছেন। ঠাকুর বললেন, 'অবতারকে দেখাও যা ভগবানকে দেখাও তা'।

উনি ভগবানের কাছে কী চেয়েছেন তা রূপকের মোড়কে সযত্নে রক্ষিত হ'ল শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃতে। উনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলছেন যে হাজার বছর পরও কেউ না কেউ তাঁর কথার শব্দার্থ ভেদ করে মর্মার্থ আবিষ্কার করবে – কবরের ইঁটের দেওয়াল ভাঙবে এবং তার স্বরূপ জগতে প্রকাশ করবে।

মানুষ জানতে পারবে তিনি রাজাধিরাজের কাছে কী চেয়েছিলেন – কোন্ চৈতন্য চেয়েছিলেন ! ঠাকুরকে হাজার বছর অপেক্ষা করতে হয়নি। ১৮৮৬ সালে তার দেহাবসান হয়। আর শব্দার্থের শক্ত আবরণ ভেঙে তার কথার প্রকৃত অর্থ জগতের মানুষ শুনতে পেল ১৯৪৩ সাল থেকে। শব্দার্থের আবরণ ভাঙলেন একজন – তিনি শ্রী জীবনকৃষ্ণ। ঠাকুরের ''কাপড়া দেও'' প্রার্থনার এক অর্থ তুমি দেহবান হয়ে জগতে ধরা দাও। তার প্রার্থনা পুরণ হ'ল – আবির্ভাব ঘটল শ্রী জীবনকৃষ্ণের।

জীবনকৃষ্ণ এক স্বপ্নে বাবুর বাগানের রাস্তা ও জগতের রাস্তার মাঝে রুদ্ধ গেট খুলে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে কথামৃতের শব্দার্থের আবরণ খসে ভিতরের মর্মার্থ ধরা পড়তে লাগল তার কাছে। সেই মর্মার্থ শুনে মানুষের দর্শন অনুভূতি হতে লাগল – দ্রষ্টারা ঠাকুরের মূল বক্তব্য অনুধাবনে সমর্থ হতে লাগলেন। বুঝতে সক্ষম হলেন ঠাকুর কত বড় মানুষ আধ্যাত্মিক জগতে।

তিনি বললেন, ''মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য ভগবান দর্শন, ভগবান লাভ।'' ''মাইরী বলছি ভগবানকে দেখেছি। ভগবানকে দেখা যায়।'' ভগবানকে কি কি ভাবে দেখা যায় তার কথাই কথামৃতের ছত্রে ছত্রে লুকিয়ে আছে – সেকথা জানালেন শ্রী জীবনকৃষ্ণ।

আমরা জানলাম চৈতন্যলাভ মানে মন অন্তর্মুখী হওয়া, ঈশ্বরমুখী হওয়া – ''ঈশ্বর বস্তু আর সব অবস্তু –'' এই জ্ঞান লাভ করা।

এই ভগবান মন্দিরের পাথরের মূর্তি নয়। এক বাবা তার ছেলেকে নিয়ে মন্দিরে গেছে। ছেলে বলল, বাবা, ঐ দেখ একটা সিংহ। আমি যাব না, ভয় করছে। বাবা বলল, ওটা পাথরের মূর্তি, জীবন্ত নয়। ভয় করছ কেন ? ছেলে সাহস পেয়ে ভিতরে ঢুকল। বাবা এবার দেবমূর্তি দেখিয়ে বলল, প্রণাম কর ভগবানকে। এনার আশীর্বাদ পেলে তুমি অনেক বড় হতে পারবে, সব বাধা দূর হয়ে যাবে। ছেলে বলল, এটা তো পাথরের মূর্তি। এ তো জীবন্ত নয়। পাথরের সিংহ যদি আমায় খেতে না পারে পাথরের ভগবান আমাকে আশীর্বাদ করবেন কেমন করে ?

বাবা – চুপ। মিথ্যা কুসংস্কারের প্রথম বাধাটাই দূর করতে পারলেন না। এরা যে রামকৃষ্ণের কথা শোনেনি। তিনি বললেন ভগবানকে দেখা যায়।

কিন্তু কোথায় ? দেহমন্দিরের ভিতরে। এত কাছে তিনি, তবু মানুষ বাইরে ঘুরে মরে। সাপের মাথায় মণি আছে তবু সে ব্যাঙ খেয়ে মরে। ভিতরে ভগবান তবু মানুষ অহং-এর বিষয় নিয়েই থাকে। যাতে অহং বাড়ে সেই বিষয় নিয়েই আছে। ভাবে বাড়ি করেছি, এত সম্পদ জমিয়েছি – সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছি – সব আমার কৃতিত্ব। কিন্তু যে ভগবান দর্শন জীবনের উদ্দেশ্য সেই ভগবানকে দেখা হ'ল না – জীবন বৃথা কেটে গেল – একথা ভাবে না। বাইরের ব্যাঙ খেয়ে মরছে, ভিতরে পরম ধনের দিকে নজর নেই।

চৈতন্যলাভ হলে কী হবে ? আমার ভিতরে ভগবান, প্রতিটি মানুষের মধ্যে সেই একই ভগবান – এই জ্ঞান লাভ হলে মানুষটা বিষয়ে অনাসক্ত হবে, নির্লিপ্ত হবে। দেহস্থ চৈতন্যের রসাস্বাদন হবে। এই অবস্থাটা ঠাকুর উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন।

তিনি বলেছেন সংসারে থাক নষ্ট মেয়ে মানুষের মত। এ আবার কী কথা। বললেন, দেখ, নষ্ট মেয়ে ঘরের সব কাজ ঠিক ঠিক করে কিন্তু মন পড়ে থাকে উপপতির দিকে। পতি মানে অবলম্বন। মেয়ে মানুষ মানে ভক্ত। ভক্তের মন পার্থিব বিষয়ে আসক্ত থাকে না। যদিও বিষয় নিয়ে থাকতে হয় তবু তার মন পড়ে থাকে প্রকৃত স্বামী শ্রী ভগবানের দিকে, যাকে সামনে দেখা যাচ্ছে না, অলক্ষ্যে রয়েছেন, ভিতরে রয়েছেন—তাই উপপতি।

মন কিভাবে উপপতির দিকে ফেলে রাখতে হয় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন শ্রী জীবন কৃষ্ণ। তবে ভগবানের প্রতি ভক্তের যে ভালবাসা তার তিনটি পর্যায় আমরা দেখলাম তিনজন মহাপুরুষের জীবনে। মহাপ্রভু সবসময় ভাবে গর্গর মাতোয়ারা। শ্রীমতী রাধার ভাবে ভাবিত হয়ে আছেন তিনি। নিজেকে ভাবছেন শ্রীরাধা। আর শ্রীকৃষ্ণ তার প্রেমাস্পদ। কখনও অভিমান করছেন – কখনও ভাবছেন কৃষ্ণ এসেছেন কাছে – তাকে নিয়ে মত্ত। পরক্ষণে কৃষ্ণ চলে গেছেন ভেবে কৃষ্ণ বিরহে কেঁদে ভাসাচ্ছেন – 'হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ' করে ছুটে চলেছেন চটকপাহাড়ে অথবা যমুনা ভেবে ঝাঁপ দিচ্ছেন সমুদ্রে।

পরবর্তী যুগে পেলাম শ্রী রামকৃষ্ণকে। তিনিও সাধনের প্রথম অবস্থায় ভাবে থাকতেন। দাস ভাবে, সখী ভাবে, হনুমান ভাবে ইত্যাদি। সখী ভাবে

থাকার সময় মেয়েদের পোষাক পরে মেয়েদের সাথে থাকতেন। হনুমান ভাবে থাকার সময় কাপড়ের লেজ বেঁধে গাছে চড়ে থাকতেন। আর হুপ্‌হুপ্ করতেন। পরে বুঝলেন, ভাব কিছু সত্য নয়। এতো কল্পনা – আমি তো হনুমান নই। তার জীবনে একটা উত্তরণ দেখা গেল। চিরটা কাল হনুমান ভাবে, দাসী ভাবে বা সখী ভাবে কাটালেন না। তিনি বললেন, মা আমায় বলেছেন, তুই ভাবমুখে থাক। ভাবমুখে থাকাটা কি ?

ঠাকুরের কাছে যারা আসতেন তাদেরকে তিনি ভিতরে দেখতে পেতেন ও বুঝতে পারতেন আগন্তুক কালী ভক্ত, না বিষ্ণু ভক্ত, না রাম ভক্ত, নাকি নাস্তিক। তারপর তার সাথে তার ভাবে কথা বলতেন। কালী ভক্তের কাছে কালীর মহিমা আবার কৃষ্ণভক্তের কাছে কৃষ্ণের মহিমা বর্ণনা করতেন। তারা মুগ্ধ হতেন ঠাকুরের কথা শুনে। কেননা ঠাকুর পুরাণ কাহিনী ও প্রচলিত ব্যাখ্যার বাইরে গিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা তথা দর্শন উপলব্ধির কথা বলতেন। তাই প্রচলিত ধর্মীয় ভাবনা নূতন রূপ লাভ করত তার বর্ণনায়।

আবার যদি দেখতেন কারও নাস্তিক ভাব, তার সাথে ঈশ্বরীয় কথা বলতেন না। শিমুলিয়ায় রাজমোহন বাবুর বাড়িতে দেখলেন একটি ছেলে প্রার্থনা করছে, 'ঠাকুর, সব মনটি বিষয় থেকে কুড়িয়ে যেন তোমার পাদপদ্মে মগ্ন হয়'। ঠাকুর বললেন, ''তা আর হয়েছে !'' অর্থাৎ ছেলেটির কোন ঈশ্বরীয় সংস্কার নাই। সে লোকদেখানো প্রার্থনা করছে ব্রাহ্ম সমাজে। আবার বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে যখন যান, তখন দেখেন একটি ছেলে অর্থ সাহায্য চাইতে এসেছে বিদ্যাসাগরের কাছে। ঠাকুর তাকে দেখে বললেন, 'মা, এতো অবিদ্যার ছেলে'।

ঠাকুর উলুবনে মুক্ত ছড়াতে রাজী নন। পরবর্তীকালে আমরা পেলাম আর একজন মহাপুরুষকে। শ্রী জীবনকৃষ্ণকে। তারও জীবনের মূলমন্ত্র ছিল ''চরৈবেতি।'' তিনিও এক সময় কিছুদিনের জন্য ভাবমুখে ছিলেন। পরে জোর করে অপরের আত্মিক অবস্থা সম্পর্কিত দর্শন অগ্রাহ্য করতে লাগলেন – কে কৃষ্ণভক্ত, কে রামভক্ত, – এসব জেনে তার ভাবে কথা বলতে রাজী নন তিনি। ধীরে ধীরে নতুন এক অবস্থায় উত্তীর্ণ হলেন। তাঁর হ'ল – ''অভাবমুখ চৈতন্য''। তিনি অন্যের ভাব বুঝে কথা বলবেন না, নিজে যা সত্য উপলব্ধি করছেন তা-

ই বলবেন সকলকে। কেননা সত্য সর্বজনীন। কালীভক্তের কাছে একটা সত্য, কৃষ্ণ ভক্তের কাছে অন্য একটা সত্য, নিরাকার সাধকের কাছে পৃথক কোন সত্য আছে – এটা মানতে রাজী নন।

ঠাকুর কারও ভাব নষ্ট করতেন না। প্রত্যেকে তার নিজের ভাবে থাকত। ঠাকুর তার ভাবটিকে একটু উস্কে দিতেন – ও একটু শুদ্ধ করে দিতেন মাত্র। জীবনকৃষ্ণ নিজের ভাবে সকলকে টেনে নিতে শুরু করলেন। মানুষ তাকে ভিতরে পেয়ে, তাঁর রঙে রাঙা হয়ে, নিজের সম্প্রদায়গত বিচ্ছিন্নতা অতিক্রম করে সর্বজনীন সত্য উপলব্ধির সুযোগ পেল। তিনি বললেন, আমি যে সত্য জেনেছি তা হ'ল "একং সৎ"। একই আছেন। সেই এক অখণ্ড চৈতন্য একজন জীবন্ত মানুষের রূপ ধরে সর্বসম্প্রদায়ের সর্ব শ্রেণীর মানুষের অন্তরে চিন্ময় রূপ ধরে ফুটে ওঠেন। আমি সেই একের কথা বলি। সেখানে মানুষের সংস্কারের বা কল্পনার কোন রঙ লাগবে না। তখন কালী রূপ, কৃষ্ণরূপ, রামরূপ যে ভগবানের রূপ নয়, ভগবানের মহিমার প্রতীকি উপস্থাপনা মাত্র তা সহজেই ধারনা করা যায়। মানুষটা সংস্কারমুক্ত হয়। সংস্কারমুক্ত জীবনকৃষ্ণকে দেখে মানুষের সংস্কারমুক্তি ঘটতে থাকে। কৃষ্ণভক্ত বোঝে কৃষ্ণরূপের ও কৃষ্ণকাহিনীর দেহতত্ত্বের আসল ব্যাখ্যা কী। কৃষ্ণ তো প্রতীক-প্রতীকের ব্যাখ্যা জেনে – কৃষ্ণের রং কেন নীল, কেন তার হাতে বাঁশী এসব জানার পর সে সত্য জানতে পারে। সত্যিকারের কৃষ্ণ যে এই অন্তরে দৃষ্ট জীবনকৃষ্ণ তা অনুধাবন করতে পারে। প্রকৃত শিব যে সকল মানুষের মধ্যে আত্মিক ঐক্যবিধানকারী সর্বজনীন এক মানুষ তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তখন তারা জীবনকৃষ্ণের দেখানো দেহতত্ত্বের ব্যাখ্যা অনুশীলন করে ও দর্শন অনুভূতিকে ভিত্তি করে ঈশ্বরের সাথে একত্বলাভের জ্যোতির্ময় অন্তরের পথটি খুঁজে পান ও এগিয়ে চলেন।

পরশুদিন এক ছাত্রী (বন্যা চ্যাটার্জী, পার্বতীপুর, বীরভূম) একটা স্বপ্ন বলল। ও দেখেছে – নদীর দিকে যাচ্ছে – পথটা দু'ভাগ হয়ে গেছে। শর্টকাট পথ ধরে যাচ্ছে – নদীর চরে এক বয়স্ক ভদ্রলোক বসে। উনি বললেন, ঐ পথে যাচ্ছিস কেন ? ঐ পথে গন্তব্যস্থলে যেতে পারবি না। যদি এই পথে যাস, তাহলে

বিনা বাধায় গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবি – বলে তর্জনী নির্দেশে জ্যোতির্ময় একটি পথ দেখালেন। তারপর বললেন, তবে দেরী হতে পারে।... মায়ের ডাকে ঘুম ভাঙল।

আমি ওকে জীবনকৃষ্ণের ফটো দেখানোয় বলল, হ্যাঁ ইনিই ঐ স্বপ্নদৃষ্ট বয়স্ক লোক। প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, ঐ জ্যোতির্ময় পথটা কি' ?

জীবনকৃষ্ণ প্রদর্শিত দর্শন অনুভূতির মননের ধারা যাতে করে এককে জানা যায় – বহুর মাঝে এককে তথা বহুত্বে একত্ব আবিষ্কার করা যায়, তাই-ই ঐ জ্যোতির্ময় পথ। এক কথায় পরম একের সাথে একত্ব লাভের পথ। কেননা একত্ব লাভ করলে তবেই সেই অখণ্ড চৈতন্যকে তথা নিজের স্বরূপকে জানা যায়। সংস্কারমুক্ত হওয়া যায়।

আমাদের লক্ষ্য এই একত্বলাভ। যার সাথে একত্বলাভ জীবনের উদ্দেশ্য তিনি Perfect Man। নিখুঁত দেহ তার। তাই জগৎ-চৈতন্যকে তিনি ধারণ করতে পারেন। তার কাছে Perfectness চায় মানুষ – রাজা "কাপড়া দেও, টাকা দেও"। যিনি Perfect Man হবেন তিনি Universal হয়ে যাবেন। Perfect Man হিসাবে আমরা পেলাম জীবনকৃষ্ণকে। তিনি নিজেকে দান করলেন সকলের মাঝে। তাকে ভিতরে বারবার দেখে আমরা সংস্কারমুক্ত হই, Pure Man হই, পবিত্র হয়ে উঠি, Perfect Man এর সাথে একত্বলাভ করে নিরন্তর অনুশীলনে যুক্ত হলে, মানুষটা সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, True Man হয়। Perfct Man একজন, True Man অল্পকিছু মানুষ – আর অসংখ্য Pure Man হতে পারে। Perfect Man কে যারা অন্তরে দেখেনি তারা Good Man হতে পারে কিন্তু Pure Man হতে পারবে না – সংস্কারমুক্ত ও দেহজ্ঞানমুক্ত হয়ে মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের পরিচয় পায় না, ধারণা করতে পারে না।একথা বলা বাহুল্য যে দ্বিতীয় স্তরে প্রথমে সবাই Good Man থাকে। প্রত্যেকেরই Pure Man হওয়ার 100% Potentiality আছে। বর্তমান যুগে অখণ্ড চৈতন্যকে স্বপ্নে জীবনকৃষ্ণরূপে না দেখেও অন্য রূপে দেখে ধারাবাহিক চর্চার মধ্যে দিয়ে Pure Man হতে পারে। True Man-রা অন্যদের Pure Man হতে সাহায্য করে, কেননা তারা Perfect Man এর সাথে সদা যোগযুক্ত, ভাষান্তরে Per-

fect Man এর মিডিয়া (মধ্যমা) হিসাবে যেন কাজ করে।

'Be perfect as your father in heaven is perfect'. Heaven -এ নয়, ধরার ধূলিতে Perfect Man কে পাওয়া গেল। আর তার সাথে আত্মিকে এক হয়ে সাধারণ মানুষও Perfectness তথা ব্রহ্মত্বের আস্বাদন পাচ্ছে। ঈশ্বরের কাছে Perfectness চাইলেন ঠাকুর – আস্বাদন পেলেনও। তাই বিদ্যাসাগরকে বলছেন, এ পর্যন্ত ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই – ব্রহ্মের কথা কেউ মুখে উচ্চারণ করতে পারে নাই। বিদ্যাসাগর শুনে খুব খুশি।

আসলে, তার বক্তব্য— জগতে তিনিই প্রথম ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব আস্বাদন করেছেন যার অতীত রেফারেন্স নেই। তাই বললেন, মাইরী বলছি, ভগবানকে দেখেছি। বিভিন্ন দর্শনের কথা গল্প করে, রূপক করে বলে গেছেন। কিন্তু নিজেকে অন্যের অন্তরে দান করে তাদেরকে সেই ব্রহ্মত্ব আস্বাদন করাতে পারেন নাই। ফলে মানুষ তাঁর কথার মর্মভেদ করতে পারে নাই – তিনি যে ব্রহ্মের কথা বলছেন তা স্পষ্ট হল না মানুষের কাছে।

ঠাকুরের কাছে যখন পড়া হ'ল ব্রহ্ম বাক্য মনের অতীত, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, না গো, ব্রহ্ম শুদ্ধ মনের গোচর। কেননা তিনি যে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব আস্বাদন করেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষকে তা আস্বাদন করাতে পারলেন না। জীবনকৃষ্ণ নিজে ব্রহ্ম হয়ে অসংখ্য মানুষের মধ্যে নিজেকে দান করলেন – তারা তার ব্রহ্মত্ব আস্বাদন করতে পারছে – ব্রহ্ম কী মুখে বলতে পারছে। ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হ'ল। কিন্তু সাথে সাথেই বোঝা গেল চৈতন্যের সাগরে এককণা, অনুচৈতন্য, আমি। যুগ যুগ ধরে অসংখ্য মানুষ তাকে আস্বাদন করলেও তার পূর্ণত্ব বজায় থাকে। পূর্ণ থেকে যা আসে তা পূর্ণ আর যা অবশিষ্ট থাকে তাও পূর্ণ। ভুক্তাবশেষকে উচ্ছিষ্ট বলে। অবশেষ যদি পূর্ণ হয় তাহলে তাকে তো উচ্ছিষ্ট বলা যায় না। খাওয়ার পরও সবটাই যেন বাকী পড়ে রইল। তাই ঠাকুর বলছেন, ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন না। অসংখ্য মানুষ মানবব্রহ্ম জীবনকৃষ্ণকে ভিতরে দেখে, তাঁকে উচ্ছিষ্ট করে ঘোষণা করছেন, ব্রহ্ম জীবনকৃষ্ণ চিরকাল অনুচ্ছিষ্ট থেকে যান। তার পূর্ণত্ব নষ্ট হয় না। পরে তার দর্শনে ধরা পরে যে এক অখণ্ড চৈতন্য তিনি, তিনি শাশ্বত – তার বাইরে আত্মিকজগতে কিছু নাই।

তখন উচ্ছিষ্ট করার পর তার সাথে একত্ব লাভ করে আবার বলা যায় তিনি উচ্ছিষ্ট হন না, কেননা তিনি নিজেই নিজের চৈতন্যের রস আস্বাদন করেন।

এই একত্বলাভ হলে সেই পূর্ণ পুরুষের পূর্ণত্বের কথা, তার মহিমার কথা মানুষকে বলা যায়। তখন আর আদেশের প্রশ্ন ওঠে না। দ্বৈতবাদে থাকলে, আদেশ না পেলে অন্যকে ভগবানের কথা বলা যায় না। ঠাকুর উপমা দিয়েছেন – ওদেশে হালদার পুকুর বলে একটি পুকুর আছে। মেয়েরা ঐ পুকুরের জলে রান্না করত। ঐ জল খাওয়া হ'ত। কিন্তু তার পাড়ে লোকে বাহ্যে করত। দূর্গন্ধ উঠত। শেষে গ্রামের বয়স্ক লোকেরা আলোচনা করে ঠিক করল কোম্পানীকে জানানো হোক। কোম্পানী একজন চাপরাশী পাঠালো। সে প্লাকার্ড মেরে দিল "এখানে বাহ্যে করিও না।" অমনি বাহ্যে করা বন্ধ হ'ল।

চাপরাশী হ'ল আধিকারীক পুরুষ। হালদার পুকুর – ধর্মশাস্ত্র- বেদ ।

বাহ্যে করা কি ? – সংস্কারজ বিধিবাদীয় ধর্মীয় আচার পালন। পাথরের মূর্তিকে ভগবান ভাবছি। তাকে সোনার গয়না দিয়ে আসছি পার্থিব কামনা পূরণের আশায়। ভাল লোক মন্দ লোক সবার ক্ষেত্রে মরলেই শ্রাদ্ধ করা হচ্ছে – পিণ্ডি চট্‌কে বেনা গাছে প্রেতাত্মাকে খেতে দেওয়া হচ্ছে। ধর্মের নামে অমানবিক সব আচরণ করা হচ্ছে। এগুলো ধর্ম নয় – এই হ'ল বাহ্যে করা। মেয়েরা জল পাচ্ছে না – ভক্তরা, মুমুক্ষুরা ভগবৎ তৃষ্ণা মেটাতে পারছে না। চাপরাশী অর্থাৎ অবতার পুরুষ, আধিকারীক পুরুষ শাস্ত্রের মর্মার্থ ধরিয়ে দিলে, ধর্মের মানবিক ও কল্যানকর দিকটি ধরা পড়ে। ভক্তদের দর্শন অনুভূতি হয় - – এবং ভগবৎ তৃষ্ণা মেটে। ঠাকুর শ্রীমকে বললেন, স্বপ্নে যদি আমায় ধর্ম উপদেশ দিতে দ্যাখো জানবে সে আমি নই, সে সচ্চিদানন্দ। মাস্টারমশাই বুঝলেন, ঠাকুর তাঁর সচ্চিদানন্দ গুরু। ভগবান এই রূপে তাকে শিক্ষা দিচ্ছেন। একবার শ্রীম স্বপ্নে দুর্গাপূজা করার নির্দেশ পান। ঠাকুরকে সেকথা বললেন। ঠাকুর শুনে বললেন, তা ইচ্ছা হলে করতে পার। মাস্টারমশাই বুঝলেন, সংস্কারজ মূর্তি পূজার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন থাকলে ঠাকুর তা করার নির্দেশ দিতেন। উনিও পুজো করলেন না। জানলেন, স্বপ্ন নির্দেশটা হ'ল তাঁর একটা পরীক্ষা। বহু প রে, ঠাকুরের দেহ যাবার পর একবার মাঠাকরুন শ্রীম'র বাড়ীতে

আছেন, বললেন, আমি দুর্গাপূজা করব ঘটে পটে। তুমি সব ব্যবস্থা করে দাও। মাস্টারমশাই আয়োজনের কোন ত্রুটি রাখলেন না। শেষে ঠাকুর ও মাঠাকরুনের একটি ফটো ওখানে রেখে বললেন, মা এই আমার শিবপার্বতীর ছবি, এটি এখানে রইল, তুমি তোমার মনের মত করে পূজা কর।

ঠাকুরের দেহ যাবার পরের বছর বাবুরাম মহারাজের মা (আঁটপুরের) স্বামীজি ইত্যাদি সকলকে ডেকে পাঠালেন বাড়ীর দুর্গাপূজোয়। শুনে স্বামীজি বললেন, বাবুরামের মায়ের বৃদ্ধবয়সে কি মতিভ্রম হয়েছে ? জ্যান্ত দুর্গা থাকতে মাটির দুর্গা নিয়ে মাতামাতি করছে।

ঠাকুরের কথা শুনে ধারণা হয়েছে যে মানুষ ভগবান। এই জ্ঞান হলে বৈধী ধর্মের সংস্কার মুক্ত হয় মানুষ – তারা নির্মল হালদার পুকুর পায় – তাদের জগৎটি সংস্কারমুক্ত হয়। এই যে পাঠচক্র, এটি হ'ল হালদার পুকুর – সংস্কারমুক্ত জগৎ। এখান থেকে ভগবৎ তৃষ্ণা মেটাবার উপাদান পাব, আপনাদের দর্শন অনুভূতি ও উপলব্ধির কথা শুনে। ঠাকুরের কথায় মানুষ সংস্কারমুক্ত হ'ল। কিন্তু তাকে তো আর স্থূলে পাচ্ছি না। বলবেন, কেন, তার বাণী তো রয়েছে। কিন্তু পাত্র বুঝে তিনি যে উপদেশ দিচ্ছেন তা তো পাচ্ছি না। পরে পেলাম শ্রীজীবনকৃষ্ণকে। তিনি স্বপ্নে ঠাকুরের আদেশ পেয়ে ঠাকুরের কথাগুলির মর্মার্থ সহজ ভাবে ধরিয়ে দিলেন। তখন আমরা কথামৃত রূপ হালদার পুকুরের জল পেতে সক্ষম হ'লাম। কথামৃতের শব্দার্থ ধরে নানা রকম ভ্রান্ত ব্যাখ্যা যা আমাদের বিভ্রান্ত করে ও পুনরায় সংস্কারে আবদ্ধ করে সেখান থেকে যেন মুক্তি পেলাম। জীবনকৃষ্ণের দেওয়া দেহতত্ত্ব যারা জানে না তারা কথামৃত পড়ে দ্বিগুণ উৎসাহে কালীপূজা করেন।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ ধর্ম ও অনুভূতির ১ম ও ২য় ভাগ লিখলেন, আদেশ পেয়ে। কিন্তু ৩য় ভাগ লেখার জন্য আদেশের অপেক্ষা করেন নি। কার আদেশ পাবেন ? তিনি যে তাঁর নিজস্ব সত্য উপলব্ধির কথা বলবেন। এতো আর কথামৃতের ব্যাখ্যা নয়। কথামৃতকে উপলক্ষ্য মাত্র করে বিশ্বব্যাপিত্বের আলোকে, একত্বের আলোকে, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে মানব সত্য বিবৃত করেছেন।

এই ৩য় ভাগ তথা জীবনকৃষ্ণের উপলব্ধ সত্য মানুষের কাছে বলতে

গেলে আদেশের প্রয়োজন নেই। কিন্তু জীবনকৃষ্ণের সাথে আত্মিক একত্ব লাভ হলে তবেই আপনি তার কথা বলতে পারবেন। রামকৃষ্ণের বক্তব্য স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য জীবনকৃষ্ণ হয়েছিলেন রামকৃষ্ণ ময়। ঐ রকম ভাবে অর্থাৎ বস্তুতত্ত্বের সাধনে জীবনকৃষ্ণময় হওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই তিনি যদি কৃপা করে তার সাথে এক করে নেন, একত্বদান করেন তাহলে আর আদেশের প্রশ্ন উঠবে না। তখন আপনি তার কথা ঠিক ঠিক ভাবে বলার অধিকারী। কারণ তখন ভিতরে যা দেখছেন, তার মর্মার্থ বুঝতে পারবেন আপনি। একত্বলাভ না হলে তার কথা ঠিক ঠিক বলা যায় না।

ঠাকুর ঈশান মুখুজ্জের উদ্দেশ্যে বলছেন, ৩০ বছর মালা জপে তবু কিছু হয় না কেন ? আমাদেরকেও দুঃখের সাথে বলতে হয় – ৩০ বছর কথামৃত ও ধর্ম অনুভূতি পাঠ করে ও সেই পাঠ শুনে বহু মানুষ জীবনকৃষ্ণকে স্বপ্নেও দেখে তবু পাঠকের একত্বের ধারণা হয় না কেন ? এ যেন ওষ্ঠে ঠেকানো আছে অমৃত ভাণ্ড অথচ পান করছে না। অমৃত পান হলে, একত্বের ধারণা লাভ হলে বিধিবাদীয় ধর্মের সব সংস্কার চিহ্নিত (Identify) করা যায় ও আপনা হতে সেসব খসে যায়। যা এক জ্ঞানের বিরোধী সেই সব ভাবনা মাথা থেকে সরে যায়। যেমন পুনর্জন্মের ভাবনা ইত্যাদি।

ঠাকুর বললেন, কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা করতে হয়। কি করে করবে ? কায় মানে কায়া – তোমার দেহটিকে নিয়ে গিয়ে ফেল যেখানে ভগবৎ অনুশীলন হচ্ছে। পায়ে হেঁটে সেখানে যাও। হাত দিয়ে সেবা কর – রান্না করে ভক্তদের খাওয়াও। মন দিয়ে তার মহিমা স্মরণ মনন কর – ধ্যান চিন্তা কর। বাক্যে তার স্তবস্তুতি ও প্রার্থনা কর।

আমরা কি ভগবানকে সেবা করতে পারি ? না পারি না। ভগবান-ই আমাদের কায়মনোবাক্যে সেবা করেন। তিনি একটি জীবন্ত মানুষের চিন্ময় রূপ ধরে আমাদের ভিতরে ফুটে ওঠেন। তাকে দেখার পর মনন হয়, বোধ হয়, ইনি আমার প্রিয়তম। এক লহমায় এই উপলব্ধি হয়। স্বামী, পুত্র পিতা মাতা থাকা সত্ত্বেও তাকে-ই প্রিয়তম বলে বোধ হয়। এই মনন তিনিই করিয়ে নেন। কারও বা দর্শন পেয়ে উপলব্ধি হয় ইনি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ। ঠাকুর বলেছেন, শুদ্ধ

মনও যা শুদ্ধ বুদ্ধিও তা, শুদ্ধ আত্মাও তা। অন্তরে তাই ঈশ্বরের প্রকাশে আমাদের মনও আংশিক শুদ্ধ হয়। শুদ্ধবুদ্ধি জাগে, ঈশ্বরকে ধারণা করার শক্তি জাগে। আর বাক্যের দ্বারা সেবা ? দেখা দিয়ে বলেন, 'আমি কে জানিস? আমি ভগবান'। কাউকে বলেন, দ্যাখ তুই ও আমি এক – বলে দ্রষ্টার দেহে ঢুকে যান। পরে বোঝান তিনিই সমগ্র মনুষ্যজাতি হয়েছেন। কাউকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে দেন, বলেন, 'পাঠ আছে, যা। দেরী হয়ে যাবে যে'! ঘুম থেকে উঠে তাড়াতাড়ি গিয়ে দ্রষ্টা পাঠে যোগ দেয় ঠিক সময়ে। কাউকে বলেন, 'ভয় কী ? চিন্তা কী ? আমি তো আছি'। এইভাবে বাক্যের দ্বারা তিনি আমাদের সেবা করেন। কখনও উপদেশ দেন, ভুল করলে ভুলটা ধরিয়ে দেন। কখনও তিরস্কার করেন। কখনও বা আদর করেন। এসবই তাঁর সেবা। আমরা তার সেবা করতে পারি না। আমরা ঋণশোধ করি। কিন্তু তার ঋণ কি শোধ করা যায় ? মাকে যতই যত্নে রাখা যাক্ না কেন সন্তান কি মায়ের ঋণ শোধ করতে পারে ? তবু চেষ্টা করতে হয়।

শোধও করতে হবে কায়মনোবাক্যে। কায়া অর্থাৎ দেহটি এই যে এনেছেন পাঠচক্রে। তারপর যা শুনছেন তা বিচার বিবেচনা করে অন্তরে গ্রহণ করতে হবে। পাঠক যা বলছেন তা নির্বিচারে সত্য বলে গ্রহণ করা যাবে না। যুক্তি বিচার বোধ জাগ্রত রেখে অযৌক্তিক ও অলীক জিনিস বাদ দিয়ে সঠিক কথাগুলি বেছে নিতে হবে। পাঠক যা বলছেন তা-ই সত্য মনে করলে, ধৃতরাষ্ট্রকে স্বামী জ্ঞানে, প্রভু জ্ঞানে অনুসরণ করে গান্ধারী যেমন চোখে পটি বেঁধেছিল, আপনিও তেমনি পাঠকের প্রতি শ্রদ্ধাবশত অন্ধভাবে পাঠকের কথা মেনে চললে আপনার অজান্তে পাঠকের সংস্কার আপনার মধ্যে সংক্রামিত হয়ে যাবে। উনি বলেছেন, এই করতে হয় আর এই করতে নাই – আপনি চোখ বুজে তা মানবেন কেন ? পাঠকেরও ভুল হতে পারে। আপনি প্রশ্ন করুন, তাতে পাঠকেরও লাভ হবে, পাঠকের ধারনাও স্বচ্ছ হবে, তার ভাবনাও ত্রুটি মুক্ত হবে। আর আপনারও লাভ হবে। ঠাকুর বলছেন, মনে না নিয়ে মেনে নেওয়া ? তুমি ঢং কাঁচ দেখছি। ঢং কাঁচ হলে হবে না। আপনি বুদ্ধি বিচার বোধ খোলা রাখবেন। প্রশ্ন করুন। পাঠকের যুক্তিতে Satisfied হলে তাকে অন্তরে গ্রহণ

করতে হবে। ঢং কাঁচ হলে তার দ্বারা জগতের কোন কল্যাণ হয় না, উপকার হয় না। অনেকে বলে, আমি পুজো তুলে দিয়েছি, আমি প্রসাদ খাই না। কিন্তু যদি তাকে প্রশ্ন করা হয় কেন প্রসাদ খান না ? তখন উত্তর দিতে পারবে না। অনেকে বলে আমরা জীবনকৃষ্ণের পাঠে যাই – আমাদের প্রসাদ খেতে নেই, শ্রাদ্ধ করতে নেই ইত্যাদি। একী কথা ! পাঠক বলেছেন, তাই প্রসাদ খান না। যুক্তি দিয়ে বিষয়গুলো বুঝতে হবে। পাঠকের নিজের কোন কথা নেই। তিনি রামকৃষ্ণ ও জীবনকৃষ্ণের কথা বলেন। আর ধর্ম জগতে এরা দু'জনই যুক্তি দিয়ে, ধর্ম কথা বলেছেন। সেই যুক্তিগুলো জেনে নিতে হবে। তাঁরা সত্য দর্শন করেছেন। সেই দর্শন ও অনুভূতির কথা বলেছেন। জীবনকৃষ্ণ আমাদের অনুভূতি দান করছেন।

কিন্তু শুধু দর্শন হলে হবে না – তা ধারণা করতে হবে। আমি বাজারে গেলাম, দিপালীদির সাথে দেখা হ'ল। আর দিপালীদিকে দেখলাম। কথা দুটির মধ্যে বিস্তর ফারাক। দেখলাম মানে শুধুই দেখেছি, কোন কথা হয় নি। উনি আমাকে দেখেন নি। আর দেখা হ'ল মানে পরস্পর পরস্পরকে দেখেছি ও কথা হয়েছে। একটা হ'ল Cognition (চেনা) আর অপরটা হ'ল Recognition (চেনা ও জানা)। দেখা হ'ল – এটি Recognition - এটিই কাম্য।

স্বপ্নে যা দেখলেন, তা Cognition, কিন্তু কি দেখলেন, তা প্রতীকার্থ ভেঙে যখন ভিতরের অর্থ বুঝলেন তখন সত্যিকারের দেখা হ'ল। তখন হ'ল Recognition। একজন স্বপ্নে জীবনকৃষ্ণকে সূর্যের মধ্যে দেখেছে। সে যখন জীবনকৃষ্ণের কাছে এল এবং দর্শনটি বলল, জীবনকৃষ্ণ ধরিয়ে দিলেন, পাঁচখানা উপনিষদে বলছে, সূর্যের মধ্যে যাকে দেখা যায় সেই সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ হলেন পরমব্রহ্ম। দেখাচ্ছে, মানুষ ব্রহ্ম – আর তাকে দেহের ভিতর দেখা যায়। স্বপ্নদ্রষ্টার তখন স্বপ্নটা পুরো দেখা হ'ল। Recognition হ'ল। তিনি জানলেন পরমব্রহ্ম কি এবং তাঁকে তিনি অন্তরে দর্শন করেছেন। তার আগে স্বপ্ন দেখলেও কাকে দেখলেন, কেন দেখলেন তা জানা হয় নি। তাকে দেখার তাৎপর্য বা গুরুত্ব জানা হয় নি। যত এই অনুশীলন হবে, স্বপ্নের বা দর্শনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হবে ততই সত্যের ধারণা হবে।

পাঠচক্রে গিয়ে পাঠের বিষয় নিয়ে মনন ও আলোচনায় যোগ দেওয়া ও নিজের দর্শন বলায় কায়মনোবাক্যে সেবা সম্পূর্ণ পায় না। এবার ঈশ্বর সম্বন্ধে যেটুকু ধারণা লাভ হয়েছে তা অন্যদের বলতে হবে, অর্থাৎ আপনাকে পাঠ করে শোনাতে হবে। আপনার মুখে ভগবৎ মহিমা শুনে যদি কেউ ব্রহ্মানন্দের স্বাদ পায় তাহলে সেবা করা হয়। এই সেবা যুগপৎ বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই পান। কেননা উভয়েই ব্রহ্মানন্দে অভিষিক্ত হন। পরে আপনি ধীরে ধীরে ব্রহ্মসমুদ্রের সাথে একত্ব উপলব্ধি করবেন – দূর থেকে সমুদ্র দেখা নয়, আপনার অজান্তে সমুদ্রে নেমে পড়েছেন, সমুদ্র অপনাকে গ্রাস করেছে। তখন অদ্বৈতবাদে উত্তীর্ণ হবেন। তখন বুঝবেন, এ মোটেই ঋণশোধ নয়, এ যে ব্রহ্মসমুদ্রে উত্থিত আনন্দ তরঙ্গের আপনবেগে ছুটে গিয়ে ছড়িয়ে পড়া। চৈতন্য সাগরে তরঙ্গের এই ক্রমাগত ওঠা পড়া ও বহু দেহে ছড়িয়ে পড়ার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলাই আধ্যাত্ম জীবনের চরম্ সার্থকতা॥

আত্মিকে সমগ্র মনুষ্যজাতি ব্যাপ্ত এক অখণ্ড চৈতন্যের সাথে অর্থাৎ ব্রহ্মের সাথে একত্ব লাভ হলে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা যাবে। একত্ব লাভকারীর দেহটি থাকবে সর্বদা যোগযুক্ত, দেবস্বপ্ন বা ব্রহ্মবিদ্যার কথা শোনামাত্র দেহ সাড়া দেবে। বিধিবাদীয় ধর্মের সকল সংস্কার ত্যাগ হয়ে যাবে। অন্যের স্বপ্নকেও নিজের দর্শন বলে বোধ হবে, গুরুত্ব দিয়ে তা শুনবেন ও ব্যাখ্যা করে আনন্দ পাবেন ও শিক্ষালাভ করবেন। তার জীবনে Simplicity মূর্ত হয়ে উঠবে অর্থাৎ জীবন হবে অতি সহজ সরল। আর তিনি দর্শন অনুভূতির অনুশীলনে নিরন্তর যুক্ত থাকবেন। It will be a part and parcel of his life.

আমাদের প্রার্থনা আমাদের জীবনেও এই চর্চা স্থায়ী হোক, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আমরা যেন ব্রহ্মবিদ্যা তথা আত্মিক একত্বের অনুশীলনে রত থাকতে পারি। পরম এক তথা শিবের মাথা থেকে আগত জ্ঞান গঙ্গায় অবগাহন করে ধন্য হই।

—o—

পাঠ পরিক্রমা – ২

(গত ১৮-১২-২০১৬ তারিখে কোলকাতার বেলেঘাটায় আয়োজিত মহাসম্মেলনে পরিবেশিত একটি পাঠের বক্তব্য এখানে তুলে ধরা হল।)

একসময় ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন, 'মা, কেশবকে ভালো করে দাও। কলকাতায় গেলে আমি কার সঙ্গে কথা কব?' তাহলে আমরা কি ধরব? কলকাতায় কি আর লোক নেই? মানুষ নেই? আসলে ঠাকুরের সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা বলবার মত উপযুক্ত মানুষ নেই। আজ বেলেঘাটা সম্মেলনে এসে সেই কথাটা আমার প্রথমে মনে পড়ছে। কেন? দেখুন, এযুগে আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। কলকাতায় এসে এই পাঠচক্র পাচ্ছি, এখানে এসে বহু মানুষকে পাচ্ছি আমার প্রিয়তম জীবনকৃষ্ণের কথা বলবার এবং শোনবার জন্য। আচ্ছা, এই যে এতো মানুষ রয়েছেন যাদের সঙ্গে share করতে পারছি আমার অভিজ্ঞতার কথা, অনুভূতির কথা, দর্শনের কথা, এখন কথা হচ্ছে, মানুষ কাকে বলে?

ঠাকুর বলছেন, মানুষ কে? না, যার মান সম্পর্কে হুঁশ হয়েছে, চেতনা হয়েছে, সেই মানুষ। মান কি? মান মানে হচ্ছে ওজন। নিজের ওজন কি করে জানব? দাঁড়িপাল্লায় চেপে? ঠাকুর কিন্তু সেই ওজনের কথা বলছেন না। তাহলে এই ওজনটা আমরা কি করে মাপব? আমরা যখন কোনো উদ্ভিদের ওজন নিই তখন কি করি? নিয়ম হচ্ছে ওটাকে ওভেনে (oven) চাপিয়ে, গরম বাতাস প্রবাহিত করে তার dry weight বা শুষ্ক ওজন নিই, স্থায়ী ওজন নিই। এখন মানুষের ক্ষেত্রে শুষ্ক ওজনটা অর্থাৎ তার আত্মিক ওজনটা কি করে নেব? তার জন্য তার মধ্যে যে বিষয় জল রয়েছে, সেইটাকে আগে শুকিয়ে নিতে হবে। বিষয় জল যদি সরে যায় তাহলে আপনার আত্মার ওজনটা আপনি জানতে পারবেন। এখন বিষয় জল কি করে সরবে? দেহজ্ঞান কি করে কমবে? শ্রীভগবানের মুখ নিঃসৃত অমৃতবাণী শ্রবণ করলে, আর তাঁরই কৃপায় আপনার যদি দর্শন অনুভূতি হয়, সেই দর্শন অনুভূতির কথা শুনলে আপনা হতে দেহ থেকে বিষয় জলটা বেরিয়ে যায়। এইরকম অনেকের দর্শন হয়। আমার একটা

স্বপ্ন হয়েছিল এইরকম যে পাঠ হচ্ছে, পাঠ শুনতে শুনতে অবাক হয়ে দেখছি শ্রোতাদের সকলেরই দেহ থেকে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ বিষয় জল বেরিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় মানুষটা তার নিজের আত্মিক ওজন জানতে পারে।

আত্মার পরিচয় প্রথম আমরা জানলাম জীবনকৃষ্ণের কাছ থেকে। আত্মা কাকে বলে? আত্মা সাক্ষাৎকারের পরে আত্মার ওজন উনি কিভাবে জানলেন? উনি বলছেন, দেহের শক্তির সার সহস্রারে অঙ্গুষ্ঠবৎ আত্মা রূপে দেখা গেল – সচ্চিদানন্দগুরু দেখিয়ে দিলেন। তারপর আত্মার সাধন বা বেদান্তের সাধন শুরু হল ওনার দেহেতে। বেদান্ত সাধনের প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞানের ফুট কাটতে শুরু করল। স্থান ও কালের লয় সম্পর্কিত অনুভূতি হতে লাগল। উনি স্বপ্ন দেখলেন, গোটা কোলকাতা শহরটা ঘুরে দেখছেন। এক একদিন এক এক জায়গায় যাচ্ছেন। উনি বলছেন কলকাতার প্রতিটি অলিগলি আমার নখ দর্পনে এসে গেল, জানা হয়ে গেল। তাহলে কলকাতা এত বড়ও বটে আবার ছোট্টটি হয়ে আমার ভিতরেও রয়েছে। তাহলে গোটা কলকাতা, এই বাড়ি ঘর ট্রাম বাস সব কিছু নিয়ে কি ওনার ভিতরে? তা কিন্তু নয়। গোটা কলকাতা ওনার ভিতরে মানে কি? কলকাতার মানুষের প্রাণশক্তির নির্যাস যেন দাঁড়িপাল্লার এক দিকে চাপালেন আর একদিকে উনি নিজে চাপলেন। নিজের আত্মার ওজনটা পেতে চাইছেন। ধরা যাক, তখন কলকাতায় ৫ লক্ষ মানুষ ছিল। তাহলে কলকাতার ৫ লক্ষ মানুষের প্রাণশক্তির নির্যাস কি ওনার আত্মিক ওজনের সমতুল্য? না, কেননা তার পরে কলকাতার বাইরেও বিভিন্ন স্থান স্বপ্নে দেখতে লাগলেন। পরে দেখলেন, হ্যাঁ বাস্তবেও জায়গাটা ঠিক সেই রকমই। নমুনা হিসাবে আপনাদেরও সেরকম অনুভূতি হয়। ধরুন আপনি স্বপ্নে দেখলেন, আপনি পুরী গেছেন। পুরীর রাস্তা ঘাট দেখলেন, পুরীর দোকান পাট দেখলেন, পরে আপনি গিয়ে দেখলেন আরে এ রাস্তা তো আমার দেখা, দোকান পাট তো আমার দেখা, আমার চেনা। এইরকম ভাবে উনি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা স্বপ্নে দেখেছেন। পরবর্তীকালে উনি যখন বিলেত গিয়েছিলেন তার আগে কিন্তু লণ্ডনের রাস্তাঘাট, যে বাড়িতে উনি ছিলেন এমনকি Imperial Bank-ও ওনার দেখা। ওনার সাথে যে ৪/৫ জন গিয়েছিলেন তাদেরকেও উনি guide করলেন, চলো

এইখানে ব্যাঙ্ক আছে, এখানে যেতে হবে। এইভাবে সমস্ত উনি guide করতেন। উনি বলতেন, ঠাকুর আমাকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান এমন স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন যে পৃথিবীর মানচিত্র আমি এঁকে দিতে পারি । শেষে ওনার বিশ্বরূপ দর্শন হল। অনেক উপরে উঠে শূন্য থেকে দেখছেন পৃথিবীটা, তখন উনি বুঝলেন, আত্মিকে সমগ্র জগৎ ওনার ভিতরে। এখন সমগ্র মনুষ্যজাতির প্রাণশক্তির নির্যাস চাপানো হল দাঁড়িপাল্লার একদিকে আর একদিকে উনি। এবার কিন্তু দু'দিক সমান হল। তাই ভগবান বা আত্মার একটি নতুন সংজ্ঞা দিলেন তিনি। সম্পূর্ণ নতুন সংজ্ঞা যেটা পৃথিবীর কোন ধর্মশাস্ত্রে নেই। উনি বললেন, আত্মা কি? What is God? It is the Sum total of essence of life Power of whole human race. সমগ্র মনুষ্যজাতির প্রাণশক্তির নির্যাসের ঘনীভূত রূপ হল আত্মা । এই আত্মাকে দেহের ভিতর দর্শন করে নিজের মান বা ওজন সম্পর্কে ওনার চেতনা হল যে আত্মিকে সমগ্র মনুষ্যজাতির প্রাণশক্তির নির্যাসের ঘণীভূত রূপ হচ্ছেন উনি। আর ওনার এই ধারণার সমর্থনে বহু মানুষের অনুভূতি হতে শুরু করল।

এই বিশ্বরূপ দর্শনের পরে ওনার যখন বিশ্ববীজবৎ অনুভূতি হল তখন উনি নিশ্চিন্ত হলেন। বেদান্তে বলছে বীজ আর বিরাট দুইই এক। বিশ্ব বীজবৎ অনুভূতি হবার পর উনি বুঝলেন যে বীজ রূপে ওনার মধ্যে যা রয়েছে এইটাই এই বিরাট মনুষ্য জাতির প্রাণশক্তির নির্যাসের সমষ্টি, সারিভূত রূপ। আর মানুষ তার প্রমাণ দিল কিভাবে? মানুষ স্বপ্নে সূর্যের মধ্যে ওনাকে দেখতে লাগল। উনি বললেন, দেখ আমরা বলি যে সকল শক্তির উৎস হচ্ছে সৌরশক্তি। সূর্য থেকে সব শক্তি এসেছে। তোরা কি প্রমাণ দিচ্ছিস? তোদের প্রাণশক্তির সমষ্টি হচ্ছি আমি। তোদের দর্শনই তার প্রমাণ দিচ্ছে। মানুষের দেহজ্ঞান তাঁর আত্মিক ওজন বোঝার পক্ষে বাধা স্বরূপ। ওনার দেহজ্ঞান কমতে কমতে শূন্য হল - আর তখনই অসীম আত্মিক ভার সম্পন্ন হলেন। সুশীল ব্যানার্জী স্বপ্নে শোলার জীবনকৃষ্ণ দেখলেন - আবার কেশব সাহা দেখলেন, শোলার গোল পাতার মত একটা বস্তু ঘুরতে ঘুরতে সূর্য হয়ে গেল - আলো বিকিরণ করতে লাগল, আর সেই সূর্যের মধ্যে জীবনকৃষ্ণকে দেখা গেল।

উনি বলছেন, বিশ্বরূপ দর্শনের অনুভূতিতে স্থানের লয় হল মানে পৃথিবীর যে কোন জায়গায় একটা মানুষ থাকুক তার সাথে ওনার স্থান ব্যবধান ঘুচে গেল। মনুষ্যজাতিকে উনি ভিতরে পেলেন, মনুষ্যজাতিও ওনাকে ভিতরে পেল। এর সাথে সাথে উনি আর একটা জিনিস বললেন, কালের লয়। স্থানের সাথে কাল সম্পৃক্ত হয়ে আছে, যেমন একটা শাড়ীর সাথে তার পাড় রয়েছে। অন্য একটা কালার দিয়ে পাড়টা বোনা হয়েছে। একেবারে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে। বেলেঘাটা CIT building এর government quarter এর কথা যদি বলি তাহলে সময়টা উল্লেখ করতে হবে। কারণ হয়ত এই জায়গাটার পরিবর্তন হয়ে যাবে কালকেই। তাহলে সময়ের সাথে স্থানের একেবারে ওতপ্রোত যোগ। দুটোকে আলাদা করা যায় না। ওনার যখন স্থানের নাশ হল, সাথে সাথে কালেরও নাশ হল। সাত দিন পর একটা ঘটনা ঘটবে সেটা আগেই উনি স্বপ্নে দেখলেন। ৭ দিন পর দেখলেন ঠিক সেই ঘটনাটাই ঘটল। ক্রমাগত দেড় বছর ধরে এমনটি হতে থাকল। আগেই উনি দেখে ফেলেন কি ঘটবে আর ঠিক সেই ঘটনাটাই ঘটছে। তখন উনি বুঝলেন যে হবে নয়, হয়েই আছে। তাহলে ভবিষ্যৎ নয় বর্তমান। আবার অতীতের ঘটনাও তিনি দেখছেন। কি রকম? উনি বলছেন, তোরা যেমন সিনেমা দেখিস্ ঠিক সেইরকম ভাবে আমি দেখেছি রামকৃষ্ণের জীবন। একেবারে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি স্বপ্নে দেখেছেন। বলছেন, আমি এত details এ দেখেছি আর সেকথা যখন বলি তোদের মাথায় কেন strike করে না? তোরা ভাববি হয়ত আমি বই দেখে বলছি, কিন্তু তখন তো এসব বই বেরোয়নি। এটা ঠিক, এখন প্রচুর বই বেরিয়েছে, নানা তথ্য বেরোচ্ছে। কিন্তু জীবনকৃষ্ণ যখন রামকৃষ্ণের কথা খুঁটিনাটি বলছেন তখন ঠাকুরের সম্পর্কে এই তথ্যগুলো প্রকাশ হয় নি। উনি বলছেন, আমি কোথা থেকে জানলুম বল দেখি? সমস্ত কিছু উনি স্বপ্নে দেখেছেন। তাহলে অতীত দেখেছেন। এই অতীত আর বর্তমান এক হয়ে গেল। আবার ভবিষ্যৎ দেখছেন, সেটাও বর্তমানে দেখছেন। তাহলে অতীত আর ভবিষ্যৎ বর্তমানের সাথে এক হয়ে গেল, - রইল চিরন্তন বর্তমান। তাহলে কাল ব্যবধান ঘুচে গেল। উনি কালাতীত হলেন।

এই স্থান কাল নাশ হওয়ার effect কি? স্থান ব্যবধান ঘুচে যাওয়ার জন্য পৃথিবীর যে কোন জায়গার মানুষ ওনাকে দেখতে পাচ্ছে। আর কাল ব্যবধান ঘুচে যাওয়ার জন্য কি হল? ধরো তোমরা এই যুগে জন্মেছ, ১৯৬৭-র পরে জন্মেছ তো? কিন্তু জীবনকৃষ্ণের সঙ্গে কাল ব্যবধান আছে কি? না, এখন যারা জন্মেছে তারা জীবনকৃষ্ণকে তিন রূপেই দেখছে। শিশু রূপে দেখছে, বন্ধু রূপে দেখছে, আবার বৃদ্ধ রূপে দেখছে। যখন শিশু রূপে দেখছে, তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে? এখন যে শিশু সে দ্রষ্টার দেহ যাবার পরও থাকবে। অর্থাৎ ভবিষ্যতেও সে থাকছে। আবার এখন যাকে তুমি বৃদ্ধ রূপে দেখছ, সে তোমার অতীত সব জানে। তাহলে তোমার অতীত জুড়ে আছেন জীবনকৃষ্ণ, তোমার ভবিষ্যৎ জুড়ে আছেন জীবনকৃষ্ণ। আবার বন্ধু রূপেও দেখছ, তাহলে বর্তমানেও আছেন, তোমার তিন কাল জুড়ে তিনি রয়েছেন। তাহলে তিনি কালের গণ্ডী অতিক্রম করেছেন এবং সব মানুষের সাথে তার কাল ব্যবধানটা ঘুচে গেছে। স্থানের নাশ হয়েছে ও কালের নাশ হয়েছে, তাই তিনি হলেন সর্বজনীন এবং সর্বকালীন। এটা তাঁর দর্শন অনুভূতির effect. আত্মিকে তিনি তাঁর weight টা বুঝতে পারলেন। তাঁর অসীম ভারটা জানতে পারলেন। এই অসীম ভার ও অসীম গতি সম্পন্ন হলে কি হয়?

বিজ্ঞানীরা বলছেন যে বাইরের জগতে যে মহাকাশ বা মহাশূন্য সেটা যেন পাতলা একটা রাবারের চাদর। তার উপর সূর্য রয়েছে, পৃথিবী রয়েছে, অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র সব রয়েছে। এইবার যে বেশি ভারি হবে, সে চারপাশের জায়গাটাকে বসিয়ে দেবে, Dipressed হয়ে যাবে জায়গাটা। যেমন, সূর্য খুব ভারি। তার ফলেতে তার চারপাশের space টা দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে। এখন কাছে পিঠে যে সমস্ত গ্রহ রয়েছে, তারা সরলরেখায় ছুটতে যাচ্ছে কিন্তু দোমড়ানো space -এ চলার পথ বাঁক নিতে বাধ্য হচ্ছে, ফলে তারা সূর্যকে গোল করে ঘুরছে। দূরে সরে যাচ্ছে না। অর্থাৎ তাদেরও স্থান কালের নাশ হচ্ছে। আবার ধরা যাক কেউ একজন বাংলাদেশে সকাল ৫.৩০মি. -এ সূর্যোদয় দেখলেন। সাথে সাথে দ্রুতগতি কোন যানে ৩০ মিনিটে কলকাতায় এলেন। তাহলে একই সময়ে একই স্থানে সূর্যোদয় দেখবেন। তাহলে তার স্থান কালের নাশ হল। যখন

ভিতরে তুমি জীবনকৃষ্ণকে দেখতে পেলে, তখন কি হল? তোমারও স্থান কালের নাশ হল। তাহলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষেরও স্থান কালের নাশ হচ্ছে, যখন তার সাথে একত্ব লাভ হচ্ছে। জীবনকৃষ্ণের রূপে তোমার ভিতরে যখন দেবত্ব জাগরিত হচ্ছে তখন তার পরিণতি কি? তোমারও স্থান ও কালের নাশ হয়ে যাচ্ছে। স্থান ও কালের নাশ হলে কি হবে? না তোমার সাথে আমারও স্থান ব্যবধান ঘুচে যাচ্ছে, পরস্পর পরস্পরকে আত্মীয় রূপে উপলব্ধি করছি, তাই না? অপরিচিত মনে হচ্ছে না, আত্মীয় মনে হচ্ছে। স্থান ব্যবধান ঘুচে যাচ্ছে। আর কালের নাশের effect কি ? মানুষ নিজের মৃত্যুঞ্জয় সত্তাটাকে আবিষ্কার করতে পারে, তার মৃত্যুভয় ঘুচে যায়। সব ভয়েরই উৎস এই মৃত্যুভয়। মৃত্যুভয় ঘুচে গেলে কি হয়? মানুষের মাথা থেকে যদি ভয়টা চলে যায় তখন সে পরিপূর্ণভাবে এই ব্রহ্মানন্দকে উপভোগ করতে পারে। না হলে সেই হিল্লোলটা ভিতরে জাগবে না। ভয় থাকলে, চাপ থাকলে, সেই আনন্দটা জাগবে না পূর্ণ মাত্রায়।

তাহলে যে মানুষ তাঁর আত্মার মান জেনেছেন তিনি মান-হুঁশ তথা মানুষ হয়েছেন। তিনি সর্বজনীন ও সর্বকালীন মানব হয়ে ওঠেন। তাঁকে অন্তরে দর্শন করে অপর সকল মানুষ জীবসীমা অতিক্রম করে মানব সীমায় উত্তীর্ণ হতে পারেন। কেন বলছি যে এতগুলো মানুষকে আমি কাছে পেয়েছি ? কেননা কলকাতায় কিন্তু অল্পই মানুষ আছে, অনেক লোক আছে, মানুষ কম আছে। মানুষ কে হবে? যিনি এই সর্বজনীন সর্বকালীন মানবকে অন্তরে পাবেন। পেলেই কিন্তু হল না, দেখলেই হল না। আপনি জীবনকৃষ্ণকে দেখেছেন মানেই মানুষ হয়েছেন তা কিন্তু নয়, কেন? তাঁকে অন্তরে পাবার পরে জীবসীমা অতিক্রম করে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হতে হবে। তাহলে এই জীব-সীমাটা কি? জীবের ধর্ম কি? সাধারণ ভাবে বলা যায় জীবেরা পরস্পর হিংসা করে, তারা সংকীর্ণতার ঊর্দ্ধে ওঠে না, দেহসুখ নিয়েই থাকে। জীবনকৃষ্ণ বলছেন, জীবের ধর্ম কি? গতানুগতিকতা। কত গভীরে গিয়ে উনি একথা বলেছেন। কত হাজার বছর থেকে মৌমাছি যে ছ'কোনা ঘর করছে আজও তাই করে চলেছে। বাবুই পাখী যেভাবে বাসা বুনত আজও কিন্তু সেই একইভাবে বাসা বোনে, আর

গুহাবাসী মানুষ আজ ১২৫ তলায় বাস করে। আজকে East facing তো কাল বলছে West facing ঘর চাই, ঘরটা আবার Revolving হবে অর্থাৎ ঘুরবে, নাহলে পোষাচ্ছে না মানুষের। কেন? কেননা মানুষের মধ্যে অনন্তের প্রকাশ, অসীমের প্রকাশ।

জীবের ধর্ম গতানুগতিকতা আর শিবের ধর্ম নিত্য নতুনকে আবিষ্কার করা। তাই ঠাকুর বলছেন মানুষের মধ্যে তাঁর বেশি প্রকাশ। দেখছ না হাতি এত বড় জন্তু সে ঈশ্বর চিন্তা করতে পারে না। ঈশ্বর অসীম অনন্ত, সে-ই ঈশ্বরের চিন্তা করছে যার মধ্যে অসীমের প্রকাশ হচ্ছে। মানুষ যখন প্রথম ঈশ্বর চিন্তা করতে শুরু করল তখন কি করল? একটা কাল্পনিক ঈশ্বর ধরে নিল। এই কাল্পনিক ঈশ্বর ধরে নিলে কিন্তু মানুষ অসীম হচ্ছে না, তার একটা সীমাবদ্ধতা থেকে যাচ্ছে। সে অসীম হয়ে উঠতে পারছে না। অসীমকে ভাবতে পারছে কিন্তু নিজে অসীম হয়ে উঠতে পারছে না। অসীম হতে গেলে এই কাল্পনিক ঈশ্বর ছেড়ে মানুষটাই ব্রহ্ম তা জানতে হবে। মানুষের মধ্যে দেবতাকে খুঁজতে হবে। প্রথম আমরা দেখলাম মানুষকে ঈশ্বর ভাবতে আরম্ভ করল কিছু মানুষ, একজন বিশেষ মানুষকে পেয়ে। কাকে পেয়ে? শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে পেয়ে। তারা বলল চৈতন্য অবতার। একজন মানুষের মধ্যে এবার অনন্ত ঈশ্বরকে খোঁজার চেষ্টা শুরু হল। তিনি অবতার পুরুষ, তাঁকে আমরা পেলাম। কিন্তু মানুষ জীবসীমা অতিক্রম করতে পারল না, কেন? কারণ মহাপ্রভু যে শিক্ষাটা দিলেন মানুষ সেটা গ্রহণ করতে পারল না। তিনি জগন্নাথধামে গেছেন, জগন্নাথের মূর্তির দিকে তাকিয়ে কাঁদছেন আর জগন্নাথের মহিমার কথা ভাবছেন। আর তাঁর ভক্তেরা করল কি, জগন্নাথের একটা বিগ্রহ মূর্তি গড়ল, তার পূজা আচ্চা শুরু করল। ভোগ রাগ শুরু করল। এ তো মহাপ্রভু করেন নি। মহাপ্রভুকে ঠিক ঠিক অনুধাবন করা হল না। এরা তাদের আগের সংস্কারকে একটু পালটে নিল, সংস্কার কিন্তু রয়েই গেল। একটা সীমাবদ্ধতা থেকেই গেল। এরপর এলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ। চৈতন্যভক্তরা অধিকাংশই আবার রামকৃষ্ণকে গ্রহণ করতে পারল না। তারা বলল, চৈতন্য তো কলির অবতার, রামকৃষ্ণ আবার কে? তাহলে তারা একটা সীমাতে আটকে গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ যে ঈশ্বরের নতুন

প্রকাশ, এটা কিন্তু ধারণা করতে পারল না। আবার যারা রামকৃষ্ণকে নিল তারাও জীবসীমা অতিক্রম করতে পারল না। তারাও পরবর্তীকালে বেলুড় মঠের দিকে তাকিয়ে থাকল, বেলুড়মঠ রামকৃষ্ণকে যেভাবে বর্ণনা করছে তারাও সেইভাবেই বুঝছে, মঠে গিয়ে দীক্ষা নিচ্ছে। অত বড় পরমহংস আবার তিনি অবতার, তাঁর জীবন ও বাণীর গভীরে যাওয়া হোলো না।

তাহলে মানুষ রামকৃষ্ণকে পেয়েও জীবসীমা অতিক্রম করতে পারল না। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঠাকুরের সঙ্গ করেছেন, ঠাকুর তার কত প্রশংসা করছেন। অদ্বৈত বংশে তার জন্ম। সেই বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পরবর্তীকালে গেরুয়া ধারণ করলেন, গয়ায় পিণ্ড দিতে যাচ্ছেন ইত্যাদি নানা সংস্কারজ কাজ করছেন। তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে নতুনের প্রকাশকে তিনি গ্রহণ করতে পারলেন না, জীবসীমা অতিক্রম করা হোলো না, জীবসীমায় আটকা পড়ে গেলেন।

আমরা এরপর পেলাম জীবনকৃষ্ণকে যিনি সংস্কারের মূলে, গভীরে, কুঠারাঘাত করলেন। অনেক অপ্রিয় কথা পরিষ্কার করে বলছেন। এখানেও কিন্তু আমাদের নিজেদেরই প্রশ্ন করতে হবে - আমরা কি জীবসীমা অতিক্রম করতে পারছি? কেউ বলবেন, তিনি করাবেন। কিন্তু আমরা দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারি না। তিনি করাবেন ঠিকই, আমাদেরও কিন্তু কিছু ভূমিকা আছে। সব জীবনকৃষ্ণ করাবেন এটা খুব ভুল কথা - আপনারও ভূমিকা আছে বলেই আজ আপনি এখানে এসেছেন। তিনি কর্তা হলেও আমাদেরও কিছু ভূমিকা আছে। এই নিয়ে একজনের (বরুন ব্যানার্জী) স্বপ্ন হয়েছে। সে দেখছে তার মাথার ডানদিকে অঙ্গুষ্ঠবৎ আত্মা। কিন্তু ও নিজেই ভাবছে আমি কেন সামনে তাকিয়ে আছি? সামনে পর্দায় সেই অঙ্গুষ্ঠবৎ আত্মার একটা প্রতিচ্ছবি পড়েছে। একটা ছায়া পড়েছে, সেটা মানুষের মূর্তির মত একটা Shadow। সেইটার দিকেই তাকিয়ে আছে আর নিজেই বিশ্লেষণ করছে স্বপ্নদ্রষ্টা যে আমারই মাথার ডানদিকে অঙ্গুষ্ঠবৎ আত্মা রয়েছে, অথচ আমি তার প্রতিচ্ছবির দিকে তাকিয়ে আছি!

সত্যের দিকে তুমি তাকাও, আর কিছু তোমায় করতে হবে না।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন - প্রভাতের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। তোমাকে সূর্যকে আবিষ্কার করতে হবে না, সূর্যকে তুলে নিয়ে আসতে হবে না। শুধু এই ইচ্ছা প্রকাশ করো যে আমি সূর্যের আলো দেখব, সূর্যের মহিমা দেখব, তাহলেই দেখতে পাবে। শুধু চোখ মেলে তাকালেই দেখতে পাবে। এটুকুই তোমার ভূমিকা। ঐদিকে তাকাও। আমরা কিন্তু তাকাই না। একজন মানুষকে গুরু করে তার দিকে তাকিয়ে থাকি – তার বাণী নিজের দর্শনের সাথে মেলাই না। আমরা আমাদের দর্শন অনুভূতির বিশ্লেষণ করি না। সেইগুলোর স্মরণ মনন করি না। আজকে যেটা দেখলাম, ভালো লাগল - আমরা সেটা ডায়েরীতেও নোট করি না। ডায়েরীতে নোট করা থাকলেও পরবর্তীকালে ডায়েরীটা আর খুলি না। কিন্তু এই সামান্যতম ভূমিকা তো আমাদের আছে।

এইবার জীবনকৃষ্ণের জীবনের মূল বাণীটিকে বুঝতে হবে, যা হল - চরৈবেতি। উনি রামকৃষ্ণময় হলেন। তারপর, ১৯৪২ সালের পর বহু মানুষ তাকে ভিতরে দেখতে শুরু করল। উনি বলছেন তোরা যে আমায় দেখ্‌ছিস, ঠাকুরের ভাষায়, সে হল সচ্চিদানন্দগুরু লাভ। ঠাকুর বলছেন না, তুমি যদি আমায় স্বপ্নে উপদেশ দিতে দেখ, জানবে সে আমি নই, সে সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দ আমার রূপটা ধরে গুরুরূপে তোমাকে শিক্ষা দিচ্ছে। সচ্চিদানন্দগুরু ভগবানকে দেখিয়ে দেন। পরবর্তীকালে সেই জীবনকৃষ্ণই কি বলছেন? তোরা যে আমায় দেখিস সে কি আমি? না রে, সে ভগবান।

উনি বলছেন, আমাকে যে তোরা দেখছিস্ সেটা সচ্চিদানন্দগুরু নয়, সেটা ভগবান দর্শন। পরবর্তীকালে আবার কি বলছেন? ভক্ত ভগবান নয়, সে তো দ্বৈতবাদ হয়ে গেল। তুই আর আমি এক। একই আছে। এই যে তোরা এতগুলি এখানে আছিস্, তোরা সকলেই আমাকে স্বপ্নে দেখেছিস্, তোরাই আমাকে এই সত্য জানালি যে আমিই আছি। ওরে আত্মিক জগতে একজনই আছে, বহু নাই। আমার অহংকার ভাঙার জন্য ভগবান এই ব্যবস্থা করেছেন। আমি কার কাছে অহংকার প্রকাশ করব? আমিই তো এতগুলি হয়ে বসে আছি, দ্বিতীয়জন যে কেউ নাই। এই যে ক্রমাগত উত্তরণ হচ্ছে, এই উত্তরণটাই আমাদের বুঝতে হবে, না বুঝলে, ঐ দিকে তাকিয়ে না থাকলে কি হবে দেখুন,

চর্চায় না থাকলে আমার কোন ভূমিকা নাই বললে আজ কি হয় দেখুন, আমরা পত্রিকায় ছাপিয়ে বের করছি সচ্চিদানন্দগুরুর লীলা কাহিনী। এত বছর পরেও সচ্চিদানন্দগুরুর লীলা কাহিনী! তাহলে জীবনকৃষ্ণ যে এগিয়ে গেলেন, এক এবং একত্বের কথা বলেছেন সেটা আজও আমরা ধরতে পারছি না, আমরা এগিয়ে যাচ্ছি না, জীবসীমায় আটকা পড়ে যাচ্ছি। এইখানে আপনার আমার একটু ভূমিকা আছে। বহু মানুষকে দর্শন অনুভূতি দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিচ্ছেন তাঁর মহিমা, সেদিকে আমাদের কানটা দিতে হবে, মনটা দিতে হবে। আমরা তা করি না। একটা স্বপ্ন দেখলাম, স্বপ্নটা পাঠকের কাছে গরগর করে বলে গেলাম, ব্যস আমার duty শেষ। এইগুলো নিয়ে একটু ভাবতে হবে। আমরা ঐখান থেকে নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে যাই, কেননা ভাবতে গেলে যে বুদ্ধির আলোটা জ্বালাতে হবে, তেল খরচা হবে। আমরা তেল খরচ করতে নারাজ। বুদ্ধির আলোটা জ্বালাতে আমরা নারাজ। চরৈবেতি মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে জীবসীমা অতিক্রম করতে হবে। এই জীবসীমা অতিক্রম করলে তবে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হবেন। মানবসীমায় উত্তীর্ণ হলে তবে ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়া হবে, সে চলার কোন বিরাম থাকবে না।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে কথামৃতে উল্লেখিত শ্রীম-এর একটি দর্শন। নিশ্চয় সকলেরই পড়া আছে। শ্রীমকে উনি বলছেন, কিছু স্বপ্ন দেখেছ? উনি বলছেন, হ্যাঁ। ঠাকুর বললেন, একটা বলতো? এবার শ্রীম তাঁকে একটি স্বপ্ন বললেন, তিনি দেখছেন, চারিদিক জলে জল। সেখানে অনেকগুলি নৌকা। হঠাৎ উনি দেখছেন, একটা প্রবল জলোচ্ছ্বাস এল। সেই জলোচ্ছ্বাসে নৌকাগুলো টুপ টুপ করে ডুবে গেল। উনি আর কিছু মানুষ চেপে রয়েছেন একটা জাহাজে। জাহাজ থেকে দেখছেন যে সমুদ্রে জলের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন এক ব্রাহ্মণ। উনি ব্রাহ্মণটিকে বলছেন, আপনি যে জলের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছেন - আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছে না? ব্রাহ্মণ বললেন, না, আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না। শ্রীম জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? ব্রাহ্মণ বললেন, আমি ভবাণীপুর যাচ্ছি। শ্রীম বললেন, দাঁড়ান, আমিও যাব। ব্রাহ্মণ বললেন, তোমার ঐ জাহাজ থেকে নামতে দেরী আছে। আমার এখন তাড়া আছে আমি চললুম। তুমি এই

পথটা দেখে রাখো। জলের তলায় সাঁকো আছে, আমি সেই সাঁকোর উপর পা ফেলে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছি, যার জন্য আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না। কিন্তু তোমার জাহাজ থেকে নামতে এখনও দেরী আছে। এই হল স্বপ্ন। তখন উনি বললেন - তোমার স্বপ্ন শুনে আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে। তুমি শীঘ্র মন্ত্র লও।

এখন স্বপ্নটার মধ্যে একটা বার্তা আছে। সেই বার্তাটা খোঁজা আপনার কাজ। আপনি ভাবছেন আপনার কোন ভূমিকা নেই! এই স্বপ্নের মানেটা কি ? আপনি ভাবেন নি স্বপ্নটি নিয়ে। নিজেকে প্রশ্ন করুন আপনি কতটুকু ভেবেছেন। এই স্বপ্নটির বিশ্লেষণে আসা যাক্। প্রবল জলোচ্ছ্বাস — একটা নতুন যুগের সূচনা। জগতে একটা নতুন চৈতন্যের ঢেউ আসছে রামকৃষ্ণের দেহকে কেন্দ্র করে। আধ্যাত্মিক জগতে একটা নতুন ঢেউ এসেছে - তারই কথা বলছে এই স্বপ্নটা। সেই ঢেউ কি করছে? না ছোটো ছোটো নৌকাগুলোকে ডুবিয়ে দিচ্ছে। এই ছোটো ছোটো নৌকাগুলো হচ্ছে মানুষগুরু। মানুষগুরুর যুগের এবার অবসান হবে, জেগে উঠবে সচ্চিদানন্দগুরুর যুগ। ঐ জাহাজটা হচ্ছে সচ্চিদানন্দগুরু। ঠাকুর এবার বহু মানুষের অন্তরে সচ্চিদানন্দগুরু রূপে পরিস্ফূট হবেন, মানুষকে ভবসাগর পার করাবেন, সেই জাহাজে উঠেছেন মাষ্টারমশাই (শ্রীম)। তিনি ঠাকুরকে বার বার স্বপ্নে দেখছেন ভিতরে অর্থাৎ সচ্চিদানন্দগুরু লাভ করেছেন। আর ঐ ব্রাহ্মণটি কে? ব্রাহ্মণ মানে ব্রহ্মবিদ পুরুষ। এই ব্রহ্মবিদ পুরুষটি কে? উনি ঠাকুর স্বয়ং। উনি বলছেন, আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না। কেন অসুবিধা হচ্ছে না, কারণ জলের নীচে সাঁকো রয়েছে। সাঁকোর উপর দিয়ে আমি চলে যাচ্ছি। এখন এই সাঁকোটা কি আমাদের তা জানতে হবে। এই সাঁকোটা হচ্ছে ঠাকুরের দর্শন অনুভূতি এবং উপলব্ধির পরম্পরা। পরপর তাঁর দর্শন হয়ে গেছে, সেখান থেকে তিনি তাঁর উপলব্ধিতে পৌঁছেছেন। সেই উপলব্ধি ধরে তাঁর জীবনচর্যার পরিবর্তন ঘটেছে, তিনি এগিয়ে গিয়েছেন। যেমন, এক সময় তিনি পুজো করতেন। ফুল তুলতে গেলেন। হঠাৎ দেখছেন সেই বিরাটের মাথায় ফুলগুলো। অর্থাৎ ঈশ্বরের মাথাতেই সেই ফুলগুলি রয়েছে। তাই ফুল তুলতে পারলেন না। উনি বললেন, আমার ফুল তুলে পুজো করা বন্ধ হল। বেলপাতা তুলতে গেলেন, ছিঁড়তে গিয়ে দেখছেন গাছ থেকে রক্ত ঝরছে। উনি

বলছেন, বাবা! গাছটাও চৈতন্যময়! সেদিন থেকে বেলপাতা তোলা বন্ধ। ওনার বাহ্য পুজোই শেষ কালে উঠে গেল। এই হল জীবনচর্যার পরিবর্তন। উনি সত্যের দিকে ধীরে ধীরে এগোচ্ছেন। শেষে কোথায় গিয়ে পৌঁছালেন? সেই যে জগৎ-চৈতন্য যাকে তিনি খুঁজছিলেন তাকে তিনি ভেতরে পেলেন।

এই উত্তরণ কিভাবে হল? এগিয়ে গেলেন কিভাবে? কোন সাঁকোর উপর দিয়ে তিনি হেঁটে গেলেন? তাঁরই দর্শন অনুভূতিকে ভিত্তি করে তিনি এগিয়ে গেলেন। তাহলে এই সাঁকোটা হল তাঁর দর্শন অনুভূতি ও উপলব্ধির পরম্পরা, সেইটা ধরে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন। আর কি বলছেন? আমার অসুবিধা হচ্ছে না। কেন? এই সত্য পথে যাবার কালে জোটপাট হচ্ছে। মথুরবাবু সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, বলছেন - বাবা তোমার কোন চিন্তা নেই, তুমি যেভাবে চাইবে সেইভাবে এগোও। কার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে যে তোমাকে disturb করবে? তোমাকে পুজো করতে হবে না, আমি তোমাকে Pension (পেনশন) দেব। তুমি পূজারী ছিলে, মাইনে পেতে, এখন থেকে Pension পাবে। তুমি তোমার নিজের মত চল। কালী ঘরে বসে তিনি আল্লা নাম জপ করেছেন, খ্রিষ্ট মতে সাধন করেছেন, কোন বাধা এল না। আবার সাধন সহায়ক লোকও জুটে গেল। এই জোটপাটটা কি করে সম্ভব হল? ভগবানের কৃপায়। তিনি মথুর বাবুকে সেখানে জুটিয়ে দিয়েছেন। ভৈরবী ও তোতাপুরী স্বপ্নাদেশ পেয়ে তাঁর কাছে এলেন। তবে তো সম্ভব হয়েছে। তাহলে বাইরেও জোটপাট হওয়া দরকার। এই যে আপনাদেরকে পেয়েছি, আলোচনা করা যাচ্ছে, কথা বলা যাচ্ছে, এইটা জোটপাট, তিনি করে দিয়েছেন, তবে সম্ভব। তাহলে বাইরের জোটপাট আর ভিতরে একটার পর একটা দর্শন অনুভূতি লাভ করে তিনি সত্যের পথে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছেন।

আর বলছেন, জাহাজ থেকে তোমার নামতে দেরী আছে - এই জাহাজ থেকে নামাটা কি? জাহাজ মানে তো সচ্চিদানন্দ গুরু, তাহলে জাহাজ থেকে নামা মানে - এই বোধ লাভ যে সচ্চিদানন্দগুরু নয়, সচ্চিদানন্দই আছে আর বাইরে এই যে রামকৃষ্ণ যার মধ্যে জগৎচৈতন্য সংকলিত হয়েছে, তাঁর সাথে একাত্ম হওয়া। রামকৃষ্ণের বাণীর মূল্যায়ণ করতে করতে অনুধ্যান করতে

করতে, স্মরণ মনন করতে করতে তাঁর সত্তা লাভ করা, তাঁর সাথে আত্মিকে এক হওয়া। তাহলে, ঐ জাহাজ থেকে নামতে হবে। আজও জাহাজ থেকে নামতে পারে নি ভক্তের দল। সচ্চিদানন্দগুরুর লীলা কাহিনী লিখে ছাপাচ্ছে। কবেকার এই স্বপ্ন মাষ্টার মশায়ের। জাহাজ থেকে তোমার নামতে দেরী আছে। এখনও কি নামার সময় হয় নি? জীবনকৃষ্ণ বলছেন, সচ্চিদানন্দগুরু নয়, সচ্চিদানন্দ। আর তার সাথে একত্ব। তাহলে তাকে জাহাজ থেকে নেমে রামকৃষ্ণের সাথে এক হতে বলছেন। ব্রাহ্মণ বলছেন, আমার তাড়া আছে, তোমার দেরী আছে। এ কথার আরেক অর্থ – তুমি এখনও বহু বছর বাঁচবে। এই স্বপ্নটা শ্রীম দেখছেন ১৮৮২ সালে। এর পরে তিনি আরো পঞ্চাশ বছর দেহ নিয়ে বেঁচে ছিলেন। আর ঠাকুর ১৮৮২-র পরে আর মাত্র চার বছর দেহ নিয়ে বেঁচেছিলেন। ১৮৮৬তে ওনার দেহ চলে গেল। বলছেন, আমার তাড়া আছে আর তোমার দেরী আছে, কিন্তু এই পথটা দেখে রাখো। কেন দেখে রাখো? শুধু তোমার জন্য নয়, জগতের মানুষের জন্য তুমি দেখে রাখো। এই পথের বিবরণ তুমি সুন্দর করে ছবির মত এঁকে রাখবে। কথামৃতের পাতায় পাতায় তিনি সেই ছবিটা এঁকেছেন। আমরা দেখছি তিনি বিবরণ দিচ্ছেন কথামৃতে ঠাকুরের ব্যবহারিক জীবনেরও। ঠাকুর দাড়ি কামাতে যাচ্ছেন, তিনি সাধারণের পোষাক পরছেন, সাধারণ মানুষের জীবন-যাপন করছেন, সমস্ত বিবরণ আমরা মাষ্টারমশায়ের লেখা থেকে পাচ্ছি। ঠাকুরের প্রত্যেকটা কথা তিনি verbatim quote করছেন, ঠিক ঠিক লিখে রাখছেন। একটু এদিক ওদিক করছেন না। কোথাও নিজের কথা ঢোকান নি। তিনি পথটা দেখে রেখেছেন এবং আমাদের জন্য লিখে রেখে গেছেন। এই কথামৃতের প্রত্যেকটা কথা মন্ত্রের মত নিতে হবে। ঠাকুর বলছেন, তুমি শীঘ্র মন্ত্র লও। অর্থাৎ তুমি আমার কথাগুলো মন্ত্রজ্ঞানে গ্রহণ কর এবং মাষ্টার মশাই এই মানেই করেছিলেন বলে তিনি কারোর কাছে মন্ত্র দীক্ষা নেননি। তিনি ডায়েরী লিখতে শুরু করলেন, কথামৃত লিখতে শুরু করলেন। গিরিশ ঘোষ যখন তার কাছে সেই ডায়েরী চাইল তিনি বললেন, না এটা আমার নিজের জন্য লেখা। ব্যক্তিগত মন্ত্রের মত এটা মাঝে মাঝে দেখি। পরবর্তীকালে একটি স্বপ্নে নির্দেশ পেয়ে তিনি তার এই ডায়েরী ছেপে প্রকাশ করেন।

যাইহোক, কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণের যাত্রাপথের বিবরণ তো পেলাম। আমাদের দর্শন অনুভুতিও আপনা হতে হবে, তাঁর কৃপায়। তাহলে কী করণীয় আছে? শোভন ধীবর নামে একজন স্বপ্ন দেখছেন - ঝড় জলে প্রচুর খড়কুটো ওর ঘরে ঢুকে গেছে, তখন জীবনকৃষ্ণ স্বয়ং এসে সেই খড়কুটো পরিষ্কার করছেন। স্বপ্নদ্রষ্টা অবাক হয়ে দেখছে জীবনকৃষ্ণের পিছু পিছু ঘুরছে ওরই একটি ছোট্ট প্রতিমূর্তি।সে ঐ একটি দুটি খড়কুটো কুড়োচ্ছে, আর জীবনকৃষ্ণই সব কুড়োচ্ছেন। 99.9% কিন্তু জীবনকৃষ্ণই কুড়োচ্ছেন, আর দ্রষ্টার ছোট্ট সত্তা একটি দুটি খড়কুটো কুড়োচ্ছে - এই দেখতে দেখতে দ্রষ্টার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। সে প্রশ্ন করছে, এ আমি কি দেখলাম? ব্যাখ্যা হল – ঐটুকু আমাদের ভূমিকা, জীবনকৃষ্ণই আমাদের গ্লানিমুক্ত করবেন। সংসারে ঝড় আসবে, মন খারাপ হবে। তখন গ্লানি জন্মাবে, তিনিই আবার গ্লানি মুক্ত করবেন। পরিষ্কার করে দেবেন। কিন্তু তোমারও ছোট্ট একটু ভূমিকা আছে। তা হ'ল- জীবনকৃষ্ণ কি করছেন, কিভাবে মানুষকে তাঁর সত্তা দানে পবিত্র করছেন সেই দিকে তাকিয়ে থাকা, তার মহিমা অনুধ্যানে তাঁর আদর্শ ধরে এগিয়ে যাওয়া ও দর্শনে পাওয়া দৈব নির্দেশ মেনে চলা। ঐ সামান্যতম ভূমিকাটুকু কিন্তু আমাদের আছে। জীবনকৃষ্ণই সব করবেন বললে হবে না। জীবনকৃষ্ণ তো করবেনই কিন্তু তুমি তাকাও, তিনি কি করছেন তার মহিমাটা দেখ, আর এজন্যই পাঠে আসা। আমার অনুভূতি বলব, আপনার অনুভূতি শুনব ও সেগুলির বিশ্লেষণ করব - তার জন্যই তো পাঠে আসা। আমাদের যদি কিছুই করার না থাকে তাহলে পাঠে আসছি কেন?

দর্শন অনুভূতি বলার ব্যাপারে কেন জোর দেওয়া হচ্ছে এটা কথামৃতে ঠাকুর আলোচনা করেছেন একটি রূপকের সাহায্যে। কৈলাসে শিব ঠাকুর আছেন আর নন্দী আছে। হঠাৎ একটা শব্দ হল। নন্দী বলল, ঠাকুর কী হল? শিব ঠাকুর বললেন, রাবণ জন্মাল। কিছুক্ষণ পর আবার একটা ভয়ানক শব্দ হল। নন্দী আবার জিজ্ঞেস করল এবার কী হল ঠাকুর? শিব ঠাকুর বললেন, রাবণ বধ হল। শব্দ - নাদ - অনাহত ধ্বনি - আত্মা যখন ধ্বনি রূপে প্রকাশ পায়। শূন্য তত্ত্ব থেকে নাদ তত্ত্ব - নাদ তত্ত্ব থেকে রূপ তত্ত্ব - জীবের সৃষ্টি। আবার

রূপতত্ত্ব থেকে নাদতত্ত্ব — নাদ তত্ত্ব থেকে শূন্য তত্ত্ব – জীবের মৃত্যু। এই আছে এই নাই। ক্ষণিক এই জীবনে আর এক নাদের খেলা হয়। নাদ শ্রবণে, ব্রহ্মবিদ্যার কথা ঠিক ঠিক শুনলে - জীবের শিবে রূপান্তর তথা রামের জন্ম ও রাবণকে চেনা শুরু হয় - পরে নাদ ভেদ হলে শিবের সাথে একত্ব লাভ হয়, তখন আর রাবণ থাকে না - এক রামই থাকে - বাজিকরের বাজির রহস্য ভেদ হয়।

নাদ শুনলে ভিতরে দেবত্বের ক্রিয়া, দর্শন অনুভূতি হয়। ব্রহ্মবিদ পুরুষ যেমন জীবনকৃষ্ণ যখন বলছেন সেটা নাদ, তার কুণ্ডলিনী কথা বলছে। তাই তাঁর মুখ থেকে ঈশ্বরীয় কথা শুনলে মানুষের দর্শন অনুভূতি হ'ত। আবার দর্শন অনুভূতির মর্মও তিনি ধরিয়ে দিলে তবে সহজে বোঝা যেত। এক দিনের ঘটনা - রেবতী মোহন পোদ্দার এসেছেন জীবনকৃষ্ণের ঘরে। উনি জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু স্বপ্ন দেখেছিস? রেবতীবাবু বললেন, হ্যাঁ। দেখছি - পথ দিয়ে হাঁটছি, এক বৃদ্ধ জোর করে টেনে নিয়ে গেলেন দাঁতের ডাক্তারের চেম্বারে। ডাক্তার দাঁতগুলো তুলে দিল। উনি বললেন, বৃদ্ধটিকে চেনো বাবা? রেবতীবাবু বললেন, না, চিনি না। জীবনকৃষ্ণ বললেন, ভগবানকে কেউ চিনতে পারে না বাবা। কথাগুলি রেবতীবাবুর অন্তর বিদ্ধ করল। তখন জীবনকৃষ্ণের মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখে উনি চমকে উঠলেন। বললেন, এখন চিনতে পারছি। স্বপ্নদৃষ্ট বৃদ্ধটি আপনিই।

কিন্তু তুমি আমি যখন ঈশ্বরীয় কথা বলছি তখন তো কুণ্ডলিনী কথা বলছে না। ঐ effect হচ্ছে না। দাঁত তোলা অর্থাৎ অহংনাশ, রাবণ বধ হচ্ছে না। তবে, তুমি আমি যখন নিজেদের দর্শনের কথা বলি সেটাও নাদ, দ্বিতীয় স্তরে। সেইজন্য আমরা বিভিন্ন মানুষের দর্শন অনুভূতির কথা যদি বলি তখন সেটা আমার কথাও হল না আর তোমার কথাও হল না। ভগবানেরই কথা হল। সেইটা শুনলে আমাদেরও দর্শন অনুভূতি হবে। তাই বোলপুরের বরুণ ব্যানার্জী স্বপ্নে দেখেছেন – কে যেন বলছে, আমাদের সাধন শুরু হয় কান থেকে। অর্থাৎ কানে নাদ তথা দর্শন অনুভূতির কথা শুনে।

নতুন একজনের জীবনকৃষ্ণকে নিয়ে দেখা একটা স্বপ্ন বলি। ক্লাস

সিক্সের একটি ছেলে। নাম - শতদল সাহা। সে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছে। স্বপ্নটার কথা বলার আগে ক'টি কথা বলে নেওয়া ভাল! ওর মা ইংরাজী Religion and Realisation এর বঙ্গানুবাদ করার ব্যাপারে Protest করেছিল। বাংলা 'ধর্ম ও অনুভূতি' আছে - আবার ইংরাজী Religion and Realisation এর আপনারা বঙ্গানুবাদ করতে গেলেন কেন? আমাকে এসে প্রশ্ন করেছে। বললাম, দেখুন, আমাকে অনেকে বলেছিল ইংরাজীটা বুঝতে পারি না, এর বাংলা অনুবাদ করে দেন তো খুব ভাল হয়। তাহলে এর রসাস্বাদন করতে পারি। অনেকেরই অনুরোধ ছিল এবং তার জন্যই বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে। তখন উনি বলছেন যে ইংরাজীটার আলাদা taste, ইংরাজীটাই ঠিক ছিল, আবার বাংলা 'ধর্ম ও অনুভূতি'ও তো আছে। তখন তাকে বলা হল যদি বঙ্গানুবাদ করাটা ভুল হয়ে থাকে তাহলে ভগবান আপনাকে স্বপ্নে জানিয়ে দেবেন। এবার যেদিন তিনি বলে গেলেন তার পরের সপ্তাহে পাঠে এসেছেন ছেলেকে নিয়ে। ছেলে একটি স্বপ্ন দেখেছে। ও দেখছে Religion and Realisation এর বঙ্গানুবাদ বইটা পড়ছে। একটা পাতা পড়া শেষ হতেই তার সামনে জীবনকৃষ্ণের দেহের একটা অংশ ফুটে উঠল। পাতার পর পাতা পড়ে যাচ্ছে তখন জীবনকৃষ্ণের দেহের আরো বেশি অংশ ওর সামনে পরিস্ফুট হচ্ছে। পুরো বইটা যখন পড়া হল তখন ও দেখছে ওর সামনে পূর্ণাঙ্গ জীবনকৃষ্ণ বসে। দর্শন মিলিয়ে গেল। স্বপ্নটি বলে ছেলেটির মা বলছে যে এই বইটি ছাপানোর দরকার ছিল। আমার ছেলের স্বপ্নের মাধ্যমে ভগবান আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। কারন ইংরাজী বইটিতে অনেক জিনিস ভেঙ্গে বলা আছে। তাছাড়া অনেক নতুন ব্যাখ্যাও রয়েছে যা 'ধর্ম ও অনুভূতি'তে নেই। যারা জানেনা তাদের জন্য ঐগুলি দরকার। এটি শতদলের শ্রীজীবনকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন। এইরকম বহু মানুষ, নিত্যনতুন জীবনকৃষ্ণকে দেখছেন, সেসব বহু দর্শনের কথা এই হাতে লেখা মানিক পত্রিকায় আছে - আমি আর সেখানে যেতে চাই না।

সব্যসাচী ঘোষের একটি স্বপ্ন এখানে রয়েছে একটু নতুন ধরণের। আমাদের আগের বারের লেখা মানিক পত্রিকার প্রচ্ছদে হালদার পুকুরের একটা ছবি ছিল। ও দেখছে, সেই হালদার পুকুরের ছবিটা জীবন্ত হয়ে উঠল। দেখছে

সত্যিকারের হালদার পুকুর, তার পাড়ে ছোট বয়সের জীবনকৃষ্ণ বসে আছেন, পা দোলাচ্ছেন আর ছোট ছোট পাথর ছুঁড়ছেন পুকুরের ভিতরে। উনি যেন প্রতিদিন এমনটা করেন আর ভাবেন - পূর্ববর্তী ধর্মের বিকাশ ও তার গুরুত্ব বিষয়ে, কিন্তু আজ উনি শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম চিন্তা নিয়ে ভাবছেন। দেখতে দেখতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। এই হচ্ছে স্বপ্নটা। এখানে কি দেখানো হচ্ছে? ছোট জীবনকৃষ্ণ। ছোট জীবনকৃষ্ণকে দেখছে কেন? ছোট ছেলে দেখলে আমাদের মনে হয় এর মধ্যে আরো বিকাশ হবে। আমাদের বয়স হয়ে যাচ্ছে, আমাদের মধ্যে সম্ভাবনা কমছে। কিন্তু এরা মহাপুরুষ হতে পারে, এরা অনেক বড় হবে। এদের সম্ভাবনা বিরাট, আর আমাদের যাদের বয়স হচ্ছে সম্ভাবনাটা কমে যাচ্ছে। Potentialityটা কমে যাচ্ছে। তাই ছোট জীবনকৃষ্ণ মানে জীবনকৃষ্ণের নতুন বিকাশের কথা। যে বিকাশ আমরা দেখেছি, জেনেছি তার পরেও আরো নতুন বিকাশ হবে। তারই কথা বলছে। আমরা আভাষ পাচ্ছি যে নতুন হালদার পুকুর সৃষ্টি হবে। নতুন হালদার পুকুরটা কি? হালদার পুকুর কাকে বলে? হালদার পুকুরের দেহতত্ত্বের অর্থ কি হবে? দেখুন, যখন উনি বলছেন যে হালদার পুকুরে মাছ আছে, চার করো চারা ফেলো, গভীর জল থেকে মাছটা উঠে আসবে, তখন হালদার পুকুর মানে সহস্রার। কিন্তু যখন প্রসঙ্গ বদলে যাচ্ছে, যখন উনি বলছেন যে হালদার পুকুরের পাড়ে লোকেরা বাহ্যে করত, কারোর কথা শুনতো না, শেষে কোম্পানীকে জানানো হল, কোম্পানী চাপরাশী পাঠিয়ে দিল, চাপরাশী ওখানে লিখে দিল - এখানে বাহ্যে করিও না, তখন বাহ্যে করা বন্ধ হল। এই যে রূপক, এই গল্পটা যখন বলা হচ্ছে তখন হালদার পুকুর মানে সহস্রার নয়, তখন হালদার পুকুর মানে কি? তখন হালদার পুকুর মানে বেদ। কেন হালদার পুকুর মানে বেদ? সেকালে মেয়েরা তো পুকুরের জল আনতে যেত খাবার জন্য, রান্নার জন্য। মানুষের যে আত্মিক ক্ষুধা, ভগবৎ প্রেমতৃষ্ণা, সেটা মিটবে কি করে? অনুভূতির কথা আছে একমাত্র বেদে, সেকালে বহু মুনি ঋষির দর্শন অনুভূতির সংকলন হচ্ছে বেদ। তাই বেদ পাঠ করে, বেদের কথা শুনলে, তবে ভক্তের এই তৃষ্ণা মিটত। গীতাতেও পরিষ্কার করে বলা আছে সাংখ্যযোগে ৪৬নং শ্লোকে যে যখন বন্যা হয় চারিদিকে জল

আর জল তখন পানীয় জলের ক্ষুদ্র জলাধার যেমন প্রয়োজন তেমনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তির জ্ঞানবান হবার জন্য প্রয়োজন বেদের জ্ঞানকাণ্ড। চারিদিকে জল আর জল – বন্যা, কিন্তু সেই জল তো খাওয়া যায় না তখন পানীয় জলের জন্য আলাদা জলাধার দরকার, তা ছোট্ট একটু প্যাকেটে করেই দিক আর যাতে করেই দিক। সেইটার জন্য মানুষ লালায়িত হয়।

এবার বাইরে তাকিয়ে দেখলে আমরা কি দেখব? দুর্গাপূজা হচ্ছে, পূজামণ্ডপে হাজার হাজার লোক। রেড রোডে নামাজ পড়ছে হাজার হাজার লোক। চারিদিকে তাকালে মনে হবে সব মানুষ ধার্মিক হয়ে গেছে। এত ধর্ম কর্ম করছে, সকলে ধার্মিক হয়ে গেছে। ঠিক বন্যার জলের মত। সেই জল কিন্তু আপনি পান করতে পারবেন না। অর্থাৎ আপনার যদি সত্যি সত্যিই ক্ষিধে জাগে, আমি ভগবানকে পেতে চাই, জানতে চাই, তার লীলা আস্বাদন করতে চাই, সেই অমৃত পান করতে চাই – এই আকাঙ্খা জাগে, তখন নামাজ পড়েও তা পাবেন না আর দুর্গাপূজা করেও পাবেন না। বিধিবাদীয় কর্মের মধ্যে দিয়ে সেই তৃপ্তিটা হবে না। তাহলে আপনার পরিতৃপ্তি কোথায় হবে? গীতা কি বলছে? গীতা বলছে আপনি বেদে যান। বেদের যে জ্ঞানকাণ্ড সেখানে যেতে হবে, বেদের কর্মকাণ্ডেও নয়। সেই জন্য পরের শ্লোকে কি বলা হচ্ছে ? বলছে – কর্মণ্যেবাধিকরস্তে মা ফলেষু কদাচন। কর্মে তোমার অধিকার আছে, তুমি নামাজ পড়তেই পারো, সেখানে কারোর কিছু বলার নেই। তুমি পুজো করতেই পারো, তুমি ব্রাহ্ম ধর্ম নিতেই পারো, যে কোন মতেই তুমি যেতে পারো, তোমার অধিকার আছে, কিছু বলার নেই। কিন্তু 'মা ফলেষু কদাচন' অর্থাৎ ফলে তোমার অধিকার নাই, মানে ফল হয় না। অত্যন্ত অপ্রিয় সত্য কথাটা কিন্তু গীতায় তুলে ধরা হয়েছে। বিধিবাদীয় ধর্ম কর্মের মধ্যে এই অমৃত পান সম্ভব নয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, সর্ব ধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। কি করে অমৃতলাভ সম্ভব? একমাত্র সেই পরমপুরুষের স্মরণ এবং মননে। তাঁকে নিয়ে মানুষের কি দর্শন অনুভূতি হয়েছে, সেই দর্শন অনুভূতির কথা শ্রবণ করুন। বেদ হচ্ছে সেই জলাধার যার জল পান করলে, সেখানে যে দর্শন অনুভূতির কথা আছে তা শুনলে আপনার আত্মিক ক্ষুধা মিটবে। বেদ পৃথিবীর একমাত্র

ধর্মগ্রন্থ যেখানে বলা হচ্ছে ভগবানকে দেখা যায়। কি কি ভাবে দেখা যায় তারও বিবরণ দেওয়া আছে। অঙ্গুষ্ঠবৎ আত্মার কথা বলা আছে। বিদ্যুৎপুরুষের কথা বলা আছে। অক্ষি পুরুষের কথা বলা আছে। বিভিন্ন দর্শনের বিবরণ রয়েছে সেখানে। এমনটি পৃথিবীর কোন ধর্মগ্রন্থে নাই।

কিন্তু সেই হালদার পুকুরের পাড়ে বাহ্যে করা হয়েছে। অর্থাৎ বেদের কথাকে বিকৃত করা হয়েছে। মানে গুলো বদলে দেওয়া হয়েছে। গুরুরা, ধর্মাচার্যরা অন্য মানে করেছে। তারা বলল, আলেখ লতার জল পেটে পড়লে গাছ হবে, সাধনবৃক্ষ শুরু হবে অর্থাৎ সাধনের সূচনায় তলপেটে জল দেখতে পাবে। এরা বলল একটা কলসী করে তুমি ব্রহ্ম বারি নিয়ে এস। পুকুরে গিয়ে কলসী করে জল নিয়ে এসো। এনে ডানদিকের কোলে নাও, তারপর দুর্গা মন্দিরে গিয়ে নামাও। কতকগুলি আচারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল কিন্তু এর গভীরে গেল না। এটা ভিতরের দর্শন অনুভূতির কথা, বাইরে আচরণীয় নয়, এইটা কিন্তু মানুষকে বলল না। ভুলিয়ে রাখল। ওরা বলছে সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষকে দেখো, সূর্যের মধ্যে যে পরমপুরুষকে দেখবে, তাঁর সেই কল্যাণতম রূপ দেখলে তুমি শান্ত হবে, ধীর হবে। আর সেইটিই তোমার আত্মার রূপ। মানুষ কি করল? বাইরে ত্রাটক করতে শুরু করে দিল। সূর্যের দিকে তাকিয়ে থেকে মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল। চোখ খারাপ হয়ে গেল লক্ষ লক্ষ সাধুর। বাইরের সূর্যের কথা বলা হয়নি, প্রাণসূর্যের কথা বলা হয়েছে। এই যে সূর্য তা প্রাণসূর্য, তাকে ভিতরে দেখতে পাওয়া যায় এটা ওরা ভুলে গেল। এরা গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যাখ্যাটা পালটে দিল। গায়ত্রী মন্ত্রে কি বলা হচ্ছে? বেদের একটা বিখ্যাত মন্ত্র হল গায়ত্রী মন্ত্র। সেখানে ঐ সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষের কথাই বলা হয়েছে। আর বলা হচ্ছে সম্মলিতভাবে আমরা অনুশীলন করব যে এই এক থেকেই আমাদের সকলেরই চৈতন্যশক্তি আসছে। আর আমাদের গুরুরা কি বললেন? খবরদার বাইরের কেউ যেন গায়ত্রী মন্ত্র শুনতে না পায়, ঘরের এক কোণে বসে চুপি চুপি জপ কর। কিন্তু মন্ত্রে বলা হচ্ছে "ধীমহী", মানে আমরা ধ্যান করি। তাহলে যখন বলা হচ্ছে আমরা ধ্যান করি তখন কেন একা একা বসে ধ্যান করব? কেউ জিজ্ঞাসাও করে না, তাই গুরুরাও বেঁচে গেছে।

আমরা সাধারণ মানুষ সংস্কৃত বুঝি না। তাতে গুরুদের আরও সুবিধা হয়েছে। এইভাবে বেদকে বিকৃত করা হয়েছে। অর্থাৎ হালদার পুকুরের পাড়ে বাহ্যে করা হয়েছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ প্রথম কোম্পানী প্রেরিত পুরুষ যিনি চাপরাশ পেয়েছেন। তিনি আদেশ পেয়েছিলেন ভগবানের কথা বলবার জন্য। বলছেন, মা আমায় দেখিয়ে দিয়েছেন আমার কতকগুলি ভক্ত আছে অর্থাৎ তাদের কাছে মায়ের মহিমার কথা বলতে হবে। কোম্পানী হল নির্গুণ ব্রহ্ম। নির্গুণ ব্রহ্ম প্রসন্ন হলেন, তাকে শক্তি দিলেন। তাকে তিনি মা বলছেন। সেই মা তার কথার রাশ ঠেলে দিলেন। তিনি এমন সমস্ত কথা বললেন, এত তেজময়ী বাণী তাঁর মধ্যে দিয়ে এলো, শ্রদ্ধার সঙ্গে যারা স্মরণ করছেন, তাদের জীবনের পরিবর্তন হবে। তারা সত্যের সন্ধান পাবে। উনি দেখলেন যে, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের নিয়ে তো মুশকিল। তাই সহজভাবে, সহজ বাংলা ভাষায় তাঁর উপলব্ধির কথা বললেন। সেই সব কথা গেঁথে তিনি একটা নতুন হালদার পুকুর খনন করলেন। সেইটি হল এই শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণকথামৃত। প্রথম হালদার পুকুর হচ্ছে বেদ, দ্বিতীয় হালদার পুকুর হল রামকৃষ্ণ কথামৃত। কিন্তু আমাদের চরম দুর্ভাগ্য এই যে কথামৃতের কথাগুলোকেও আবার বিকৃত করা শুরু হ'ল। যেমন ঠাকুর বলছেন, টাকা মাটি, মাটি টাকা। কেউ বলছে দেখেছ রামকৃষ্ণের কথা শুনে কিছু জমি কিনে রাখলে আজ কত টাকা দাম হ'ত? উনি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। শ্রীরামকৃষ্ণ কি এই কথা বলতে চেয়েছেন? কথাগুলিকে বিকৃত করা হল। ঠাকুরের সব কথা যোগের কথা, দেহতত্ত্বের কথা। দেহেতে ভগবানের কিভাবে প্রকাশ হয় - এই কথা তিনি মানুষকে বলছেন। এই কথাগুলিই মানুষ ভুলে গেল। বাইরে, মঠে দীক্ষা নিতে শুরু করল। সেখানে মহাসমারোহে দুর্গাপূজা শুরু হল আবার T.V. তেও Tele cast করা হচ্ছে। নিয়ম নীতি মেনে আবার সেই পুরোনো সংস্কারগুলোকে নিয়ে আসছে। তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণ যে হালদার পুকুর খনন করলেন তার পাড়েও আবার বাহ্যে করা শুরু হল।

এলেন জীবনকৃষ্ণ। তিনি কথামৃতের আসল অর্থটা ধরিয়ে দিলেন, যোগের অর্থ ধরিয়ে দিলেন। তারপর নিজে একটা হালদার পুকুর খনন করলেন। এই হালদার পুকুর কোনটা? ধর্ম ও অনুভূতির তৃতীয় ভাগ। ধর্ম অনুভূতির

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ হচ্ছে কথামৃতের ব্যাখ্যা। তৃতীয় ভাগ কিন্তু কথামৃতের ব্যাখ্যা নয়, ঐটি মূলতঃ জীবনকৃষ্ণের নিজস্ব অনুভূতির কথা, সেইটি হল তৃতীয় হালদার পুকুর, যে হালদার পুকুরের পাড়টা কিন্তু বাঁধানো। সেখানে কেউ বাহ্যে করতে, নোংরা করতে পারবে না। কেন ? কারণ সেখানে তিনি প্রমাণের কথা বলছেন। তোমার যদি ব্রহ্মত্ব লাভ হয়, তাহলে তার প্রমাণ ফুটে উঠবে। যদি প্রমাণ দিতে পারো তাহলে তুমি ঠিক বলছ, আর যদি প্রমাণ না দিতে পারো তোমার কথা যদি অনুভূতি হয়ে না ফোটে তাহলে তুমি ভুল বলছ। তাহলে আর বাহ্যে করার জায়গা নেই। বিকৃত করার জায়গা নেই। আমি যদি জীবনকৃষ্ণের কথা ভুল ভাবে Present করি, বিকৃত করি, আপনি স্বপ্নে দেখবেন যে পাঠক ভুল বলছে। তাহলে বিকৃত করার কোনো জায়গা নেই। একটু আগে দেবাশীষ আমাকে একটা সুন্দর কথা বলল যে বোলপুরে গিয়ে তোমাদের ঐ আলোচনা শুনে খুব ভাল লাগল। জীবনকৃষ্ণ নিজের ব্যষ্টির সাধনের কথা বলেছেন ধর্ম ও অনুভূতির প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে আর তৃতীয় ভাগে তাঁর বিশ্বব্যাপিত্বের কথা বলছেন, সেও তো তাঁরই। আমাদের তো বিশ্বব্যাপিত্ব হয় না। তাঁর সাথে একত্ব লাভে সাধারণ মানুষের যে ধর্মলাভ হয় বা হচ্ছে, নতুন ধরণের দর্শন অনুভূতি হচ্ছে এইগুলো নিয়ে বই বেরোনো দরকার। ভবিষ্যতে সাধারণ মানুষের দর্শন অনুভূতি নিয়েই কোন বই হবে। এই যে ছোট্ট জীবনকৃষ্ণকে দেখা, এর মধ্যে এইরকম একটা ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে যে ভবিষ্যতে সমষ্টির ধর্ম নিয়ে নতুন একটা হালদার পুকুর তিনি তৈরী করবেন।

কয়েকদিন আগে একত্ব নিয়ে কথা হচ্ছিল, তখন অর্পিতা চ্যাটার্জী বলে একটি মেয়ে স্বপ্ন বলল, ও দেখছে সূর্যের আলো ওর গায়ে এসে পড়ছে। ও আছে পুরীতে সমুদ্রের ধারে। ও দেখছে ওর দেহটা transparent (স্বচ্ছ) হয়ে গেল কাঁচের মত। ওর দেহের মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো pass করছে। সূর্যের আলো গিয়ে পড়ছে সমুদ্রের জলে। ভীষন আনন্দ হচ্ছে। স্বপ্নদ্রষ্টা প্রশ্ন করছে, এটা কি দেখলাম? তাকে বলা হল – এই হচ্ছে একত্ব। তখন আমার আমি নেই। Transparent হয়ে গেছে। তোমার আমি জ্ঞান চলে গেলে, তোমার মধ্যে জীবনকৃষ্ণের যে ব্রহ্মত্ব বিকশিত হচ্ছে, সেটা গিয়ে পড়ছে কোথায়?

সমুদ্রে, মানে জনসমুদ্রে, তখন তোমার মধ্য দিয়ে জীবনকৃষ্ণই কথা বলছেন, মানুষ তোমার মধ্য দিয়ে জীবনকৃষ্ণের কথা শুনবে। তখন তাদের মধ্যে ক্রিয়া হবে। যতক্ষণ তোমার মধ্যে আমি জ্ঞান আছে ততক্ষণ তা হবে না। তাহলে একত্বলাভ মানে অহংশূণ্য অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া, তার সাথে এক হয়ে যাওয়া, Transparent হয়ে যাওয়া। এই অবস্থা কি সাধারণ মানুষের হতে পারে? এই প্রশ্ন উঠতেই রেণু জ্যেঠিমা একটা স্বপ্ন বললেন। ৪০ নম্বরের সূতো আর ৪১ নম্বরের সূতোর কাহিনী আছে কথামৃতে। সেখানে বলা হয়েছে যে স্বামীজি এসেছেন ঠাকুরের কাছে। বলছেন, তুমি ভগবানকে দেখেছ? ঠাকুর বলছেন, হ্যাঁ। স্বামীজি বলছেন, তুমি আমাকে দেখাতে পার? উনি বলছেন, হ্যাঁ আমি দেখাতে পারি। স্বামীজি তো অবাক। ঠাকুর বলছেন, কোনটা ৪০ নম্বরের সূতো আর কোনটা ৪১ নম্বরের সূতো তা জানতে গেলে সূতোর ব্যবসায়ীদের কাছে আসা যাওয়া করতে হয়। তুই কিছুদিন এখানে যাতায়াত কর তাহলে বুঝতে পারবি।

কি বুঝতে পারবে? বুঝতে পারবে যে মানুষটাই ঈশ্বর। সব মানুষ ৪০ নম্বরের সূতো। যে মানুষের মধ্যে সেই পরম এক ব্রহ্মের পূর্ণ প্রকাশ হয়েছে তিনি ৪০+১=৪১ নম্বরের সূতো হয়ে গেছেন। অর্থাৎ আমাদের মতন দেখতে সাধারণ মানুষ রামকৃষ্ণ কিন্তু তিনি ভগবান হয়ে গেছেন। এটা উপলব্ধি হবে তাঁর কাছে আসা যাওয়া করতে করতে, দেহ মন পবিত্র হলে তবে বুঝতে পারবে। স্বামীজি বুঝতে পারলেন পরবর্তীকালে, ঠাকুর যখন বলছেন স্বামীজিকে যে তুই আমার কাছে আসিস্ কেন? তুই কালী দেখতে চাস্, না কৃষ্ণ দেখতে চাস্? উনি বললেন, আমি কালী দেখতে চাই না, কৃষ্ণও দেখতে চাই না, আমি চাই তোমাকে। ঠাকুর বলছেন আমায় নিয়ে কি করবি? স্বামীজী বললেন, তুমিই তো জানিয়েছ, ঈশ্বরত্ব মানুষেরই একটা অবস্থা, ওগো তুমিই আমার সেই ঈশ্বর। স্বামীজির উপলব্ধি হোলো। আমরা এবার বুঝতে পারছি দর্শন সাপেক্ষে যে জীবনকৃষ্ণই সেই ঈশ্বর, কিন্তু আমি কে ? জীবনকৃষ্ণ বলছেন, তোমার নিজের স্বরূপটা যতক্ষণ না জানতে পারছো, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার জ্ঞান সম্পূর্ণ হল না। তাই রণিত পাল স্বপ্নে দেখল, শিব ঠাকুর ত্রিশূল দিয়ে

তাকে মারতে যাচ্ছে, সে ভয় পাচ্ছে আর 'জয় জীবনকৃষ্ণ, জয় জীবনকৃষ্ণ' করছে। শিব ঠাকুর বলছে, যতই জীবনকৃষ্ণের নাম নাও না কেন আমি তোমায় মারব। তখন ও চিৎকার করে বলে উঠল, ''অহং ব্রহ্মাস্মি।'' অমনি শিব ঠাকুর অদৃশ্য হ'ল। অর্থাৎ তোমাকে এইটা জানতে হবে যে তুমিও ঈশ্বর। তোমার আলাদা অস্তিত্ব নেই। তুমি তার সত্তায় সত্তাবান। এখন রেণু জ্যেঠিমার স্বপ্নে আসা যাক। তিনি দেখছেন কি, ঘরে অনেকগুলো সূতোর গুলি রয়েছে। একজন অজানা মানুষ এসেছে। রেণু জ্যেঠিমা বলছেন, কোনটা ৪০ নম্বরের সূতো আর কোনটা ৪১ নম্বরের সূতো জানি না। তখন সেই অচেনা মানুষ একটা সুতোর গুলি দেখিয়ে বলছেন, এইটা ৪১ নম্বরের সূতো। সেই ৪১ নম্বরের সূতোর গুলিটা হাতে নিয়ে ওনার গায়ে জড়াতে শুরু করল। শেষে সূতোর গুলির মাঝে যে কাঠিটা ছিল, সেই কাঠিটা দ্রষ্টার মাথার মধ্যে গেঁথে দিল। তখন ওনার উপলব্ধি হচ্ছে যে আমি ৪১ নম্বরের সূতো হয়ে গেলাম। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের দ্বিতীয় স্তরে এই ঈশ্বরত্ব লাভ আজকের দিনে বাস্তব হয়ে উঠছে। এইটা হচ্ছে একত্ব লাভের পরিণাম। ৪০ নম্বরের সূতো কেউ নয়। আছে শুধু ৪১ নম্বরের সূতো আর তার গায়ে অসংখ্য রোঁয়া।

তরুণ ব্যানার্জীর একটা স্বপ্ন বলে শেষ করব। 'দেখছি — আমাদের হাসপাতালে কোনো বিভাগীয় অফিসার এসেছেন, বিরাট লম্বা চওড়া চেহারা। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন - ক্যালিব্রেশন (Calibration) অনুযায়ী তোমার ওজন কত জানো? আমি বললাম, তা জানিনা, তবে আমার ওজন ৫৪ কেজি ৫০০ গ্রাম। উনি বিরক্ত হয়ে বললেন, তুমি তাহলে Calibration অনুযায়ী ওজনটা জানো না? ওনার কথাটা শুনে মন খুব খারাপ হয়ে গেল। স্বপ্ন ভেঙে গেল'। কি দেখানো হল স্বপ্নটিতে? স্বপ্নটিতে বিরাট এক শিক্ষা আছে। কাউকে ওজন জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে দেবে আমার দেহের ওজন এত কেজি। এখানে তো সেইটা জানতে চাইছেন না। আমাদের আলোচনা শুরু হয়েছিল ওজন দিয়ে, সেটা কিসের ওজন? আত্মিক ওজন। Calibration অনুযায়ী তোমাকে তোমার আত্মিক ওজন জানতে হবে অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে তাঁর আত্মিক ওজন জানতে হবে। Calibration অনুযায়ী মাপ কাকে বলে ?

Calibration মানে একটা স্ট্যাণ্ডার্ড (Standard) মাপের সঙ্গে তুলনা করে কোন মাপক যন্ত্র কতটা নিঁখুত তা দেখা, যাচাই করা। এখানে মাপক যন্ত্র হ'ল মানুষের দেহ আর Standard মাপ হ'ল শ্রীজীবনকৃষ্ণের জীবন। আদর্শ জীবন। যেখানে সময়ের সাথে সাথে চৈতন্যের নতুন নতুন বিকাশ হয়েছে ও নিরন্তর অনুশীলনের মাধ্যমে তা ধারণা করা হয়েছে। যিনি সাম্প্রতিকতম চৈতন্যের বিকাশের কথা জানেন ও rationally ধারণা করতে পারেন তার আত্মিক ওজন ১০০ কেজি বা ১ কুইন্ট্যাল ধরে নিজের ওজন যাচাই করতে হবে। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করতে হবে, আমি পূর্ণ সংস্কারমুক্ত হয়েছি তো ? সরল সাধারণ জীবনযাপন করছি তো ? পাঠচক্রে গিয়ে প্রতিদিন অনুশীলন করছি তো ? দর্শন-অনুভূতির ব্যাখ্যা বুঝতে ও ধারণা করতে পারছি তো ? ধর্মজগতের অগ্রগতি কোন পথে তা কি ধরতে পারছি ? নিজের মান সম্পর্কে হুঁশ, নিজের আত্মিক ওজন সম্পর্কে আমার হুঁশ হয়েছে তো? যার পূর্ণ হুঁশ হয়েছে নিজের মান সম্পর্কে, সেই আদর্শ পুরুষ জীবনকৃষ্ণকে সামনে রাখুন আর নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন মনুষ্যজাতি ও আপনি আত্মিকে এক — এটি কতখানি বোধে বোধ হয়েছে, তাহলে নিজের মানটা জানতে পারবেন। Calibration অনুযায়ী নিজের ওজনটা জানার চেষ্টা করি আসুন সকলে। জয় জীবনকৃষ্ণ!

—০—